أصول التفسير

ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস্

কুরআন বোঝার মূলনীতি

SEAN PUBLICATION

بسم الله الرحمن الرحيم

মহান আল্লাহর নামে

যিনি পরম করুণাময় ও মহান দয়ালু

কুরআন বোঝার মূলনীতি

ভাষান্তর — জিয়াউর রহমান মুন্সী
সম্পাদনা — আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক
শার'ই সম্পাদনা — ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

ভাষারীতি বানান — ইমতিয়াজ উদ্‌দীন খান
পৃষ্ঠা সজ্জা — মাসুদ শরীফ
প্রচ্ছদ — মুহাম্মাদ শরীফুল আলম

কুরআন বোঝার মূলনীতি

(উসূলে আত তাফসীর)

ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপ্স

ভাষান্তর

জিয়াউর রহমান মুন্সী

শারঈ সম্পাদনা

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

সম্পাদনা

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

SEAN
PUBLICATION

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

কুরআন বোঝার মূলনীতি
ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস
গ্রন্থস্বত্ব © সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

প্রথম বাংলা সংস্করণ
রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি। ফেব্রুয়ারি ২০১৬
পঞ্চম মুদ্রণ মুহার্‌রম ১৪৪৩ হিজরি। সেপ্টেম্বর ২০২১
ISBN: 978-984-91682-1-8
www.seanpublication.com

নির্ধারিত মূল্য: ৩৪০ টাকা

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে চৌর্যবৃত্তিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

Quran Bojhar Mulniti'—Bengali version of Usool At- tafseer by Dr. Abu Ameenah Bilal Philips, translated by Jiaur Rahman Munshi, edited by Abu Tasmiya Ahmed Rafique, reviewed by Dr. Manzur-E-Elahi,published by Sean Publication Limited, Dhaka, Bangladesh.

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড
ইসলামী টাওয়ার, বাংলা বাজার ঢাকা।
+৮৮০ ১৭৫ ৩৩ ৪৪ ৮১১

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান

গ্রন্থস্বত্ব ইসলামি শারী'আহ কর্তৃক সংরক্ষিত একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। ইসলাম প্রত্যেক লেখকের রচিত সকল রচনাকে তার ব্যক্তিগত সম্পদ বলে ঘোষণা করেছে এবং এতদসংশ্লিষ্ট সার্বিক অধিকারও তার জন্য সংরক্ষণ করেছে। পাশাপাশি কেউ যেন গ্রন্থস্বত্ব আইন লঙ্ঘন করে তার সে অধিকার হরণ কিংবা রহিত করতে না পারে, সে নিশ্চয়তাও বিধান করেছে। ইসলামি শারী'আতের সকল দলিল-প্রমাণ ও মূলনীতি সে প্রমাণই বহন করছে।

গ্রন্থ-রচনা গ্রন্থকারের নিজেরই বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের ফসল ও অর্জন। এ অর্জন একান্তভাবে তারই। তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ কোনোভাবেই তার এ সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> « কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ সে নিজে খুশিমনে প্রদান না করলে কারো জন্য কোনোভাবেই তা হালাল হবে না। » [সহীহ আল-জামি' আস-সগীর, হাদীস : ৭৬৬২]

অতএব, গ্রন্থকারের অনুমতি ছাড়া তার রচিত গ্রন্থ থেকে আংশিক বা পূর্ণ কপি করা, ছাপানো এবং তা বেচাকেনা করা ইসলামি শারী'আতে নিষিদ্ধ ও হারাম; কেননা তা অন্যায় উপার্জন ও ভক্ষণের শামিল। আল্লাহ ﷻ বলেন—

> তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না।
>
> [সূরা বাকারা, ২:১৮৮]

অধিকন্তু এটা শারী'আতের সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য হবে বিধায় শারী'আতের নিষিদ্ধ কাজেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন—

> ...তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না; কেননা আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। [সূরা মায়েদা, ৫:৮৭]

সূচি

প্রকাশকের কথা ১১

মুখবন্ধ ১৩

সূচনা ১৭

কুরআনের তাফসীর ২৩

তাফসীরের বিভিন্ন কেন্দ্র ২৬

তাফসীর জ্ঞানের সম্প্রসারণ ২৮

তাফসীর ও তা'ওয়ীল ৩৫

তাফসীরের পদ্ধতি ৩৮

সঠিক ব্যাখ্যা থেকে বিচ্যুত তাফসীর ৫০

মুফাস্সির বা কুরআনের ব্যাখ্যাকার হওয়ার শর্তাবলী ৫৪

তাফসীর গ্রন্থাবলী ৫৯

তাফসীর বির রিওয়ায়াহ ৬১

তাফসীর বিদ দিরায়াহ ৬৬

কুরআনের অর্থের অনুবাদ ৭৯

অনুবাদের প্রকারভেদ ৮৭

কুরআন: অনন্য কিতাব ৯১

মূল আলোচ্য বিষয় ৯৪

কুরআনের মু'জিযা ৯৬

চ্যালেঞ্জ ৯৯

কুরআনের অলৌকিক প্রকৃতির অন্যান্য দিক ১০৩

ভবিষ্যদ্বাণী ১০৫

প্রকৃতির বিস্ময়কর ঘটনাবলীর বর্ণনা ১০৬

কুরআনে অসঙ্গতি ১০৮

কুরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক অলৌকিকত্ব ১১৫

ওহী: আসমানী প্রত্যাদেশ ১১৭

ওহীর পদ্ধতি ১২১

প্রত্যক্ষ ওহী: ১২১

পরোক্ষ ওহী ১২৪

ওহীর প্রকারভেদ ১২৫

কুরআনের ওহীর ব্যাপারে সংশয় ১২৬

কুরআন নাযিল ১৩৩
প্রথম পর্যায়ের ওহী ১৩৩
দ্বিতীয় পর্যায়ের ওহী ১৩৫
পর্যায়ক্রমিক ওহী নাযিলের তাৎপর্য ১৩৬
পর্যায়ক্রমিক ওহীর শিক্ষাগত সুবিধা ১৪৫

কুরআন সঙ্কলন ১৪৭
নবী ﷺ এর যুগ: ৬০৯-৬৩২ 'ঈসায়ী ১৪৭
কুরআন সংরক্ষণ ১৪৭
আবু বকর ؓ এর শাসনামল: ১১-১৩ হিঃ/৬৩২-৬৩৪ 'ঈসায়ী ১৫০
প্রথম লিপিবদ্ধ কুরআন ১৫১
কুরআন লিপিবদ্ধ করার দ্বিতীয় পর্যায় ১৫৪
মূল মুসহাফসমূহ এখন কোথায়? ১৫৫
কুরআন মুখস্থকরণ ১৫৭
কুরআন সংরক্ষণের তাৎপর্য ১৬০

কুরআনের মূল পাঠ ১৬৩
আয়াত ও সূরার বিন্যাস ১৬৩
'উসমানী লিপি ১৬৬
পাঠের অঙ্গাসজ্জা ১৬৯

আঞ্চলিক আরবি ও কুরআন ১৭১
সাব'আহ আহরুফ (সাত ধরনের তিলাওয়াত) ১৭২
সাত ধরনের কিরাআতের তাৎপর্য ১৭৮
কুরাইশদের আঞ্চলিক ভাষা ১৭৯
কিরাআত (পাঠ বা আবৃত্তি) ১৮০

আসবাবুন নুযূল ১৮৭
আসবাবুন নুযূলের গুরুত্ব ১৮৯
ব্যাখ্যার পদ্ধতি ১৯৩
আসবাবুন নুযূল সংক্রান্ত কতিপয় বিশেষ গ্রন্থ ১৯৭

মাক্কী ও মাদানী ওহী ১৯৯
মাক্কী আয়াতসমূহের কিছু বিশেষ দিক ১৯৯
মাদানী ওহীর বৈশিষ্ট্য ২০৫
স্বাতন্ত্র্যের গুরুত্ব ২১০

নাসখ: রহিতকরণ ও প্রতিস্থাপন ২১৩
নাসখ প্রমাণিত হওয়ার শর্তাবলী ২১৫
নাসখের জ্ঞান ২১৭
নাসখের প্রকারভেদ ২২০
প্রতিস্থাপনের প্রকারভেদ ২২৫
নাসখের প্রজ্ঞা ২২৮
নাসিখ মানসুখ বিষয়ক গ্রন্থাবলী ২২৯
মুহ্কাম ও মুতাশাবিহ্ ২৩১
কুরআনের সাহিত্যশৈলী ২৩৯
মাসাল ২৪০
কিস্সাহ (গল্প) ২৫৩
কুরআনের ভাষাশৈলী ২৫৭
আম (সাধারণ) ও খাস (সুনির্দিষ্ট) ২৫৭
তাখসীসের শব্দাবলী ২৬৪
বাইরের কোনো বিবৃতির মাধ্যমে আয়াতের তাখসীস ২৬৮
মুতলাক (শর্তহীন) ও মুকাইয়্যাদ (শর্তসাপেক্ষ) ২৭০
মানতূক (প্রকাশ্য) ও মাফহুম (অন্তর্নিহিত) অর্থ ২৭৬
মাফহুম (নিহিত) অর্থ ২৮১
উপসংহার ২৮৭
শব্দকোষ ২৯১

প্রকাশকের কথা

আলহামদু লিআহ্‌লিহি ওয়াস সলাতু লিআহ্‌লিহা

লিখতে জানা হলো শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। একটা সময় ছিল যখন কেউ শুধু লিখতে-পড়তে জানলেই তাকে শিক্ষিত হিসেবে মুল্যায়ন করা হতো। আজকের মানদণ্ডে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা হাতে গণনা করা যেত। সময় গড়িয়েছে, যুগ বদলেছে, পৃথিবী এগিয়ে গেছে অনেক; শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার হয়েছে; নতুন নতুন তত্ত্ব-তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীটি তথ্য-প্রযুক্তির উন্নতির দিক থেকে ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ব্যক্তি-পরিবার, সামাজিক-আন্তর্জাতিক থেকে নিয়ে ধর্মীয় জীবন কিছুই বাদ পড়েনি এর প্রভাব বলয় থেকে। ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জ্ঞান যত সহজলভ্য হচ্ছে, সত্যিকার জ্ঞানীদের সংখ্যাও যেন তার সাথে পাল্লা দিয়ে কমছে। দু' চার পৃষ্ঠার আর্টিকেলেই আমাদের জ্ঞানের মশক উপচে পড়ে চারদিক প্লাবিত করে।

কিন্তু বাস্তবতা হলো—ইসলামী জ্ঞান কোনো গ্যাস বেলুনের মতো নয় যে, মুহূর্তের মধ্যে তা উড়তে শুরু করবে, আবার সামান্য কিছুর আঘাতে মুহূর্তেই চুপসে যাবে। দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে একটু একটু করে ঝিনুকের মধ্যে যেমন মুক্তা তৈরি হয়, কালের ব্যবধানের তা ভারী ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। ইসলামী জ্ঞানও তেমনি একজন মানুষকে মূল্যবান রত্নে পরিণত করে—তবে কেবল তাকেই যার মধ্যে এটা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অধ্যবসায় ও সদিচ্ছা আছে।

ইতিহাসকে যদি কথা বলার ভাষা দেওয়া হতো তাহলে সে কী শব্দে আমাদের তিরস্কার করতো জানি না। কারণ, যখন একটি হাদিস সংগ্রহ করতে মাইলের পর মাইল সফর করতে হতো, তাও এরোপ্লেনে নয়, গাধা-খচ্চরে চড়ে—তখন ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে কম-বেশ ত্রিশ হাজার হাদিস সংগ্রহ করেছেন। ইমাম বুখারী সাত হাজার পাঁচশত হাদীস সংকলন করেছেন শুধু সহীহ বুখারীতে। প্রতিটি হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে তিনি দু' রাকা'আত সালাহও আদায় করেছেন। পাখির পালক কালিতে চুবিয়ে লেখার

যুগে আমাদের পূর্বসূরীদের করা রচনাগুলো আমাদের অনেকে এক জীবনে হয়তো পড়েও শেষ করতে পারব না।

বিক্ষিপ্ত দু'চারখানা বই, গোটা কয়েক প্রবন্ধ, আর কিছু ইউটিউব লেকচার শুনে যে প্রজন্ম চারদিক দাবড়ে বেড়াচ্ছে তাদেরকে বলবো: দেখুন, ইসলাম একটি ধর্ম, জীবনব্যবস্থা, একটি শাসনব্যবস্থা, একটি সমাজব্যবস্থা—মানুষের বানানো নয়, বিশ্বজাহানের মালিকের দেওয়া।

একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আপনি যদি ইসলাম সম্পর্কে একেবারে প্রাথমিক জ্ঞানও অর্জন করতে চান তবুও দয়া করে ভুলে যাবেন না—এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং প্রতিটি বিষয়েরই কিছু মূলনীতি রয়েছে, রয়েছে শাখা-প্রশাখা। এগুলো সম্পর্কে অজ্ঞতা রেখে সামনে অগ্রসর হওয়া মানে বিভ্রান্তির দরজা সব সময়ের জন্য খুলে রাখা। বিশেষ করে যখন ইসলাম থেকে মুসলিমদেরকে দূরে সরানোর জন্য ইসলামকে বিকৃত করাকেই শত্রুরা সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে বেছে নিয়েছে।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমরা আপনাদের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছি—'কুরআন বোঝার মূলনীতি'। এ বিষয়ে প্রথিতযশা আলিমদের যারা কলম ধরেছেন, হাজার পৃষ্ঠার আগে থামতে পারেননি। জাতি হিসেবে আমরা যেমন 'বই-রাগী', তাতে সেসব পড়ার ধৈর্য আমাদের ক'জনার হবে সে কথা আজ না হয় না-ই বললাম। অথচ এই ফিতনাময় এ যুগে দীনের ওপর চলার জন্য বিষয়টা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা রাখা আমাদের প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে ড. বিলাল ফিলিপসের এ ছোট্ট গ্রন্থটিকে দীনের ওপর চলতে আগ্রহীদের জন্য 'গণমানুষের শাস্ত্রীয় গ্রন্থ' বলা যেতে পারে। কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় শাস্ত্রীয় বিষয়গুলো তিনি তুলে ধরেছেন একেবারেই সংক্ষিপ্ত পরিসরে।

এমন একটি বই প্রকাশ করার তাওফিক দিয়ে মহান আল্লাহ যে আমাদের ধন্য করেছেন—এটা একান্তই তাঁর কৃপা। গোটা সিয়ান পরিবারের পক্ষ থেকে এজন্য আমরা তাঁর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে একমাত্র তাঁর, একান্তভাবে তাঁরই জন্য কবুল করুন—আমীন।

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

মুখবন্ধ

১৯৮৮ সালে প্রকাশিত আমার তাফসীরু সূরাতিল হুজুরাত গ্রন্থের ভুমিকায় আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, ইন্ট্রোডাকশন টু তাফসীর অধ্যায়ে আমি যা কিছু অন্তর্ভুক্ত করেছি তা মূলত উসূলুত তাফসীর শিরোনামে আমারই রচিত একটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির কয়েকটি অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ। আর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও উসূলুত তাফসীর এর পাণ্ডুলিপি প্রধানত এ কারণেই অপ্রকাশিত রয়ে গিয়েছিল যে, জনাব আহমদ ভন ডেনফারের 'উলূমুল কুরআন নামে একই ধরনের একটি গ্রন্থ ইংরেজি ভাষায় ইতোমধ্যে ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। তাই এর পরিবর্তে আমি ইংরেজি ভাষায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ে গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদে মনোনিবেশ করলাম। যেমন দি এভ্যুলুশন অব ফিক্‌হ (১৯৮৮), দি আনসার কাল্ট ইন আমেরিকা (১৯৮৮), ইবনু তাইমিয়া'স এসে অন দ্যা জিন (১৯৮৯), ইসলামিক স্টাডিজ বুক ওয়ান (১৯৯০), দ্যা ফান্ডামেন্টালস অব তাওহীদ (১৯৯০), সালভেশন থ্রো রিপেন্টেন্স (১৯৯০) ইত্যাদি।

তবে উসূলুত তাফসীর এর উপর রচিত পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশের ইচ্ছে আমার মনে রয়েই গিয়েছিল; কারণ এতে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সন্নিবেশ করা হয়েছে যা জনাব আহমদ ভন ডেনফারের গ্রন্থে ছিল না। তাছাড়া যেসব বিষয় উভয় গ্রন্থেই ছিল তাও একটু ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও প্রায় নয়টি বছর পার হয়ে গেলো, আজও পর্যন্ত আমি তা প্রকাশ করতে পারিনি। আর এখন তা সম্ভব হওয়ার কারণ হলো যে, আল্লাহ তা'আলা সম্প্রতি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীয়াহ কলেজ থেকে উত্তীর্ণ শায়খ সিরাজের ন্যায় একজন যোগ্য সহকারী দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। তিনিই পুঙ্খানুপুঙ্খ পুনঃপাঠ ও সংশোধন করে প্রকাশের জন্য পাণ্ডুলিপিটি প্রস্তুত করার দুরূহ কাজটি সমাধা করেছেন। তিনি কেবল আমার অন্যান্য গ্রন্থের মান অনুযায়ী অনুবাদ সম্পাদনা ও হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতাই যাচাই করেননি, বরং একটি পাদটীকা ও হাদীসসমূহের একটি তালিকাও

যোগ করে দিয়েছেন। তিনি আরো যেসব বিষয় যোগ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে–তাফসীরে কুরতুবীর উপর একটি অধ্যায়, আসবাবুন নুযূল ও নাসিখ মানসুখের উপর লিখিত গ্রন্থসমূহের একটি অধ্যায়, বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা, কুরআনের মধ্যে স্ববিরোধিতা রয়েছে এমন দাবীর অসত্যতা প্রমাণ, কুরআন তিলাওয়াতের সাতটি পদ্ধতির বিকল্প ব্যাখ্যার উপর একটি অধ্যায় এবং রাশাদ খলিফার গাণিতিক অলৌকিকতা ও 'উসমানী পাণ্ডুলিপিসমূহের ইতিহাসের উপর একটি অধ্যায়।

বোন জামিলাহ ক্যাম্পবেল যে কষ্টসাধ্য কাজটি করেছেন তার কথা উল্লেখ না করাটাও মোটেই সমীচীন নয়। তিনি গোটা বইটি পাঠ করে এর মানোন্নয়ন এবং সাধারণ পাঠকদের জন্য কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদানের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু পরামর্শ দিয়ে আমাদেরকে উপকৃত করেছেন।

এ গ্রন্থের মূল তথ্য-উপাত্ত গৃহীত হয়েছে শায়খ মান্না আল কাত্তানের অনবদ্য রচনা মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন শীর্ষক গ্রন্থ থেকে। অবশ্য এ বিষয়ের উপর লিখিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থসমূহ থেকেও পরিপূরক বিষয়বস্তু গৃহীত হয়েছে। পাদটীকাসমূহ যার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। সমকালীন পাঠক সমাজের নিকট যেসব অধ্যায়ের বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে, সেগুলো বাছাই করা হয়েছে; এবং আরবি ভাষাতত্ত্বসহ সাধারণ পাঠকদের বোধগম্যতার বাইরের অন্যান্য বিষয়সমূহকে অনুবাদের বাইরে রাখা হয়েছে।

পরিশেষে আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, জ্ঞানের এই শাখাটি প্রত্যেক মুসলিমের কাছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাওয়ার দাবী রাখে। কারণ এতে রয়েছে কুরআন অধ্যয়ন ও তার বিধি-বিধান বাস্তবায়নের সঠিক নিয়মাবলী ও দিকনির্দেশনা। অতীতের উলামায়ে কেরামগণ নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর শিক্ষা এবং তাঁর সাহাবা رضي الله عنهم ও তাঁদের ছাত্রদের উপলব্ধি থেকে তাফসীরের যেসব মূলনীতি বের করে এনেছেন তা কুরআনের নির্দেশনা "..তোমরা যদি না জান, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো.." (আন-নাহ্ল, ১৬:৪৩,

আল-আম্বিয়া, ২১:৭) এবং নবী ﷺ এর হাদীস "প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞানার্জন বাধ্যতামূলক"[১] এর মূলনীতির সঠিক প্রতিনিধিত্ব করে।

জ্ঞানের এসব মৌলিক শাখায় অজ্ঞতা থাকলে তা ইসলামী শিক্ষার ভিত্তিসমূহের ব্যাপারে মারাত্মক ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করে এবং ইসলামের বিকৃতিসাধনে তৎপর লোকদের অপতৎপরতার জন্য ভয়ানক সুযোগ তৈরী করে দেয়। ইসলামী আবরণের নেপথ্যে লুকিয়ে থাকা সকল পথভ্রষ্ট ফির্কার লোকেরা নিজেদের ভুল মতাদর্শের সমর্থনে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উপস্থাপন করে থাকে। তাই কুরআনের এসব আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যাই কেবল ঈমানদারদেরকে ওদের ফাঁদে পা দেয়া থেকে সুরক্ষা দিবে ইনশা আল্লাহ।

আমার একান্ত প্রত্যাশা– মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষকে আসমানী জ্ঞানের আলোয় আলোকিতকরণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু একটি কার্যকর অবদানে পরিণত হোক এবং আল্লাহ তা'আলা এটিকে একান্ত তাঁরই উদ্দেশ্যে সম্পাদিত একটি ন্যায়নিষ্ঠ কাজ হিসেবে কবুল করুন।

ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস

১ আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এবং বাইহাকী কর্তৃক শু'আবুল ইমান ও ইবনু 'আদী কর্তৃক আল কামিল গ্রন্থে সংগৃহীত। হুসাইন ইবনু আলী, ইবনু আব্বাস, ইবনু উমার, ইবনু মাস'উদ, আলী ও আবু সাইদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এবং তাবারানী কর্তৃক তাঁর বিভিন্ন মু'জাম ও খতীব বাগদাদী কর্তৃক তাঁর তারীখ গ্রন্থে সংগৃহীত। শায়েখ আলবানী রহ. তাঁর সহীহ আল জামি' আস সগীর ওয়া যিয়াদাতিহ গ্রন্থে এ বর্ণনাটিকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। খণ্ড ২, পৃঃ ৭২৭, হাদীস নং ৩৯১৩।(রা.)

সূচনা

উসূলুত তাফসীর মূলত জ্ঞানের সেসব শাখাকে বুঝায় যা কুরআনের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যার জন্য অত্যন্ত জরুরী। যেমন আরবি ব্যাকরণ ও বাক্য প্রকরণ, আরবি সাহিত্য ও কুরআনের জ্ঞান বা 'উলূমুল কুরআন ইত্যাদি। কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যাকে যুগোপযোগী করে উপস্থাপন করতে চাইলে এ যুগের ব্যাখ্যাকারদের জন্য মৌলিক বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের মতো জ্ঞানের অন্যান্য আধুনিক শাখাসমূহের সাথে পরিচিত থাকাও বেশ জরুরী। কুরআনের ব্যাখ্যা যেন নিছক মানবীয় খেয়াল-খুশী ও ধ্যান-ধারণার ফল না হয়ে পড়ে, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই *উসূলুত তাফসীর* কুরআন ব্যাখ্যার বাস্তবসম্মত ও পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতিসমূহ তুলে ধরে। অতীতে এসব বিষয় *উসূলুল ফিক্‌হ* (ইসলামী আইনের মৌলিক নীতিমালা) বিষয়ক গ্রন্থ ও তাফসীর গ্রন্থসমূহের ভূমিকায় আলোচনা করা হতো।

উসূলুত তাফসীর বিষয়ে রচিত সর্বাধিক পরিচিত প্রাচীন গ্রন্থসমূহের অন্যতম হলো *মুকাদ্দিমাহ ফী উসূলিত তাফসীর*[১]। এর রচয়িতা ছিলেন 'ঈসায়ী ত্রয়োদশ শতকের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ رحمه الله।[২] এ বিষয়ে পরবর্তী সময়ের রচনাসমূহের মধ্যে ভারতীয় আলিম জনাব আব্দুল হামীদ ফারাহীর গ্রন্থটিই সম্ভবত সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি তার গ্রন্থের শিরোনাম দিয়েছিলেন আত *তাকমীল ফী উসূলিত তা'উইল।*[৩]

সাধারণভাবে *'উলূমুল কুরআন* পরিভাষা দ্বারা ব্যাপক অর্থে জ্ঞানের এমন সব শাখাকেই বুঝানো হয়, যা কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় অথবা যা স্বয়ং কুরআন থেকেই উৎসারিত। এসব জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে *তাফসীর* (ব্যাখ্যা), *কিরাআত* (বিশুদ্ধ পাঠ), *আর-রাসমুল উসমানী* (উসমানী পাণ্ডুলিপি), *ই'জাযুল কুরআন* (কুরআনের অলৌকিক দিক), *আসবাবুন নুযূল* (ওহী

১ এটি রিয়াদস্থ ইমাম ইবনু সাউদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটির জন্য ডঃ এম আব্দুল হক আনসারী প্রথমে অনুবাদ করেছিলেন এবং তা পরবর্তীতে ইংল্যান্ডে আল হিদায়াহ প্রেস কর্তৃক অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু দ্যা প্রিন্সিপলস অব তাফসীর শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

২ জন্ম ৬৬১ হিজরী/১২৬২ 'ঈসায়ী; মৃত্যু ৭২৮ হিজরী/১৩২৭ 'ঈসায়ী।

৩ লামহা-তুন ফী 'উলূমিল কুরআন, পৃঃ ১৯১-১৯২।

নাযিলের কারণ ও প্রেক্ষাপট), *আন নাসিখ ওয়াল মানসুখ* (রহিতকারী ও রহিত আয়াত), *ই'রাবুল কুরআন* (কুরআনের ব্যাকরণ), *গারীবুল কুরআন* (কুরআনের পরিভাষা), ধর্মীয় বিধি-বিধান এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক জ্ঞান।[১]

গ্রন্থ সঙ্কলনের যুগে *'উলূমুল কুরআন* এর বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মনোযোগ দেয়া হয় তাফসীর শাস্ত্রের উপর; কারণ কুরআন সংক্রান্ত বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সবক'টি এতে ব্যবহৃত হয়। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকের লেখকদের অন্যতম ছিলেন শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ, সুফিয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ এবং ওয়াকী ইবনুল জার্‌রাহ। তাদের তাফসীরসমূহ ছিল মূলত নবী ﷺ এর সাহাবী ও তাদের ছাত্র তাবি'ঈনদের মতামতগুলোর সঙ্কলন। তাদের পরে রয়েছেন ইমাম ইবনু জারীর আত তাবারী رحمه الله (মৃত্যু ৩১০ হিজরী)। তিনিও তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তবে তার তাফসীরকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। কারণ তিনিই সর্বপ্রথম সাহাবা ও তাবি'ঈনদের মতামত পর্যালোচনা করে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতটিকে বাছাই করেন এবং বাক্যবিন্যাসের ব্যাকরণগত দিকগুলো পর্যালোচনা করে আয়াত থেকে আইনগত সিদ্ধান্ত বের করে এনেছেন। তাফসীর শাস্ত্রের প্রতি এমন বিশেষ আগ্রহ সবসময়ই ছিলো এবং অদ্যাবধি তা একই রকম আছে; যার ফলে কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আরও অনেক রকম নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতি-প্রণালী আবিষ্কৃত হয়েছে।

'উলূমুল কুরআন এর অন্যান্য শাখায় ৯ম শতকে যারা লিখেছেন তাদের অগ্রভাগে রয়েছেন ইমাম বুখারী رحمه الله এর শিক্ষক আলী ইবনুল মাদীনি, যিনি *আসবাবুন নুযূল* এর উপর লিখেছেন। এরপর রয়েছেন আবু উবায়েদ আল কাসিম ইবনু সালাম, যিনি লিখেছেন *নাসিখ ও মানসূখ* এর উপর। কুরআনের অপ্রচলিত বিষয় বিন্যাস প্রক্রিয়া ও গঠন প্রণালীর উপর ১০ম শতকে যে প্রধান বিশেষজ্ঞ লিখেছেন তিনি ছিলেন আবু বকর সিজিস্তানী। অন্যদিকে ১১শ শতকের বিশেষজ্ঞ আলী ইবনু সাঈদ হুফী কুরআনের সাধারণ ব্যাকরণগত বাক্যবিনাসের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১২শ শতকে *মুবহামাতুল কুরআন* (কুরআনের অস্পষ্ট বিষয়াবলী) এর উপর গ্রন্থ প্রণয়নকারী প্রধান

১ মানাহিলুল ইরফান ফী 'উলূমিল কুরআন, পৃঃ ১৬।

বিশেষজ্ঞ ছিলেন আবুল কাসিম আব্দুর রহমান সাবীলী। তার পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আসেন ইবনু আব্দিস সালাম; যিনি লিখেছেন *মাজাযুল কুরআন* বা কুরআনের রূপক বিষয়াবলীর উপর। আরও রয়েছেন আলামুদ্দীন সাখাওয়ী; যিনি লিখেছেন তিলাওয়াতের উপর।[১]

এ সময়ের বিশেষজ্ঞগণ আলোচ্য বিষয়ে ব্যাপক তথ্য সরবরাহ করে তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ: যারা গারীবুল কুরআন এর উপর লিখেছেন তারা কুরআনের এমন প্রত্যেকটি শব্দ উল্লেখ করেছেন যা অপরিচিত কিংবা দ্ব্যর্থবোধক। আর যারা রূপক বিষয়াবলীর উপর গ্রন্থ সঙ্কলন করেছেন তারা কুরআনের রূপক অর্থবিশিষ্ট প্রতিটি শব্দ কিংবা বাক্যের ব্যাপারে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়েছেন। কুরআনী শিক্ষার অন্যান্য শাখায়ও তারা একইভাবে কাজ করেছেন। প্রতিটি বিষয়ের এই ব্যাপকতার ফলে সকল শাখায় পাণ্ডিত্য অর্জন কোনো একক ব্যক্তির জন্য পুরো জীবনের সমস্ত পরিশ্রম ব্যয় করলেও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তাই পরবর্তীকালের বিশেষজ্ঞগণ এক নতুন শাস্ত্রের বিকাশ সাধনে আগ্রহী হয়ে উঠলেন, যা এসব শাখার সবক'টির জন্য একটি নির্ঘণ্ট বা নির্দেশিকার মতো কাজ করবে। কালক্রমে জ্ঞানের এ শাখাটিই সবার কাছে 'উলূমুল কুরআন নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। ১০ম শতাব্দীর পূর্বে কোনো বিশেষজ্ঞ এ ধরনের কোনো গ্রন্থ লিখেছেন কিংবা লেখার পদক্ষেপ নিয়েছেন মর্মে কোনো লিখিত বিবরণ না থাকলেও এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রথম দিকের বিশেষজ্ঞদের মেধায় এসব জ্ঞানের ব্যাপক সমাহার ছিল।

ইমাম শাফেয়ী ﷺ (মৃত্যু ৮২০ 'ঈসায়ী) এর জীবনচরিতে একটি ঘটনা আছে যা এ বিষয়টির যথেষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করে। তিনি যখন ইয়েমেনের আলাভী উপদলের নেতা হওয়ার অভিযোগে শৃঙ্খলিত অবস্থায় বাগদাদে খলিফা হারুন-আর-রশীদের[২] সামনে আনীত হন, তখন আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে তার জ্ঞানের ব্যাপারে খলিফা তাকে জিজ্ঞেস করেন। ইমাম শাফেয়ী ﷺ জবাব দিয়েছিলেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহর কোন কিতাব সম্পর্কে আপনি জানতে চাচ্ছেন? কারণ, আল্লাহ তো অনেক কিতাব নাযিল

১ মানাহিলুল ইরফান ফী 'উলূমিল কুরআন, পৃঃ ২৪-২৫।
২ শাসনকাল ৭৮৬-৮০৯ 'ঈসায়ী।

করেছেন।” জবাবে খলিফা রশীদ বললেন, “চমৎকার উত্তর। তবে আমি জানতে চাচ্ছি আল্লাহর ঐ কিতাব সম্পর্কে যা তিনি আমার চাচাতো ভাই মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর নাযিল করেছেন।” ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ বললেন, “কুরআন সম্পর্কিত জ্ঞানের তো অনেক শাখা রয়েছে। আপনি কি *মুহ্কাম* ও *মুতাশাবিহ* সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন, নাকি *তাকদীম* ও *তা'খীর* সম্পর্কে, নাকি *নাসিখ* ও *মানসুখ* সম্পর্কে, নাকি ... সম্পর্কে, না কি ... সম্পর্কে?” ফলে খলিফা রশীদ কুরআনী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেন; আর প্রতিটি প্রশ্নে ইমাম শাফেয়ীর জবাব খলিফা ও উপস্থিত লোকদেরকে বিস্ময়াভিভূত করে দিয়েছিল।[১]

গ্রন্থকারদের নির্ঘণ্ট ইবনুন নাদীমের আল ফিহরিস্ত এর লিখিত বিবরণ অনুযায়ী *‘উলূমুল কুরআন* এর উপর সর্বপ্রথম বিশেষায়িত রচনা হচ্ছে *আল হাদী ফী ‘উলূমিল কুরআন* নামক দশম শতকের একটি গ্রন্থ, যার রচয়িতা ছিলেন আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনু খালাফ (মৃত্যু ৩০৯ হিজরী)। এটি ৪৭ খণ্ডে সমাপ্ত এক সুবিশাল রচনা; তবে এর কোনো অনুলিপি আমাদের নিকট পৌঁছেনি।[২] তারপর সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ হলো আলী ইবনু ইবরাহীম ইবনু সাঈদের (মৃত্যু ৩৩০ হিঃ) লেখা *আল বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন, যা হুফী* নামে সমধিক পরিচিত[৩]। মূল রচনাটি ছিল ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত, যার মধ্যে এখন ১৫ খণ্ড পাণ্ডুলিপি আকারে পাওয়া যায়।[৪] মূল রচনাটি *‘উলূমুল কুরআন* সম্পর্কিত কোনো সুবিন্যস্ত সঙ্কলন নয়, বরং তা মূলত রচিত হয়েছে তাফসীর আকারে; যেখানে লেখক প্রসঙ্গক্রমে *‘উলূমুল কুরআন* এর বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করেছেন।

১২শ শতকে ইবনুল জাওযী (মৃত্যু ৫৯৭ হিজরী) জ্ঞানের এ শাখায় *ফুনূনুল আফনান ফী ‘উয়ূনি ‘উলূমিল কুরআন* ও *আল মুজতাবা ফী ‘উলূমিন তাতা‘আল্লাকু বিল কুরআন* শিরোনামে দু'টি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার

১ মানাহিলুল ইরফান ফী ‘উলূমিল কুরআন, পৃঃ ২৫।
২ ‘উলূমুল কুরআন, পৃঃ ৬।
৩ শায়খ যারকানী তার মানাহিলুল ইরফান গ্রন্থে (খণ্ড ১, পৃঃ ২৭-৮) ভুলক্রমে এর নাম দিয়েছেন আল বুরহান ফী ‘উলূমিল কুরআন। হুফীর গ্রন্থের সঠিক শিরোনাম জানার জন্য দেখুন গ্রন্থকার ও তাদের গ্রন্থাবলীর উপর লিখিত বিশ্বকোষ আকৃতির নির্ঘণ্ট কাশফুয যুনূন, খণ্ড ১, পৃঃ ২৪২।
৪ এটি দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, মিশরে সুলভ।

প্রথমটি মুদ্রিত হয়েছে। দ্বিতীয়টি এখনো মিশরের দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাতে পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে। ত্রয়োদশ শতকে আরো দু'টি গ্রন্থ এসেছে– আলামুদ্দীন সাখাওয়ীর (মৃত্যু ৬৪১ হিজরী) *জামালুল কুর্‌রা* ও আবু শামাহ আব্দুর রহমান ইবনু ইসমা'ঈল মাকদাসীর (মৃত্যু ৭৭৫ হিজরী) *আল মুরশিদুল ওয়াজীয ফী মা ইয়াতা'আল্লাকু বিল কুরআনিল 'আযীয*।[১] বদরুদ্দীন যারকাশী (মৃত্যু ৭৯৪ হিজরী) চতুর্দশ শতকে *আল বুরহান ফী 'উলূমিল কুরআন* নামক বেশ মানসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং এটি প্রকাশিত হয়েছে।[২] তার পরে পঞ্চদশ শতকে আসেন মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান কাফিজী (মৃত্যু ৮৭৩ হিজরী) ও জালালুদ্দীন বালকিনী যিনি স্বীয় গ্রন্থ *মাওয়াকি'উল 'উলূম মিন মাওয়াকি'ইন নুজুম* এ কুরআনী জ্ঞানের পঞ্চাশটি ভিন্ন ভিন্ন শাখা চিহ্নিত করেছেন। একই শতকে জালালুদ্দীন সুয়ুতী (মৃত্যু ৯১১ হিজরী) 'উলূমুল কুরআনের উপর দু'টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তিনি তার প্রথম গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন *আত তাহ্‌বীর ফী 'উলূমিত তাফসীর,* যা ৮৭২ হিজরীতে সমাপ্ত হয়েছে। এটি ছোট আকারে মাত্র একটি খণ্ডে সমাপ্ত হলেও এতে কুরআনী জ্ঞানের ১০২ টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে। পরবর্তীতে তিনি সেসব বিষয়কে সমন্বিত ও সংক্ষিপ্ত করে ৮০টি-তে নিয়ে আসেন এবং পরে তিনি তার *আল ইতকান ফী 'উলূমিল কুরআন* নামক গ্রন্থে বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।[৩] শেষের গ্রন্থটি *'উলূমুল কুরআন* অধ্যয়নের ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রজন্মের বিশেষজ্ঞদের জন্য একটি মানসম্মত মৌলিক গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।

পরবর্তী তিন শতাব্দীতে *'উলূমুল কুরআন* শাখায় খুবই অল্প উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। তবে বিংশ শতাব্দীতে শায়েখ তাহির জাযায়েরীর ৩০০ পৃষ্ঠাব্যাপী *আত তিব্‌ইয়ান ফী 'উলূমিল কুরআন*[৪] শীর্ষক গ্রন্থের মাধ্যমে এ বিষয়ে লেখনীর এক নতুন উদ্দীপনা শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আল আযহার

---

১ তাইয়ার কুলাযের সম্পাদনায় ১৯৭৫ সালে দারুস সদীর কর্তৃক বৈরুতে প্রকাশিত।

২ মুহাম্মাদ আবুল ফযল ইবরাহীমের সম্পাদনায় ১৯৭২ (১৩৯১ হিজরী) সালে ইবরাহীম 'ঈসা আল বাবী আল হালাবী কর্তৃক (২য় সংস্করণ) প্রকাশিত।

৩ মানাহিলুল ইরফান ফী 'উলূমিল কুরআন, পৃঃ ২৭-৩০।

৪ আত তিব্‌ইয়ান লি বা'দিল মাবাহিসিল মুতা'আল্লিকাতি বিল কুরআন শিরোনামে ১৯১৫ (১৩৩৪ হিজরী) সালে মিশরে আল মানার কর্তৃক প্রকাশিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় অধ্যাপক স্ব স্ব বিভাগের জন্য ‘উলূমুল কুরআন বিষয়ে কিছু সংক্ষিপ্ত পাঠ রচনা করেন। এগুলোর বেশ কয়েকটি পরবর্তীতে প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে অধিকতর উল্লেখযোগ্য হলো আদ-দা'ওয়াহ ওয়াল ইরশাদ বিভাগের ছাত্রদের জন্য শায়খ মুহাম্মাদ আলী সালামাহ কর্তৃক প্রণীত *মিনহাজুল ফুরকান ফী ‘উলূমিল কুরআন*[১] নামক গ্রন্থ।[২] দু' খণ্ড বিশিষ্ট সহস্রাধিক পৃষ্ঠার *মানাহিলুল ইরফান ফী ‘উলূমিল কুরআন*[৩] শীর্ষক গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন উসূলুদ দ্বীন বিভাগে *‘উলূমুল কুরআন* ও *‘উলূমুল হাদীস* এর প্রাক্তন প্রভাষক শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল আযীম যারকানী। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ এ বিষয়ে বেশ কিছু মানসম্পন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেমন: সুবহী সালিহের *মাবাহিস ফী ‘উলূমিল কুরআন*, মান্না কাত্তানের *মাবাহিস ফী ‘উলূমিল কুরআন*, মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ দারাজের *মাদখাল ইলাল কুরআনিল কারীম*,[৪] মুহাম্মাদ আবু শাহবাহ'র *আল মাদখাল লি দিরাসাতিল কুরআন*[৫] ও ডঃ মুহাম্মাদ ইবনু লুতফী সাব্বাগের *লামহা-তুন ফী ‘উলূমিল কুরআন*।[৬]

---

১ জাওয়াহিরুল বায়ান ফী ‘উলূমিল কুরআন শিরোনামে প্রকাশিত।

২ মানাহিলুল ইরফান ফী ‘উলূমিল কুরআন, পৃঃ ৩১।

৩ মিশরে দারু ইহইয়াউল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত (৩য় সংস্করণ, ১৯৫৩)।

৪ ১৯৭১ সালেদারুল কলম প্রেস কর্তৃক বৈরুতে প্রকাশিত।

৫ ১৯৭৩ সালে মিশরে প্রকাশিত।

৬ মাকতাবাতুল ইসলাম কর্তৃক বৈরুতে প্রকাশিত, ৩য় সংস্করণ ১৯৯০।

১

কুরআনের তাফসীর

আল কুরআন মানবজাতির প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ গ্রন্থ। ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা যেসব মূলনীতির সমন্বয়ে গঠিত সেগুলোর সর্বপ্রধান উৎস হলো এই মহান কিতাব। আইন-কানুন, নীতিগর্ভ রূপক কাহিনি, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ইত্যাদির আদলে ঈমান আনয়নকারীদের জন্য এর আয়াতসমূহের মধ্যে রয়েছে অনেক উপদেশ, দিকনির্দেশনা ও তাদের বিশ্বাসের স্বপক্ষে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ। এ কারণে একজন ঈমানদারের ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি ও সফলতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে এই কুরআনকে অনুধাবন, আত্মস্থকরণ ও বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগের উপর। তবে, বুদ্ধিমত্তার স্বাভাবিক তারতম্যের কারণে কুরআনের মর্মার্থ অনুধাবনের গভীরতা ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কুরআনের বর্ণনাভঙ্গির সুস্পষ্টতা ও এর ওহীসমূহ সাতটি ভিন্ন ভিন্ন উপভাষায় নাযিল হওয়া সত্ত্বেও এমন তারতম্য সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। অধিকন্তু, মহাজ্ঞানী আল্লাহ কুরআনে বক্তব্য প্রকাশের সহজ-সরল প্রক্রিয়া বেছে নিয়েছেন। আবার ব্যাখ্যাও করে দিয়েছেন। কোনো কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য আয়াতের মাধ্যমে তিনি নিজেই প্রদান করেছেন, আবার কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা তিনি নবী ﷺ-কে জানিয়েছেন। নবী ﷺ গোটা কুরআন জানতেন ও বুঝতেন, কারণ আল্লাহ তাকে তাঁর এ বাণী বহনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাই তাঁকে তিনি এর পূর্ণ ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُۥ ﴿١٩﴾

"নিঃসন্দেহে (তোমার অন্তরে) কুরআন সংরক্ষণ করে দেয়া এবং (তোমাকে) তা পাঠ করে শুনিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার[১], অতএব, আমি যখন তোমার নিকট তা

---

১ আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করা হলে এখানে অর্থ হবে 'আমাদের'। ইংরেজিতে রাজকীয় অর্থে 'আমি' এর পরিবর্তে 'আমরা' শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না, তবে এটি আরবি ভাষারীতির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য যা

পাঠ করব (জিবরীলের মাধ্যমে), তুমি তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো। এরপর তা ব্যাখ্যা করে দেয়ার দায়িত্বও আমার।" (আল কিয়ামাহ, ৭৫: ১৭-১৯)

অতএব, নবী ﷺ এর দায়িত্ব ছিল বাস্তব অনুশীলন ও বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁর অনুসারীদের কাছে কুরআনের ব্যাখ্যা তুলে ধরা। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়টি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত করেছেন:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ.... ﴿٤٤﴾

"এবং তোমার প্রতি আমি নাযিল করেছি যিক্‌র (কুরআন), যাতে তুমি মানুষের কাছে তাদের জন্য যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার তাৎপর্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পারো।" (আন নাহ্‌ল, ১৬: ৪৪)

একারণে নবী ﷺ এর জীবদ্দশায় যখনই প্রয়োজন হতো তখনই কুরআনের তাফসীর বুঝে নেওয়ার জন্য সাহাবায়ে কেরামগণ তার শরণাপন্ন হতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইবনু মাস'উদ ؓ বর্ণনা করেন যে, যখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছিল:

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

"যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশিয়ে ফেলেনি, তাদেরই জন্য কেবল নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।" (আল আন'আম, ৬: ৮২)

তখন কতিপয় সাহাবী খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। কারণ ছোট-বড় যে কোনো প্রকার ভুল-ত্রুটি ও অন্যায় যুলম শব্দের সাধারণ ভাষাগত অর্থের অন্তর্ভুক্ত; আর তাদের কেউই নিজেদেরকে ত্রুটিমুক্ত মনে করতেন না। তারা এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা জানার জন্য নবী ﷺ এর দ্বারস্থ হলে তিনি বললেন,

لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

বক্তার গুরুত্ব নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়। আমি সাধারণত এ ধরনের 'আমরা'কে 'আমি' দ্বারা অনুবাদ করি, কারণ আক্ষরিক অনুবাদটি অন্যান্য ভাষাভাষীদের নিকট প্রায়ই একটি দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

"তোমরা সবাই যেমনটা মনে করছো, ব্যাপারটা আসলে তা নয়। লুকমান যেমন তাঁর ছেলেকে বলেছেন, "হে পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শির্ক অতি বড় যুল্ম।" এটি তার থেকে বেশী কিছু নয়।[১]

এভাবে নবী ﷺ তাদের সামনে স্পষ্ট করে দিলেন যে, যুলমের ব্যাপক অর্থ এখানে আয়াতের মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং শির্ক বুঝানোর জন্যই এখানে যুল্ম শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

এ ঘটনায় আমরা দেখতে পেলাম যে, নবী ﷺ নিজেও কুরআনকে কুরআন দ্বারাই ব্যাখ্যা করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি কুরআন বুঝা ও ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত সর্বপ্রধান পদ্ধতিটি দেখিয়ে দিয়েছেন; যা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের সকল প্রজন্মের জন্য অপরিবর্তনীয় মূলনীতি হিসেবে বহাল থাকবে। নবী ﷺ এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরামগণ তাঁদের মধ্যে এমন সাহাবীদের দ্বারস্থ হতেন যারা ছিলেন কুরআন অনুধাবন ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত সহজাত গুণের অধিকারী।

সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে যারা তাঁদের কুরআনের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতার কারণে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন– চারজন খোলাফায়ে রাশেদীন,[২] নবী ﷺ এর স্ত্রী আয়েশা বিনতু আবি বকর, আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, উবাই ইবনু কা'ব, যাইদ ইবনু সাবিত, আবু মূসা আশআরী, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের, আনাস ইবনু মালিক, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস رضي الله عنهم।[৩] নবী ﷺ এর ইন্তেকালের পর মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামগণ ইসলামকে তৎকালীন পরিচিত বিশ্বের প্রায় সকল প্রান্তে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর এ প্রক্রিয়ায় পদানত করেছিলেন পারস্য ও বাইজান্টাইনদের বিখ্যাত সাম্রাজ্যসমূহ। যেখানেই মুসলিম সেনাবাহিনী তাদের অগ্রাভিযান থামাতেন, সেখানেই কতিপয় সাহাবী বসতি স্থাপন করে ইসলামের সংস্পর্শে আসা লোকদেরকে কুরআন পাঠ ও তার ব্যাখ্যা শেখানো শুরু করতেন। এ কারণে তাফসীরের জ্ঞান গোটা মুসলিমবিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে

---

১ সহীহ মুসলিম, খণ্ড ১, পৃঃ ৭২, হাদীস ২২৬ এবং এ হাদীসে উদ্বৃত কুরআনের আয়াতটি হলো সূরা লুকমানের ১৩ নং আয়াত।

২ আবু বকর সিদ্দিক, উমার ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনু আফ্ফান এবং আলী ইবনু আবি তালিব।

৩ আল ইতকান ফী 'উলূমিল কুরআন, খণ্ড ২, পৃঃ ২৩৯।

পড়ে এবং সর্বত্র কুরআন শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। সাহাবীদের চারপাশে জড়ো হওয়া লোকদের মধ্যে এমন কিছু অসাধারণ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন যারা তাঁদের ছাত্র হিসেবে থেকে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের জ্ঞান পূর্ণরূপে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। এসব ছাত্ররা পরবর্তীতে তাবি'উন নামে পরিচিত হয়ে উঠেন। প্রত্যেক সাহাবী এমন অনেক বিষয় জানতেন যা অন্যান্য সাহাবীরাও জানতেন, আবার এমন কিছু বিষয়ও ছিলো যা কোনো বিশেষ সাহাবী এককভাবে জানতেন। একারণে ছাত্রদের কেউ কেউ জ্ঞানের ব্যাপ্তি বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য সাহাবীদের সান্নিধ্য অর্জন করেছিলেন। আবার কেউ কেউ তার শিক্ষক সাহাবার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কাছেই অবস্থান করেছিলেন।

তাফসীরের বিভিন্ন কেন্দ্র

সাহাবায়ে কেরামদের এ যুগে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য যেসব স্থানসমূহ তাফসীরকেন্দ্র হিসেবে বিকাশ লাভ করে সেগুলো হলো মক্কা, মদীনা ও ইরাক। মক্কাতে ইবনু আব্বাস ﵄ তাফসীরের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন। তাকে সাহাবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাফসীর বিশেষজ্ঞ মনে করা হতো। তিনি বর্ণনা করেন যে, একবার নবী ﷺ তাকে আলিঙ্গান করে তার জন্য নিম্নোক্ত দু'আ করেছিলেন:

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ

"হে আল্লাহ, তুমি তাকে দ্বীনের গভীর উপলব্ধি দান করো এবং তাকে [কুরআন] ব্যাখ্যার সূক্ষ্ম জ্ঞান দান করো।"[১]

বর্ণিত আছে যে, সাহাবীদের মধ্যে ব্যাপক পান্ডিত্যের অধিকারী আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ ﵁ তাকে তরজুমানুল কুরআন[২] বা কুরআনের মুখপাত্র উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। ইবনু আব্বাস ﵄ এর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছাত্র

১ মুসনাদে ইমাম আহমদ হাদিস নং ২২৭৪। তাঁর জন্য নবী (সা.) এর দু'আর শুধু প্রথমার্ধ উল্লিখিত হয়েছে এমন একটি ভাষ্য বর্ণিত হয়েছে সহীহ বুখারী (খন্ড ১, পৃঃ ১০৬, নং ১৪৫) ও সহীহ মুসলিমে (খন্ড ৪, পৃঃ ১৩২০-১, নং ৬০৫৫)।

২ হাকিম ও ইবনু সা'দ কর্তৃক আত তাবাকাত গ্রন্থে সংগৃহীত। দেখুন সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খন্ড ৩, পৃঃ ৩৪৭।

ছিলেন মুজাহিদ ইবনু জাবর, ইবনু আব্বাসের আযাদকৃত দাস ইকরিমাহ, সাঈদ ইবনু জুবাইর, তাউস ইবনু কীসান ইয়ামানী এবং আতা ইবনু আবী রাবাহ رحمهم الله প্রমুখ।[১]

মদীনায় সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য তাফসীর কেন্দ্রটি ছিল উবাই ইবনু কা'ব رضي الله عنه এর। তাকে তার সমসাময়িকদের বেশীরভাগই কুরআন তিলাওয়াতে পারদর্শীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হিসেবে বিবেচনা করতেন। উবাই رضي الله عنه ছিলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যাকে নবী ﷺ কুরআনের ওহী লিপিবদ্ধ করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন।[২] নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি তাকে বলেছিলেন,

إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ [لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ]

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাকে এ আয়াতটি পড়ে শোনানোর জন্য, 'লাম ইয়াকু নিল্লাযীনা কাফারু মিন আহলিল কিতাবি' (সূরাহ আল বায়্যিনাহ)।" উবাই رضي الله عنه জিজ্ঞেস করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার নাম ধরে উল্লেখ করেছেন কি না, তখন নবী ﷺ তাকে বললেন হ্যাঁ! উবাই একথা শুনে কেঁদে দিলেন।[৩] উবাই رضي الله عنه এর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছাত্র ছিলেন যাইদ ইবনু আসলাম, আবুল আলিয়াহ এবং মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব কুরাযী رحمهم الله প্রমুখ।[৪]

ইরাকে সর্বাধিক পরিচিত তাফসীর কেন্দ্রটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ رضي الله عنه। অগ্রবর্তিতার দিক থেকে ইসলাম গ্রহণে তিনি ছিলেন ষষ্ঠ ব্যক্তি[৫] আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ رضي الله عنه ছিলেন শীর্ষস্থানীয় তিলাওয়াত বিশেষজ্ঞদের অন্যতম। স্বয়ং নবী ﷺ তার তিলাওয়াতের প্রশংসা করে বলেছেন,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ

---

১ আল ইতকান ফী 'উলূমিল কুরআন, খণ্ড ২, পৃঃ ২৪২। মজার ব্যাপার হলো এই যে, এসব বিশেষজ্ঞের সবাই ছিলেন সাবেক কৃতদাস।

২ এটি ওয়াকিদীর মতো যা আল ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস সাহাবাহ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। সম্ভবত তিনি মদীনার সময়ের কথা বলেছিলেন।

৩ সহীহ আল বুখারী, খণ্ড ৫, পৃঃ ৯৭, নং ১৫৪ ও সহীহ মুসলিম মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃঃ ১৩১৩, নং ৬০৩১।

৪ মাবাহিস ফী 'উলূমিল কুরআন, পৃঃ ৩৩৯।

৫ সিফাতুস সফওয়াহ, খণ্ড ১, পৃঃ ৩৯৫।

"যে ব্যক্তি কুরআন নাযিলের হৃদয়গ্রাহী রীতি অনুযায়ী তিলাওয়াত করতে চায় তার উচিত ইবনু উম্মি আবদ (ইবনু মাস'উদ) এর তিলাওয়াত রীতি অনুসরণ করা।"[১]

তার তাফসীর বিষয়ক জ্ঞান প্রসঙ্গে ইবনু মাস'উদ ﵁ নিজেই বলেন, "তাঁর শপথ যিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই, আল্লাহর কিতাবের প্রত্যেকটি আয়াত কোথায় এবং কোন প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছিল তা আমি জানি।"[২]

ইবনু মাস'উদের অনেক ছাত্রদের মধ্যে যারা নিজ নিজ গুণে পরবর্তীতে বিখ্যাত আলিমে পরিণত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন হাসান বসরী, আলকামা ইবনু কায়েস, মাসরুক, আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ এবং আ-মির শা'বী ﵏ প্রমুখ।[৩]

তাফসীর জ্ঞানের সম্প্রসারণ

এ যুগে মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমেই প্রধানত তাফসীর শেখানো হতো। তাফসীর কেন্দ্রসমূহের নেতৃত্বে থাকা সাহাবায়ে কেরামগণ কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নবী ﷺ এর সেসব বক্তব্যের উদ্বৃতি দিতেন যা সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা অথবা তা নাযিলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতো। সাধারণ্যে অপ্রচলিত শব্দের ভাষাগত অর্থ ব্যাখ্যা করার জন্য অনেক সময় তারা প্রাক-ইসলামী যুগের আরবি কবিতা পঙ্ক্তির উদ্বৃতি দিতেন। সাহাবায়ে কেরামদের যুগের পর তাদের ছাত্র তাবি'উনগণ যে পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করেছিলেন তারাও মোটামুটি সেভাবেই মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে শিক্ষাদান অব্যাহত রাখেন। তবে তাদের কেউ কেউ সাহাবাদের থেকে শেখা তাফসীর বর্ণনার পাশাপাশি কুরআনের কিছু আয়াতের বাড়তি ব্যাখ্যা প্রদানের লক্ষ্যে আহ্‌লে কিতাবদের থেকে বিভিন্ন কাহিনি (ইসরাঈলী রেওয়ায়াত) বর্ণনা করতে শুরু করেন।

উল্লেখ্য যে, তাফসীরের কিছু সঙ্কলন তাবি'ঈদের যুগেই শুরু হয়েছিল। এক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হলো ইবনু আব্বাসের ছাত্র মুজাহিদ

---

১ উমার, ইবনু মাস'উদ ও অন্যান্য সাহাবী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম আহমদ, ইবনু মাজাহ (খণ্ড ১, পৃঃ ৭৭, নং ১৩৮), হাকিম ও অন্যান্য। সহীহ জামিই সগীর গ্রন্থে আলবানী একে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

২ সহীহ মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃঃ ১৩১২, নং ৬০২৩।

৩ মাবাহিস ফী 'উলুমিল কুরআন, পৃঃ ৩৩৯।

ইবনু জাবর ﵀ (৬৪২-৭২২ 'ঈসায়ী/৪০-১০৩ হিঃ) এর তাফসীর। তিনিই সবার আগে তাফসীর সঙ্কলন করেছিলেন, যদিও তার তাফসীরের কোনো অনুলিপি আমাদের কাছে পৌঁছায়নি। মুজাহিদ ﵀ এর নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে তার তাফসীরের তাৎপর্য মূল্যায়ন করা যেতে পারে। তিনি বলেন, ‘‘আমি ইবনু আব্বাসের নিকট গোটা কুরআন তিনবার অধ্যয়ন করেছি। প্রত্যেকবার অধ্যয়নের সময় প্রত্যেকটি আয়াত শেষে থেমে আমি তাকে জিজ্ঞেস করতাম- কেন এবং কার প্রসঙ্গে তা নাযিল হয়েছে।’’[১]

উমাইয়া শাসনের শেষের দিকে[২] নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাফসীর সঙ্কলনের কাজ শুরু হয়। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিভিন্ন পরিচ্ছেদে নবী ﷺ এর সুন্নাহ সঙ্কলন শুরু করেন, আর সেসব সঙ্কলনে তাফসীর বিষয়েও একটি পরিচ্ছেদ থাকতো। এসব বিশেষজ্ঞের কেউ কেউ নবী ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবি'ঈদের থেকে বর্ণিত তাফসীর বর্ণনার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে প্রথম সারিতে ছিলেন ইয়াযীদ ইবনু হারুন সালামী (মৃত্যু ৭৩৭ 'ঈসায়ী/১১৮ হিজরী), শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ (মৃত্যু ৭৭৭ 'ঈসায়ী/১৬০ হিজরী), সুফিয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ (মৃত্যু ৮১৪ 'ঈসায়ী/ ১৯৮ হিজরী), আব্দুর রাজ্জাক ইবনু হাম্মাম (মৃত্যু ৮২৭ 'ঈসায়ী/ ২১১ হিজরী) এবং আব্দ ইবনু হুমাইদ (মৃত্যু ৮৬৪ 'ঈসায়ী/ ২৫০ হিজরী) ﵏ প্রমুখ।[৩] তবে এ সময়েও সমগ্র কুরআনের উপর একক কোনো তাফসীর সঙ্কলিত হয়নি।[৪]

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে তাফসীর শাস্ত্র ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে বিকশিত হয়। বিশেষজ্ঞদের এ প্রজন্ম সর্বপ্রথম কুরআনের লিখিত পাঠের ক্রমধারা অনুযায়ী তাফসীর সঙ্কলন করেন। এ সময়ের বিশেষজ্ঞ আলিমদের রচিত সর্বপ্রাচীন যে তাফসীরটি আমাদের নিকট পৌঁছেছে তার রচয়িতা ছিলেন ইমাম ইবনু জারীর তাবারী ﵀ (৮৩৯-৯২৩ 'ঈসায়ী/২২৫-৩১০ হিজরী)। সমকালীন অন্যান্য তাফসীর রচয়িতাদের মধ্যে

---

১ ইবনু নুয়াইম কর্তৃক হিল ইয়াতুল আউলিয়া গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির কর্তৃক সংগৃহীত। দেখুন সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খণ্ড ৪, পৃঃ ৪৫০।

২ ১৩২ হিজরীতে (৭৫০ 'ঈসায়ী) উমাইয়ারা ক্ষমতাচ্যুত হন।

৩ তাফসীর বিষয়ক হাদীস সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে হলে সহীহ আল বুখারীর তাফসীর সংক্রান্ত অধ্যায় দেখে নিন।

৪ মাবাহিস ফী 'উলূমিল কুরআন, পৃঃ ৩৪০-১।

রয়েছেন ইমাম ইবনু মাজাহ (মৃত্যু ৮৮৬ 'ঈসায়ী/২৭২ হিঃ), ইমাম ইবনু আবী হাতিম (মৃত্যু ৯৩৯ 'ঈসায়ী/৩২৭ হিঃ), ইমাম ইবনু হিব্বান (মৃত্যু ৯৮০ 'ঈসায়ী/৩৬৯ হিঃ), ইমাম হাকিম (মৃত্যু ১০১৪ 'ঈসায়ী/৪০৪ হিঃ) এবং ইমাম ইবনু মারদুওয়াইহ ﷫ (মৃত্যু ১০২০ 'ঈসায়ী/৪১০ হিঃ) প্রমুখ।[1]

এসব বিশেষজ্ঞের প্রায় সবাই হাদীস সঙ্কলনের জন্যও বিখ্যাত ছিলেন এবং তাদের সংকলনগুলোর অধিকাংশই আমাদের নিকট অবিকৃত অবস্থায় পৌঁছেছে। মাঝেমধ্যে কিছু তাফসীর আতবা'উত তাবি'ঈন বা তাদের ছাত্রদের দ্বারা কৃত বলে দাবী করা হয়েছে। এসব তাফসীরে আয়াত থেকে উৎসারিত বিভিন্ন আইনগত (ফিক্হী) সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজনবোধে বাক্য গঠনের ব্যাকরণগত ব্যাখ্যাও উল্লেখ করা হয়েছে।

যদিও বিশেষজ্ঞদের পরবর্তী প্রজন্ম তাদের পূর্বসূরীদের ন্যায় একই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, তবুও তাদের অনেকে তার তাফসীর থেকে বর্ণনাসূত্র মুছে ফেলে কেবল সাহাবায়ে কেরাম কিংবা তাবি'ঈদের নাম ও তাদের ব্যাখ্যাসমূহ অবশিষ্ট রেখেছেন। উদাহরণস্বরূপ, আবুল লাইছ সমরকন্দীর (মৃত্যু ৯৮৩ 'ঈসায়ী/৩৭২ হিঃ) লেখা বাহ্রুল 'উলূম নামক গ্রন্থ। এসব তাফসীরের অনেকগুলোতেই সাহিত্যরূপ ও ব্যাকরণগত ব্যাখ্যার উপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বর্ণনাসূত্র উল্লেখ না করেই তিলাওয়াতের বিভিন্ন পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তা মূল পাঠের ব্যাখ্যা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি তারা তাদের তাফসীরসমূহে বক্তার নাম উল্লেখ না করে অনেক বক্তব্য এবং মতামতও উল্লেখ করেছেন। ফলশ্রুতিতে এসব গ্রন্থের অনেকগুলোই তাফসীরের বিশুদ্ধ ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। বিশুদ্ধ বর্ণনা ও ব্যাখ্যাসমূহ কোনোরূপ পার্থক্যরেখা না রেখেই অশুদ্ধের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

অধিকন্তু, এসব কারণে ব্যক্তিগত মত অনুযায়ী তাফসীর রচনার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। অচিরেই তাফসীর গ্রন্থসমূহে মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন রকম চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটতে শুরু করে। ৪র্থ ও ৫ম হিজরী তথা একাদশ ও দ্বাদশ 'ঈসায়ী শতকে এসে গ্রীক দর্শনের প্রধান প্রধান শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহ

১ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪১।

(বিগত শতাব্দীসমূহে যেগুলো অনূদিত হয়েছিল) ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব ক'টি শাখার উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। মু'তাযিলাদের (তর্কবাদী) মতো দার্শনিক গোষ্ঠীগুলো বিকশিত হয়ে ইসলামের বিশুদ্ধ চিন্তাধারাকে মারাত্মক হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। যামাখশারীর (১০৭৫-১১৪৪ 'ঈসায়ী/৪৬৭-৫৩৮ হিঃ) আল কাশ্‌শাফ কিংবা ফখরুদ্দীন রাযীর (১১৪৯-১২১০ 'ঈসায়ী/৫৪৪-৬০৬ হিঃ) মাফাতীহুল গাইব এর মতো দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষাসমৃদ্ধ তাফসীরসমূহ এবং বিভিন্ন পথভ্রষ্ট ফিরকাসমূহের চিন্তা-ভাবনাযুক্ত তাফসীরসমূহও এ যুগে আত্মপ্রকাশ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ: মোল্লা মুহসিন কাশের তাফসীর ইসনা আশারী। এ গ্রন্থে কুরআনের আয়াতের আলোকে মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, বার জন ইমাম ভুলের ঊর্ধ্বে, নবী ﷺ এর জামাতা আলীর কাল্পনিক ওলায়াহ/বেলায়েত বা শাসনক্ষমতা অবশ্যই শিরোধার্য এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাদে নবী ﷺ এর সকল সাহাবী মুরতাদ বা ধর্মদ্রোহী হয়ে গেছেন। আর ইবনু আরাবীর সুফীবাদী তাফসীর কুরআনের আয়াতগুলো দিয়ে তার 'আল্লাহ সবকিছু এবং সবকিছুই আল্লাহ'– শীর্ষক সর্বেশ্বরবাদী মতবাদের আওয়াজ উঠিয়েছে।[1]

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা বেশ কিছু ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিকশিত হওয়ার ফলে ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিশেষায়নের একটি প্রবণতাও গড়ে উঠে। ফলশ্রুতিতে ইমাম জাসসাস (৯১৭-৯৮০ 'ঈসায়ী/৩০৪-৩৬৯ হিঃ) ও ইমাম কুরতুবী (মৃত্যু ১২৭৩ 'ঈসায়ী/৬৭১ হিঃ) رحمه الله এর মতো বিদগ্ধ মুফাস্‌সিরগণও কুরআনের তাফসীর থেকে নিজ নিজ মাযহাব অনুসারে ফিক্‌হ (ইসলামী আইন) বের করে আনার উপর মনোনিবেশ করেন। একইভাবে প্রাচীন ইতিহাসের উপাখ্যানের উপর বিশেষ জ্ঞানী ইমাম সা'লাবী رحمه الله রচনা করেন 'আল জাওয়াহিরুল হিসান ফী তাফসীরিল কুরআন', যেখানে তিনি বিশুদ্ধতা যাচাই-বাছাই না করে প্রাচীনকালের সব বর্ণনা জড়ো করেছেন।[2]

---

১ মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল আরাবী ছিলেন আন্দালুসের বাসিন্দা। তবে তিনি বিভিন্ন দেশে ব্যাপক ভ্রমণ শেষে ইরাকে ইন্তেকাল করেন। একজন প্রভাব বিস্তারকারী লেখক হিসেবে প্রায় তিন শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি। এসবের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতনামা গ্রন্থগুলো হলো আল ফুতুহাতুল মাক্কিয়্যাহ ও ফুসূসুল হিকাম। তিনি কুরআনের উপর নয়টি ভিন্ন ভিন্ন তাফসীর লিখেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো তারজুমানুল আশওয়াক, যার জন্য তিনি বেশ কিছু ভাষ্য রচনা করেছিলেন।

২ আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরুন, খণ্ড ১, পৃঃ ১৪৫-১৪৮।

এ যুগ এবং এর পরবর্তী প্রজন্মের তাফসীরসমূহে বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধ বক্তব্যের বেশ সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। এসব তাফসীরে যদিও কিছু মূল্যবান তথ্য বিদ্যমান রয়েছে, তবে তার বহুলাংশই হলো অপ্রয়োজনীয়। এভাবে এক পর্যায়ে ব্যক্তিগত মতামত ভিত্তিক তাফসীর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা ভিত্তিক তাফসীরের উপর প্রাধান্য লাভ করে। নিজ নিজ মাযহাব, দল, উপদল ও গোষ্ঠীর মতবাদ ও চিন্তাধারার সমর্থন এবং অন্যদের মতামতসমূহকে খণ্ডনের জন্য এসব তাফসীরের লেখকবৃন্দ অনেক সময় আয়াতের মূল অর্থকে টেনে-হিঁচড়ে সম্প্রসারিত করতেন। আর এভাবে আয়াতে নিহিত দ্বীনি তাৎপর্য ও দিকনির্দেশনা বিশ্লেষণে তাফসীরের যে মৌলিক ভূমিকা ছিল তা ক্রমান্বয়ে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাফসীর বিশেষজ্ঞ জালালুদ্দীন সুয়ূতী رحمه الله (মৃত্যু ১৫০৫ 'ঈসায়ী/৯১০ হিঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন,

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝٧

"...তাদের পথ নয় যাদের উপর তোমার অভিসম্পাত পড়েছে এবং যারা বিভ্রান্ত হয়েছে।" (আল ফাতিহা, ১:০৭)

আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি প্রায় দশটি ভিন্ন ভিন্ন মত দেখেছি, অথচ নবী ﷺ সাহাবায়ে কেরাম ও তাবি'ঈনদের সবাই বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতের মাধ্যমে কেবল ইহূদী ও খ্রিস্টানদেরকেই বুঝানো হয়েছে। প্রথম দিকের বিশেষজ্ঞ আলিম ইমাম ইবনু আবি হাতিম এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, "এ আয়াতের এ ব্যাখ্যার ব্যাপারে তাফসীর বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কারও কোনো মতবিরোধ আছে বলে আমি জানি না।"[১]

এ যুগ ও তার পরবর্তী সময়ের বিশেষজ্ঞগণ ইতিপূর্বে রচিত গ্রন্থগুলোর সারসংক্ষেপ রচনা কিংবা তার পাদটীকা লেখার মধ্যে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখেন। তবে এটাও সত্য যে, তাফসীরসহ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় যে বিচ্যুতি ও বন্ধ্যাত্ব জেঁকে বসেছিল, তা সত্ত্বেও সে যুগে এমন কতিপয় বিখ্যাত আলিমের আবির্ভাব ঘটে যারা বিশুদ্ধ ইসলামী চিন্তাধারার পতাকাকে সমুন্নত রেখেছিলেন। তাই দেখা যায় যে, সর্বকালের সর্বাধিক

১ মাবাহিস ফী 'উলূমিল কুরআন, পৃঃ ৩৪৫ এ উদ্ধৃত।

প্রশংসিত তাফসীরটিও এ যুগেরই এক বিশেষজ্ঞ আলিম রচনা করেছিলেন। আর তা হলো হাফিয ইবনু কাসীর ﷬ (মৃত্যু ১৩৭৩ 'ঈসায়ী/৭৭৪ হিঃ) এর তাফসীরুল কুরআনিল আযীম যা 'তাফসীরে ইবনে কাসীর' নামে সমধিক পরিচিত।

আমাদের বর্তমান যুগে এসে এক নতুন ধরনের তাফসীর বিকাশ লাভ করেছে যেখানে গ্রন্থকারগণ কুরআনের আয়াতসমূহের আলোকে বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন নতুন বিষয় ও প্রয়োজনকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস চালিয়েছেন। যেমন 'তাফসীরুল মানার'। মুহাম্মাদ আব্দুহুর শুরু করা এ তাফসীর তার ছাত্র মুহাম্মাদ রশীদ রেজা সূরা ইউসুফ পর্যন্ত সম্পন্ন করেছেন।[১] অথবা 'তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন'। এসব তাফসীরে মানবসমাজের কুরআনী ভিত্তি, আইন প্রণয়ন ও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিষয়ে কুরআনী দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে আলোকপাত করা রয়েছে।

উভয় তাফসীরেরই সমালোচক রয়েছে। মুহাম্মাদ আব্দুহু ছিলেন পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার লক্ষ্যে মুসলিম সমাজের সংস্কার সাধনে আগ্রহী। আর সে সংস্কারের সূচনা হিসেবে তিনি সকল ধরনের তাকলীদ পরিত্যাগ করার আহ্বান জানান। অতীতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হয়ে একেবারে নতুন করে কুরআনের মুখোমুখি হওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন তিনি। আর একারণে তিনি কিংবা মুহাম্মাদ রশীদ রেজা– কেউই কুরআনের কোনো আয়াতের ব্যাপারে নিজেদের ব্যাখ্যা লেখা সম্পন্ন করার আগে অন্য কারো তাফসীর খুলে দেখা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকেন।[২] বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের সাথে সঙ্গতিসাধনের প্রতি প্রবল উৎসাহের কারণে বেশ কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এ গ্রন্থে। যেমন আব্দুহু ফেরেশতাদেরকে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের সমার্থক হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন যা তাকে আদম ﷺ

---

১ আব্দুহুর তাফসীর বিষয়ক বক্তৃতা থেকে সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করে তার অনুমোদনক্রমে মুহাম্মাদ রশীদ তার নিজের ভাষায় লিখে স্বীয় পত্রিকা আল মানার এ প্রকাশ করেন। সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নিসার ১২৬ নং আয়াত পর্যন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর আব্দুহু ইন্তেকাল করেন। অতঃপর তার ছাত্র ১৯৩৫ সালে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এ তাফসীর রচনার কাজ অব্যাহত রাখেন। (লামহা-তুন ফী 'উলূমিল কুরআন, পৃঃ ৩২১)।

২ লামহা-তুন ফী 'উলূমিল কুরআন, পৃঃ ৩২২, এবং আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরুন, খণ্ড ২, পৃঃ ৫৯৮-৯।

ও ইবলীসের ঘটনার একটি প্রতীকী ব্যাখ্যা প্রদানে প্ররোচিত করেছে।[১] নবী ﷺ কুরআন পৌঁছে দেয়া ছাড়া অন্য কোনো অলৌকিক কাজ করেছেন— এমন বিষয়কে তার ছাত্র সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি এবং তার ছাত্র উভয়েই বুখারী ও মুসলিমের বর্ণিত বেশ কিছু হাদীসকে দুর্বল আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[২] রেজা অবশ্য হাদীস শাস্ত্রে আব্দুহুর তুলনায় অধিক পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন এবং তার তুলনায় হাদীসের উপর অধিক নির্ভর করেছেন।[৩] তবে তাদের উভয়েই যখনই উপযুক্ত মনে করেছেন তখনই ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নিজেদের বুদ্ধিমত্তাকে প্রচুর স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

শহীদ সাইয়েদ কুতুব رحمه الله এমন এক সময়ে এসেছিলেন যখন পৃথিবীতে ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা সবেমাত্র বিলুপ্ত হয়েছে। ইসলামী বিশ্ব ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে এমন সব আইনব্যবস্থা গ্রহণ করে নিয়েছিল যা ছিল ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের মারাত্মক কুপ্রভাব। ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলিম জাতির লোকেরা শরীয়াহকে পরিত্যাগ করায় তিনি মনের মধ্যে প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করেছিলেন। তিনি তাওহীদের মর্মকথার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মানবসমাজ শাসনের জন্য আইন প্রণয়নে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও একচ্ছত্র অধিকারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এ দিকটার উপর খুব বেশী জোর দেয়ার ফলে তাওহীদের অন্যান্য দিক ও আইন প্রণয়নের শির্ক ব্যতীত অন্যান্য ধরনের শির্কের ভয়াবহতা কিছুটা উপেক্ষিত হয়েছে। এই সুযোগ নিয়ে তার সমালোচকরা বলতে আরম্ভ করেছেন যে, তিনি তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ ও তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ এর মধ্যকার পার্থক্যের ব্যাপারে হয়তো দ্বিধার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন।[৪] তার সমালোচকরা আরো বলেন যে, 'প্রকৃত ইসলামের সাথে সমসাময়িক মুসলিম সমাজের কোনো সম্পর্ক নেই'—মর্মে ঢালাও সমালোচনা ও ইসলামী ইতিহাসের বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলোর অধিক প্রশংসার মাধ্যমে তিনি বর্তমান যুগের আধুনিক তাকফীর আন্দোলনসমূহের বীজ বপন করেছেন।[৫] তবে

১ তাফসীরুল মানার, খণ্ড ১, পৃঃ ১৬৭, আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরুন, খণ্ড ২, পৃঃ ৬১১ গ্রন্থে উদ্ধৃত।

২ আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরুন, খণ্ড ২, পৃঃ ৬১৫-৭, ৬২৮।

৩ লামহা-তুন ফী 'উলুমিল কুরআন, পৃঃ ৩২১-২।

৪ দেখুন ফী যিলালিল কুরআন, খণ্ড ৪, পৃঃ ১৮৪৬ ও ১৮৫২।

৫ দেখুন আদওয়াউন ইসলামিয়্যাহ আলা আকীদাতি সাইয়্যিদ কুতুব ওয়া ফিকরিহ, পৃঃ ৪৩-৫, ৬০-১০৪।

আলোচনায় ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে এসব সামান্য মানবীয় দুর্বলতা সত্ত্বেও এটা মেনে না নেওয়ার কোনো অবকাশ নেই যে, তিনি এমন এক সময়ে ধর্মনিরপেক্ষতা ও তার জন্মদাতা ইউরোপীয় সভ্যতার দোষ-ত্রুটিগুলোর এক কার্যকরী বলিষ্ঠ ইসলামী সমালোচনা উপস্থাপন করেছেন, যখন অধিকাংশ মুসলিমই ছিল ইসলামের ব্যাপারে পরাজিত মানসিকতা দ্বারা লজ্জাজনকভাবে প্রভাবিত।

তাফসীর ও তা'ওয়ীল

প্রথম প্রজন্মের মুসলমানগণ তাফসীর ও তা'ওয়ীল শব্দ দু'টিকে সমার্থবোধক মনে করতেন। তবে তাবি'ঈন ও তাদের ছাত্রদের পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে (হিজরী ৩য় ও ৪র্থ শতক) এসে তা'ওয়ীল পরিভাষাটি নতুন ও নেতিবাচক একটি অর্থ পরিগ্রহ করে। এর ফলে এসব পরিভাষার মূল প্রসঙ্গ ও এগুলোর পরবর্তী ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি দেয়া আমাদের জন্য আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

فَسَّرَ (ফাস্সারা) ক্রিয়াপদ থেকে উদ্ভূত তাফসীর শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ, যেমন নিচের আয়াতে রয়েছে:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾

"আর তারা তোমার কাছে এমন কোনো দৃষ্টান্ত (যুক্তি-তর্ক, দলিল-প্রমাণ) উত্থাপন করে না, যার চাইতে সত্য ও অধিক সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমার নিকট নিয়ে আসি না।" (আল ফুরকান, ২৫: ৩৩)

কুরআনী জ্ঞানের জগতে تَأْوِيْل তা'ওয়ীল অর্থ হলো সেই জ্ঞান যার দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয় এবং এর প্রজ্ঞা ও গভীরতা উপলব্ধি করা হয় এবং কুরআন থেকে আইন-কানুন বের করে আনা হয়।[১]

পক্ষান্তরে, আওয়য়ালা ক্রিয়াপদ থেকে উদ্ভূত তা'ওয়ীল শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো ব্যাখ্যা। তবে আদেশের প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হলে তা'ওয়ীল শব্দটির অর্থ হয় কাজ সম্পাদন বা বাস্তবায়ন করা। যেমন আয়েশা رضي الله عنها বলেন,

১ আল ইতকান ফী 'উলূমিল কুরআন, খণ্ড ২, পৃঃ ১৭৪।

"আল্লাহর রাসূল ﷺ সালাত আদায়ের সময় রুকু ও সিজদায় নিম্নোক্ত বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে কুরআনকে বাস্তবায়ন (ইয়াতাআওয়ালু) করতেন,

(سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)

"হে আমাদের রব আল্লাহ, তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা করছি । হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দাও।"[১]

আয়েশা ﵂ এখানে বুঝাতে চেয়েছেন যে, নবী ﷺ নিম্নোক্ত আয়াতের মধ্যে নিহিত আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করেছেন:

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

"তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় তিনি মহান তাওবা কবুলকারী।" (আন নাস্‌র, ১১০: ০৩)

কোনো সংবাদ বা তথ্যের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হলে তা'ওয়ীল শব্দটি দ্বারা তা সংঘটিত হওয়া বুঝানো হয়, যেমন নিম্নোক্ত আয়াতে রয়েছে:

وَلَقَدْ جِئْنَٰهُم بِكِتَٰبٍ فَصَّلْنَٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ ۚ .... ﴿٥٣﴾

"আমি এদের কাছে এমন একটি কিতাব নিয়ে এসেছি, যা আমি জেনে-বুঝে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি এবং যা ঈমানদারদের জন্য পথনির্দেশনা ও রহমত স্বরূপ। (যারা দ্বীনকে খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করেছে) এখনও এরা কি তা সংঘটিত হওয়ার প্রতীক্ষায় আছে?" (আল আ'রাফ, ০৭: ৫২,৫৩)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ওহী প্রত্যাখ্যানকারী লোকদের এই বলে বিদ্রূপ করছেন যে, তারা কি কিয়ামত সংঘটন ও তার আলামতসমূহ, বিচার দিবস, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি এতো দেরী হচ্ছে কেন- এর জন্য বোকার মতো অপেক্ষা করছে?

১ সহীহ আল বুখারী, খণ্ড ১, পৃঃ ৪৩৪, নং ৭৮১ ও সহীহ মুসলিম , খণ্ড ১, পৃঃ ২৫৫-৬, নং ৯৮১।

তবে, সংরক্ষিত কোনো ভাষণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে তা'ওয়ীল শব্দটির অর্থ হয় এর বিশ্লেষণ কিংবা ব্যাখ্যা। যেমন নীচের আয়াতে রয়েছেঃ

هُوَ الَّذِىٓ اَنۡزَلَ عَلَيۡكَ الۡكِتٰبَ مِنۡهُ اٰيٰتٌ مُّحۡكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الۡكِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيۡنَ فِىۡ قُلُوۡبِهِمۡ زَيۡغٌ فَيَتَّبِعُوۡنَ مَا تَشَابَهَ مِنۡهُ ابۡتِغَآءَ الۡفِتۡنَةِ وَابۡتِغَآءَ تَاۡوِيۡلِهٖ ... ۝

"তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন। এর মধ্যে অধিকাংশ আয়াত হলো 'মুহ্‌কাম', যেগুলো কিতাবের মূল আর অন্যগুলো 'মুতাশাবিহ'। আর যাদের হৃদয়ে বক্রতা রয়েছে তারা মুতাশাবিহাত এর পেছনে লেগে থাকে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং এর (অপ) ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য...।" (আ-লে ইমরান, ০৩ : ০৭)

এ কারণে প্রথম দিকের তাফসীর বিশেষজ্ঞগণ তাফসীর ও তা'ওয়ীল শব্দ দু'টিকে একই অর্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহার করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ: ইমাম ইবনু জরীর তাবারী رحمه الله তার তাফসীর গ্রন্থে সাধারণত প্রতিটি অধ্যায়ের সূচনা করেছেন এ বাক্য দ্বারা, 'আল্লাহ তা'আলার বক্তব্যের তা'ওয়ীল সংক্রান্ত মতামত'।[1]

পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে যখন আহ্‌লুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ থেকে বিচ্যুত ফিরকাসমূহের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার পরিমাণ অনেক বেড়ে গিয়েছিল, তখন তৎকালীন বিশেষজ্ঞগণের অনেকেই তাফসীরের নামে দেয়া নিজেদের ভুল বক্তব্যের যথার্থতা দাবী করা ও সেগুলোর উপর একটু বৈধতার হাওয়া লাগানোর জন্য 'তা'ওয়ীল' পরিভাষাটিকে ব্যবহার করেছেন। তাদের সংজ্ঞামতে 'তা'ওয়ীল' হলো, প্রসঙ্গের কারণে কোনো আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ থেকে সরে গিয়ে তার সম্ভাব্য অর্থসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি অর্থ গ্রহণ করা;[2] অর্থাৎ যে কোনো কারণেই হোক না কেন, কোনো কোনো আলিমের কাছে প্রাসঙ্গিক মনে হওয়ার কারণে সুস্পষ্ট অর্থ বাদ দিয়ে আয়াতের অন্য কোনো ব্যাখ্যা গ্রহণ করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ: মু'তাযিলাদের দ্বারা প্রভাবিত বর্তমান সময়ের কোনো কোনো আলিম নিম্নোক্ত আয়াতে—যেখানে সাহাবীদের নেয়া

১ লামহা-তুন ফী 'উলূমিল কুরআন, পৃঃ ১২৩-২৪।
২ মাবাহিস ফী 'উলূমিল কুরআন, পৃঃ ৩২৬।

একটি শপথের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে—ব্যবহৃত 'হাত' শব্দটির ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

"আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর" (আল ফাত্‌হ, ৪৮: ১০)

তারা নিছক এ কারণে 'হাত' শব্দটিকে আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, তারা মনে করেন আল্লাহর কোনো হাত থাকা সম্ভব নয়। এ তা'ওয়ীলটির মূল ভিত্তি হলো– তারা মনে করেন, আল্লাহর হাত আছে মর্মে দাবীর স্বয়ংক্রিয় অর্থ হলো তাঁকে মানবীয় আকৃতিতে অনুভব করা। কিন্তু তাদের এ অনুমান মোটেই ঠিক নয়। কারণ যখন আল্লাহকে চিরন্তন সত্তা 'আল হাইয়্যু' হিসেবে অভিহিত করা হয় তখন কোনোভাবেই এর মাধ্যমে তাঁকে মানুষের সদৃশে পরিণত করা হয় না। কেননা তাঁর জীবন কোনোক্রমেই আমাদের জীবনের মতো নয়। একইভাবে আল্লাহর হাত দ্বারা প্রকৃত হাত ধরে নেয়ার ফলে তাঁর সাথে মানুষের সাদৃশ্য স্থাপন করা হয় না; কারণ তাঁর হাত কোনোক্রমেই তাঁর কোনো সৃষ্টির হাতের মতো নয়। তবে উল্লেখ্য যে, আল্লাহর প্রকৃত হাত রয়েছে মর্মে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের এ বিশ্বাসের অর্থ এই নয় যে, তারা আল্লাহর হাত দ্বারা দেহের কোনো অংশকে বুঝায়।[1]

তাফসীরের পদ্ধতি

কুরআন হলো মানবজাতির কাছে প্রেরিত আসমানী ওহীর সর্বশেষ গ্রন্থ এবং আল্লাহ একে যে কোনো প্রকার বিকৃতি ও বিলুপ্তি থেকে সুরক্ষা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি কুরআনে বলেন,

---

১ দেখুন আবুল ইয্য আল হানাফীর শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাবিয়্যাহ, পৃঃ ২২০। 'তবে, আল্লাহর এসব গুণের ব্যাপারে এটা বলা যায় না যে, এগুলো হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যন্ত্রপাতি কিংবা মৌলিক উপাদান; কারণ আল্লাহ অনন্য, যার অন্য কারোর প্রয়োজন নেই , অথচ অন্য সবারই তাঁকে প্রয়োজন। তাঁকে বিভিন্ন উপাদান সহযোগে গঠিত কোনো সত্তা হিসেবে কল্পনা করা যায় না, কারণ 'অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের' মধ্যে বিভাজ্যতার অর্থ বিদ্যমান।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

"আমিই এই যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমি নিজেই এর সংরক্ষণকারী।" (আল হিজ্‌র, ১৫ : ০৯)

চৌদ্দ শ' বছর ধরে এর লিখিত ও পঠিত উভয় রূপ সামান্যতম পরিবর্তন থেকেও সুরক্ষিত রয়েছে। নবী 'ঈসা ﷺ এর উপর অবতীর্ণ ইন্‌জীল, মূসা ﷺ এর উপর অবতীর্ণ তাওরাত কিংবা আল্লাহর নাযিলকৃত অন্য কোনো কিতাবের ক্ষেত্রে সুরক্ষিত রাখার এ প্রতিশ্রুতি নেই। অন্যদিকে কুরআনের সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহর ওয়াদা শুধু শব্দের সুরক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর সঠিক অর্থের সুরক্ষাও এ প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত। কেননা, কুরআনের সঠিক অর্থকে সুরক্ষা দেয়া না হলে পথভ্রষ্ট লোকেরা আল্লাহর কিতাবকে প্রতীক, ধাঁধা ও বিধি-বিধানের সম্মিলিত এমন একটি প্রহেলিকাপূর্ণ জগাখিচুড়ী মার্কা গ্রন্থে পরিণত করে ফেলতো যে, এর অসংখ্য মনগড়া ব্যাখ্যার দুয়ার খুলে যেতো এবং এর ফলে কুরআন তার আসল অর্থ হারিয়ে ফেলতো। তাই কুরআনের কিছু সার্বজনীন বক্তব্যের ব্যাখ্যা তিনি কুরআনের মধ্যেই প্রদান করেছেন ও অন্যান্য অংশের তাফসীর করে দেয়ার দায়িত্ব স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ-কে প্রদান করার মাধ্যমে আল্লাহ এর অর্থকে সুরক্ষা প্রদান করেছেন।

সাহাবায়ে কেরামদেরকে শেখানো হয়েছিল যে, তাদেরকে সর্বপ্রথম কুরআন থেকেই কুরআনের ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করতে হবে, তারপর নবী ﷺ এর ব্যাখ্যা ও আমল থেকে এবং তারপর কুরআনের ভাষা সম্পর্কে তাঁদের গভীর উপলব্ধি থেকে। নবী ﷺ এর ইন্তেকালের পর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তারা কুরআন ব্যাখ্যার জন্য সর্বপ্রথম কুরআনের উপরই নির্ভর করতেন। তারপর তারা কুরআনের ব্যাখ্যার জন্য নির্ভর করতেন সাহাবীদের উপর। আয়াত নাযিলের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি এবং নবী ﷺ এর বক্তব্য ও আমলের মাধ্যমে প্রাপ্ত ব্যাখ্যার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামগণ তাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাবি'ঈদেরকে অবহিত করতেন। পরিশেষে তাঁরা কুরআনের সেসব শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করতেন যেগুলো জনসাধারণের মাঝে অপরিচিত ছিলো কিংবা আরব উপদ্বীপের বাইরের আরবদের নিকট যার ভিন্ন অর্থ

ছিলো। সাহাবায়ে কেরামদের যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাবি'ঈদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ আলিমগণ মুসলিম জাতির পরবর্তী প্রজন্মের নিকট কুরআনের সঠিক অর্থ পৌঁছে দেয়ার গুরুদায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তারা এ জ্ঞান যেভাবে পেয়েছিলেন, কোনো রকম পরিবর্তন পরিবর্ধন ছাড়া হুবহু সেভাবেই তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। নবী ﷺ এর পর তৃতীয় প্রজন্মটিই তাবি'ঈদের নিকট থেকে তাফসীরের বিভিন্ন বর্ণনা সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু করেন।

নবী ﷺ সাহাবায়ে কেরামগণ, তাবি'ঈন ও তাবি'উত তাবি'ঈনদের উপরোল্লিখিত পদ্ধতি থেকে সহীহ আকীদাপন্থী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ কুরআনের বিশুদ্ধ তাফসীর করার অপরিহার্য শর্ত হিসেবে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ বের করে এনেছেন:

১. কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর

কুরআনের বহু স্থানে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অনেক বিষয় প্রশ্নের আকারে তুলে ধরা হয়েছে এবং পাঠকের মন ও মননের উপর আলোচ্য বিষয়ের প্রভাব আরও গভীর করার জন্য পরবর্তীতে তার জবাব দেয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো সাধারণ নিয়মে বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে একই বক্তব্য বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পাঠক ও শ্রোতাদেরকে আল্লাহর কালামের উপর আরো বেশী করে ভেবে দেখার ব্যাপারে উৎসাহিত করা। এক আয়াত দ্বারা অন্য আয়াতকে ব্যাখ্যার এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআন বা কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর। এক আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য অন্যান্য আয়াত নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামে যা বুঝাতে চেয়েছেন তা আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরার প্রক্রিয়াকে বেছে নিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ জিজ্ঞেস করছেন:

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝٢

"কসম আকাশের এবং কসম রাতে আত্মপ্রকাশকারীর। কিসে তোমাকে জানাবে রাতে আত্মপ্রকাশকারী কী?" (আত তারিক, ৮৬:১-২)

তারপর তিনি পরবর্তী আয়াতে নিজেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেনঃ

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾

"এটি উজ্জ্বল তারকা।" (আত তারিক, ৮৬:০৩)

আল্লাহ কুরআনে আরো বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ .... ﴿١﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ করো। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ গবাদি পশু হালাল করা হয়েছে, তবে তোমাদের নিকট যেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে সেগুলো ছাড়া...।" (আল মায়িদা ০৫: ০১)

দুই আয়াত পরে আল্লাহ তা'আলা এ সাধারণ নিয়মটির ব্যতিক্রম অর্থাৎ হারামগুলো সবিস্তারে উল্লেখ করছেন:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ .... ﴿٣﴾

"তোমাদের জন্য হারাম করা হলো মৃত পশু, প্রবাহিত রক্ত, শূকরের গোশত, যা কিছু আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয় তা, শ্বাসরোধে মৃত পশু, প্রহারে মৃত পশু, উপর থেকে পড়ে মৃত পশু, শিং এর আঘাতে মৃত পশু এবং হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু...।" (আল মায়িদা, ০৫: ০৩)

এমন আরেকটি দৃষ্টান্ত রয়েছে সেই আয়াতে যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ .... ﴿١٠٣﴾

"দৃষ্টিসমূহ তাঁকে ধারণ করতেও অক্ষম।" (আল আন'আম ০৬: ১০৩)

এ আয়াতের সাধারণ বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহকে দুনিয়া কিংবা আখিরাতে কোথাও দেখা যাবে না। তবে, অন্য আয়াতে আখিরাতের জীবনে ঈমানদারদের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেছেন:

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾

"সে তার রবের প্রতি তাকিয়ে থাকবে।" (আল কিয়ামাহ, ৭৫: ২৩)

আর তিনি কাফিরদের ব্যাপারে বলেছেন:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾

"কখনো নয়, নিশ্চিতভাবেই সেদিন তাদের রবের দর্শন থেকে তাদেরকে আড়াল করে রাখা হবে।" (আল মুতাফ্ফিফীন, ৮৩: ১৫)

অতএব, অন্য কোনো উৎস থেকে কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গ্রহণ করার পূর্বে অবশ্যই প্রথমে স্বয়ং কুরআনের উপর নির্ভর করতে হবে যাতে সে নিজেই নিজের ব্যাখ্যা করে দিতে পারে; কারণ আল্লাহ যা বুঝাতে চেয়েছেন সে সম্পর্কে তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন।

২. সুন্নাহ দ্বারা কুরআনের তাফসীর

বহু ঘটনার প্রেক্ষিতে নবী ﷺ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের বাড়তি ব্যাখ্যা যোগ করেছেন। আর এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা কুরআন ব্যাখ্যার যে দায়িত্ব নবী ﷺ এর উপর অর্পণ করেছেন তিনি সে দায়িত্বই পালন করেছেন। এ দায়িত্ব অর্পণের কথা তুলে ধরে কুরআনে দ্ব্যর্থহীনভাবে উচ্চারিত হয়েছে:

....وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ .... ﴿٤٤﴾

"...এবং আমি এ যিকর (কুরআন) তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি লোকদের সামনে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে দিতে পারো...।" (আন নাহ্ল, ১৬: ৪৪)

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ .... ﴿٦٤﴾

"আর আমি তোমার প্রতি এ কিতাব (এ জন্যই) অবতীর্ণ করেছি যাতে তারা যে বিষয়ে মতপার্থক্য করছে তা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে দিতে পারো...।" (আন নাহ্ল, ১৬: ৬৪)

সাহাবায়ে কেরামগণ এ বিষয়টি যথাযথভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তাই কুরআনের কোনো আয়াতের অর্থ নিয়ে সংশয় দেখা দিলে ব্যাখ্যার জন্য তাঁরা সর্বদা নবী ﷺ এর নিকট যেতেন। বস্তুত সালাত, যাকাত, সাওম, হজ্জ, উত্তরাধিকার আইন প্রভৃতি বিষয়ের সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত বর্ণনা বিশ্লেষিত হয়েছে নবী ﷺ এর প্রত্যক্ষ বক্তব্য কিংবা তাঁর বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে। এভাবে বক্তব্য বা অনুশীলনের মাধ্যমে কুরআনের যে ব্যাখ্যা নবী ﷺ প্রদান করেছিলেন তাকে তাফসীরুল কুরআন বিস সুন্নাহ বা সুন্নাহ দ্বারা কুরআনের তাফসীর নামে অভিহিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ: সূরা ফাতিহায় নবী ﷺ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, 'আল মাগদুবি আলাইহিম' (যাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত পড়েছে) আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে ইহুদীদেরকে; আর 'আদ দা-ল্লীন' (বিপথগামী) হচ্ছে খ্রিস্টানরা।[১] উকবাহ ইবনু আমির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, অন্য একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন:

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ .... ﴿٦٠﴾

"আর তোমরা তাদের (মুকাবিলার) জন্য যথাসাধ্য শক্তি অর্জন করো...।" (আল আনফাল, ৮: ৬০)

এবং তারপর তিনি আয়াতে উল্লিখিত 'কুওয়্যাহ' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন,

أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ

'নিশ্চয় শক্তি হলো নিক্ষেপণ শক্তি'। তিনি এ কথাটি তিনবার বলেন।[২]

আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত তিনি বলেন:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾

"নিশ্চয় আমি তোমাকে কাওসার দান করেছি।" (আল কাওসার, ১০৮: ০১)

---

১ আদী ইবনু হাতিম কর্তৃক বর্ণিত ও ইমাম তিরমিযী ও ইমাম আহমদ কর্তৃক সংগৃহীত। আলবানী কর্তৃক সহীহ সুনানুত তিরমিযী গ্রন্থে (খণ্ড ৩, পৃঃ ১৯-২০, নং ২৩৫৩) হাসান সাব্যস্ত।

২ সহীহ মুসলিম (খণ্ড ৩, পৃঃ ১০৬০, নং ৪৭১১)। হাদীসে ব্যবহৃত শব্দটি হলো 'রামইউ' যার অর্থ হতে পারে তীর নিক্ষেপ করা কিংবা বল্লম ছুঁড়ে মারা। গুলি কিংবা রকেট নিক্ষেপ অর্থেও এটি ব্যবহৃত হতে পারে।

আয়াতটি প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেন যে, এই ‘কাওসার’ দ্বারা জান্নাতের একটি নদীকে বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন।[১]

মহান আল্লাহর প্রত্যক্ষ নির্দেশনার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে সুন্নাহ কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া প্রতিশ্রুতির দ্বিতীয়াংশের প্রতিনিধিত্ব করে:

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُۥ ﴿١٩﴾

“অতঃপর এর অর্থ ব্যাখ্যা করে দেয়ার দায়িত্বও আমার।” (আল কিয়ামাহ, ৭৫ : ১৯)

ইবনু আব্বাস رضي الله عنه এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, এর অর্থ হলো ‘হে মুহাম্মাদ তোমার কথা বা বক্তব্য দ্বারা’।[২] অতএব নবী ﷺ এর ব্যাখ্যার উপর অন্য কারো ব্যাখ্যাকে কখনোই প্রাধান্য দেয়া যাবে না।

৩. আ-সার দ্বারা কুরআনের তাফসীর

সাহাবায়ে কেরামগণ প্রয়োজনীয় কোনো আয়াতের তাফসীর সরাসরি কুরআন কিংবা সুন্নাহতে খুঁজে না পেলে তাঁরা আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট ও কুরআনের ভাষা আরবীর গভীর সাহিত্য-জ্ঞানের ভিত্তিতে বিচার-বিশ্লেষণ করতেন। এ প্রসঙ্গে কুরআনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুফাস্‌সির ইবনু কাসীর رحمه الله তাঁর তাফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন,

“আমরা যদি কুরআন কিংবা সুন্নাহতে কোনো আয়াতের তাফসীর খুঁজে পেতে অক্ষম হই তখন আমরা সাহাবায়ে কেরামদের মতামতের আলোকে তা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করি। কারণ, ওহী নাযিলের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির জ্ঞান, তার পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ উপলব্ধি ও নেক আমলে সবচেয়ে অগ্রণী হওয়ার কারণে তাঁরা কুরআনকে নিঃসন্দেহে অন্য যে কারো চেয়ে ভালোভাবে বুঝেছেন।” কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামদের এসব বক্তব্য দ্বারা ব্যাখ্যার এ প্রক্রিয়া তাফসীর বিল আ-সার নামে পরিচিত।

এমন একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে। নারীদের পর্দার বিধান প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.... ﴿٣١﴾

"মুমিন নারীদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে, আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে; তবে যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় তা ছাড়া।" (আন নূর, ২৪: ৩১)

এ আয়াতে 'যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায়' বলতে কী বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে ইবনু আব্বাস ﵄ বলেন, 'এর মানে হলো মুখমণ্ডল ও উভয় হাত।'[১]

আরেকটি ঘটনায় নিম্নোক্ত আয়াত:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾

"আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারাই কাফের।" (আল মায়েদা, ০৫: ৪৪)

তিলাওয়াত করার পর ইবনু আব্বাস ﵄ বলেন, 'এটি প্রকৃত কুফরের চেয়ে ছোট মানের এক প্রকার কুফর'।[২]

---

১ ইবনু আবি শাইবাহ কর্তৃক আল মুসন্নাফ, খণ্ড ৪, পৃঃ ২৮৩ ও বাইহাকী কর্তৃক আস সুনানুল কুবরা গ্রন্থে সংগৃহীত। আলবানী জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমাহ, পৃঃ ৫৯-৬০ গ্রন্থে এ বক্তব্যের ইছনাদটি সহীহ মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।

২ হাকিম (খণ্ড ২, পৃঃ ৩১৩) কর্তৃক সংগৃহীত। ইবনু জারীর নিজ তাফসীর গ্রন্থে (খণ্ড ৪, পৃঃ ৫৯৭, নং ১২০৬৮) একই ধরনের বক্তব্য সংগ্রহ করেছেন। আমাদের সময়ে যেসব বিষয় নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলছে এটি তার অন্যতম। প্রশ্নটি হলো: ইবনু আব্বাসের বক্তব্য কি আমাদের সময়ের শাসকদের উপর প্রযোজ্য যারা শারীয়াহ আইন ও মানবরচিত আইনের মিশ্রণ দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন? দৃশ্যত অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের অবস্থান এমন মনে হচ্ছে যে, শাসক যদি মনে করেন যে, মানবরচিত আইন শারীয়ার চেয়ে কিংবা তার মতোই উত্তম, অথবা সেগুলো শারীয়ার ন্যায় অতোটা উত্তম না হলেও এসবের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করা বৈধ, তাহলে সে একজন ইসলাম পরিত্যাগকারী কাফির। তবে, যদি সে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ইসলামী শারীয়াহকেই গ্রহণ করে, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে মানবরচিত আইন প্রয়োগ করে ফেলে এবং বিশ্বাস করে যে, এটা করা ভয়ানক পাপাচার হয়েছে, তাহলে তার কুফর হলো কর্মগত ছোট কুফর যা তাকে পাপিষ্ঠ সাব্যস্ত করলেও ইসলামের সীমানার বাইরে ঠেলে দেয় না। দেখুন শায়খ

মনে রাখা প্রয়োজন যে, নবী ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামগণ থেকে যেসব তাফসীর পরবর্তী প্রজন্মের নিকট পৌঁছেছে তাতে কুরআনের সকল আয়াতের তাফসীর খুঁজে পাওয়া যায় না। কেননা নবী ﷺ কেবল সেসব আয়াতেরই ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন যেগুলো সাহাবায়ে কেরামদের নিকট অস্পষ্ট ছিল। একইভাবে তাঁরাও কেবল সেসব আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যা তাবি'ঈদের নিকট অস্পষ্ট ছিল। কিন্তু ভাষার বিবর্তনসহ আরও অনেক কারণে পরবর্তী বিভিন্ন প্রজন্মের কাছে কুরআনের আরও অনেক অংশ অস্পষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে সাহাবীদের যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাবি'ঈদেরকে আরো অনেক বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করতে হয়। এসব ব্যাখ্যাকে তাফসীর বিল আ-সার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কোনো আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাবি'ঈদের এ ধরনের বক্তব্যসমূহের মধ্যে মতৈক্য পাওয়া গেলে সে ব্যাখ্যাকে অবশ্যই অন্য কারো ব্যক্তিগত মতের উপর প্রাধান্য দেয়া উচিত। যেসব ক্ষেত্রে তারা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন সেখানে কুরআনের নিজ ভাষার প্রয়োগ পদ্ধতি দ্বারা বিশেষভাবে সমর্থিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের মতামতসমূহের মধ্যে কোনো একটির উপর বিশেষ প্রাধান্য দেয়া যাবে না।

তাবি'ঈদের যুগে অনেক খ্রিস্টান ও ইহূদী ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। ফলশ্রুতিতে, তাবি'ঈদের কেউ কেউ কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে ইহূদী ও খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থসহ বিভিন্ন উৎস থেকে বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করেছেন। এসব বর্ণনা তাফসীর জগতে 'ইসরাঈলিয়াত' নামে পরিচিত। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পরবর্তী প্রজন্মসমূহের তাফসীর গ্রন্থগুলো এসব বর্ণনায় ভরে গিয়েছিল। অথচ এসব বর্ণনাসমূহের কোনোটারই তেমন কোনো নির্ভরযোগ্য উৎস খুঁজে পাওয়া যায় না।

৪. ভাষার মাধ্যমে কুরআনের তাফসীর

কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন সময় নতুন অর্থ পরিগ্রহ করে এবং পুরাতন অর্থ হারিয়ে ফেলে। এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষার মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং অনেক ভাষার নিজস্ব শব্দভাণ্ডারের বিশাল অংশ পরিত্যক্ত হয়ে যায়।

আলবানীর আত তাহযীর মিন ফিতনাতিত তাকফীর যিনি তার গ্রন্থে নিজের অবস্থানের সমর্থনে প্রাচীন ও আধুনিক সালাফী বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য থেকে প্রচুর দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

ভাষার ক্রমবিকাশের এ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ফলে কুরআনের কিছু শব্দকে তার আক্ষরিক ও ব্যাকরণগত অর্থের আলোকে ব্যাখ্যা করা অনিবার্য হয়ে ওঠে। সময়ের এ দাবী পূরণের জন্য রচিত হয় এমন কিছু অভিধান যার বিশেষ উদ্দেশ্য হলো কুরআনের আরবি শব্দভাণ্ডার ও ভাষাতত্ত্বকে বিশ্লেষণ করা। তবে একাধিক অর্থবিশিষ্ট শব্দের কারণে অভিধান রচনার এ পদক্ষেপ এমন কিছু মতবিরোধ সৃষ্টি করে যার সমাধান কেবল সুন্নাহর সমর্থনের মাধ্যমেই দেয়া সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ: 'লাম্‌স' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো স্পর্শ করা, কিন্তু রূপক অর্থে এর মানে হলো যৌন ক্রিয়া। এ কারণে পরবর্তী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যার ব্যাপারে দু'টি মতামত প্রদান করেছেন:

....أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا.... ﴿٤٣﴾

"অথবা তোমরা যদি নারী স্পর্শ/সম্ভোগ করে থাকো এবং তারপর পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো।" (আন নিসা, ০৪: ৪৩)

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিক رحمه الله এর মতে, এখানে 'লাম্‌স' এর অর্থ হলো হাতের স্পর্শ, যদিও তারা উভয়েই এর সাথে কিছু শর্ত যোগ করেছেন। পক্ষান্তরে, ইমাম আবু হানিফা رحمه الله এর মতে এখানে 'লাম্‌স' এর অর্থ হলো যৌন ক্রিয়া। তবে, নবী ﷺ এর স্ত্রীগণ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ওযু অবস্থায় তাঁদেরকে চুম্বন করে পুনরায় ওযু না করে সালাত আদায় করেছিলেন। যার থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এখানে শুধু স্পর্শ বুঝানো এ আয়াতের উদ্দেশ্য নয়।[১]

উল্লিখিত চারটি পদ্ধতি তাফসীর বির রিওয়ায়াহ বা তাফসীর বিল মা'সূর (বর্ণনা ভিত্তিক তাফসীর) হিসেবে পরিচিত। এ ধরনের তাফসীরের ক্ষেত্রে কারো ব্যক্তিগত যুক্তি-তর্কের তেমন কোনো অবকাশ নেই। যদিও চতুর্থ পদ্ধতিটি প্রায়ই সালাফ-আস-সালেহীনদের বর্ণনার উপর নির্ভরশীল, তবুও মাঝেমধ্যে এটি অনেকটা মতামত নির্ভর কিংবা বিতর্কিত হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ: ৮৫ নং সূরাতে ব্যবহৃত 'বুরুজ' শব্দটিকে ইউসুফ আলী

১ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আয়েশা (রা.) ও সংগ্রহ করেছেন আবু দাউদ সুনানু আবি দাউদ, (খণ্ড ১, পৃঃ ৪৩, নং ১৭৯), তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও আহমদ। সহীহ সুনানু আবু দাউদ (খণ্ড ১, পৃঃ ৩৬, নং ১৬৫) গ্রন্থে আলবানী এটিকে সহীহ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

অনুবাদ করেছেন 'রাশিচক্রের প্রতীক', অন্যদিকে পিকথল যদিও এর অনুবাদ করেছেন 'তারকা প্রাসাদ' বলে; তবে তিনিও এ সূরার ভূমিকায় বলেছেন যে, বুরুজ শব্দটি রাশিচক্রের প্রতীকের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। বুরুজ শব্দের অর্থ 'রাশিচক্র' করা হলে একথা মেনে নিতে হয় যে, মহান আল্লাহ রাশিচক্রের প্রতীকের শপথ নিচ্ছেন। ইংরেজি ভাষাভাষী কিছু মুসলিম এটিকে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রতি ইসলামের পরোক্ষ সমর্থন হিসেবে ধরে নিয়েছে। অথচ উৎপত্তিগতভাবে বুরুজ শব্দের একমাত্র অর্থ ছিল 'তারকার অবস্থান'। কুরআন নাযিলের আরও অনেক পরে পৌত্তলিক ব্যাবিলনীয় ও গ্রীকদের চাপিয়ে দেওয়া রাশিচক্রের কাল্পনিক চিত্র বুঝানোর জন্য শব্দটি এ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছিল। কেননা একথা সকলেরই জানা যে, ইসলামে রাশিচক্রের কোনোই গ্রহণযোগ্যতা নেই। গণকের কাছে যেতে কঠোরভাবে নিষেধ করার মাধ্যমে নবী ﷺ সুস্পষ্ট ভাষায় জ্যোতিষ-শাস্ত্রের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেন,

من اتى ... كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد

"যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় (এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে)[1] সে মুহাম্মাদের উপর নাযিলকৃত বিষয়ের সাথে কুফরী করেছে।"[2]

৫. মতামত দ্বারা কুরআনের তাফসীর

প্রথম চারটি স্তরের সতর্ক অধ্যয়ন শেষে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, এ চারটি স্তরের কোনো একটির সাথে সাংঘর্ষিক প্রতীয়মান না হওয়া পর্যন্ত মতামত ভিত্তিক তাফসীরকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে, কুরআনের সুস্পষ্ট অর্থকে বিদ্যমান পরিস্থিতির উপর প্রয়োগ ও একই ধরনের অন্যান্য পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কিয়াস করার বৈধতা রয়েছে। তবে সেক্ষেত্রে শর্ত হলো সেসব ব্যাখ্যা সালাফ-আস-সালেহীনদের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যার সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না। কিন্তু

১ বাড়তি অংশটুকু আবু দাউদের সঙ্কলন থেকে নেয়া।

২ তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ কর্তৃক সংগৃহীত। অনুরূপ একটি হাদীস সংগ্রহ করেছেন আবু দাউদ (খণ্ড ৩, পৃঃ ১০৯৫, নং ৩৮৯৫), আর আলবানী সহীহ সুনানে আবু দাউদ (খণ্ড২, পৃঃ ৭৩৯, নং ৩৩০৪) গ্রন্থে একে বিশুদ্ধ আখ্যায়িত করেছেন।

দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও সংকীর্ণ ফিরকাবাজী চিন্তাভিত্তিক স্বাধীন ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন,

المراء فى القران كفر ثلاث مرات فما عرفتم منه فاعملوا و ما جهلتم منه فردوه الى عالمه

"কুরআনের ব্যাপারে নিছক মতের ভিত্তিতে তর্কবিতর্ক হলো কুফরী। তিনি এ কথাটি তিনবার বলেন, তোমরা (নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে) যা জান, তার উপর আমল করো; আর যা জান না, তা এমন ব্যক্তির নিকট থেকে জেনে নাও যে তা জানে।"[১]

উপরোক্ত হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, নবী ﷺ তাঁর সাহাবা ও পরবর্তী প্রজন্মের সকল মুসলমানদেরকে আন্দাজ-অনুমান ও প্রমাণবিহীন মতের ভিত্তিতে কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদানের ব্যাপারে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করেছেন। কারণ, কুরআন হলো ইসলামের মূল ভিত্তি; সুতরাং তা অবশ্যই বিশুদ্ধ ও অপরিবর্তিত থাকতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে ইচ্ছেমতো কুরআন ব্যাখ্যার স্বাধীন ছাড়পত্র দেয়া হলে এর মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং স্বয়ং ইসলামের ভিত্তিই দুর্বল হয়ে পড়বে। সুতরাং একমাত্র সেই তাফসীরই গ্রহণযোগ্য যা নিম্নোক্ত ক্রমধারা মেনে চলে:

১. কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর;

২. আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ দ্বারা তাফসীর;

৩. সাহাবায়ে কেরামদের বক্তব্য দ্বারা তাফসীর;

৪. ভাষাগত ব্যাখ্যার মাধ্যমে শর্তসাপেক্ষ তাফসীর; এবং

৫. পরিশেষে মতামত ভিত্তিক তাফসীর– যদি সে মতটি পূর্বের চারটি পদ্ধতির ভিত্তিতে হয় এবং সেগুলোর কোনো একটির সাথেও সাংঘর্ষিক প্রতীয়মান না হয়।

---

১ আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এবং আহমদ, আবু ইয়া'লা ও ইবনু জরীর কর্তৃক স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে সংগৃহীত। সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ, (খণ্ড ৪, পৃঃ ২৬-৮), গ্রন্থে আলবানী একে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন।

সঠিক ব্যাখ্যা থেকে বিচ্যুত তাফসীর

প্রমাণবিহীন নিছক মতামত ভিত্তিক তাফসীরের সহজাত বিকৃতি ও সম্ভাব্য বিপদকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরার জন্য দূর অতীত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলন, ফিরকা ও দার্শনিক চিন্তাগোষ্ঠীর বিচ্যুত তাফসীর থেকে কিছু উদাহরণ নিচে তুলে ধরা হলো।

'ঈসায়ী দশম শতক (হিজরী চতুর্থ শতক) থেকে কিছু সুফীবাদপন্থী লোকেরা মূসা নবীকে দেয়া আল্লাহর নির্দেশ

اِذۡهَبۡ اِلٰی فِرۡعَوۡنَ اِنَّهٗ طَغٰی ﴿۱۷﴾

"ফেরাউনের কাছে যাও, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে।" (আন নাযি'আত, ৭৯: ১৩)

আয়াতে 'ফিরআউন' শব্দটিকে 'অন্তর' অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের এ ব্যাখ্যার কারণ হিসেবে তারা বলেন যে, আসলে অন্তরই তো প্রত্যেক মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে সীমালঙ্ঘন করায়। অন্যরা আবার মূসা নবীকে দেয়া আল্লাহর নির্দেশ:

وَاَلۡقِ عَصَاكَ ؕ

"এবং তুমি তোমার লাঠিটি ছুঁড়ে মারো।" (আন নাম্‌ল, ২৭: ১০)

আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, এর অর্থ হলো বস্তুগত পৃথিবীকে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে কেবল আল্লাহর উপর নির্ভর করা। এসব আধ্যাত্মবাদী তাফসীর-কেন্দ্রিক সুফীবাদ বস্তুকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এবং আধ্যাত্মিকতার উপর মাত্রাতিরিক্ত জোর দেয়।

আব্বাসী যুগের মু'তাযিলী (যুক্তিবাদী) তাফসীরসমূহে নিছক মানবীয় যুক্তির উপর ভিত্তি করে ওহীকে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। সে কারণে নিম্নোক্ত আয়াতের 'অন্তর' শব্দকে এক নূতন অর্থ প্রদান করা হয়েছিল:

وَاِذۡ قَالَ اِبۡرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِیۡ کَیۡفَ تُحۡیِ الۡمَوۡتٰی ؕ قَالَ اَوَلَمۡ تُؤۡمِنۡ ؕ قَالَ بَلٰی وَلٰکِنۡ لِّیَطۡمَئِنَّ قَلۡبِیۡ .... ﴿۲۶۰﴾

"আর স্মরণ করো, যখন ইবরাহীম বলেছিল, হে আমার রব! আমাকে একটু দেখাও কিভাবে তুমি মৃতদের পুনর্জীবিত করো। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করো না? ইবরাহীম বললো, বিশ্বাস তো করি, তবে এতে আমার অন্তর আরও প্রশান্তি লাভ করবে।" (আল বাকারা, ০২: ২৬০)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় দাবী করা হয় যে, ইবরাহীমের এক বন্ধু ছিল যাকে তিনি তাঁর 'অন্তর' হিসেবে উল্লেখ করেছেন; সুতরাং আয়াতের সঠিক অর্থ হলো, 'হ্যাঁ, আমি তোমাকে এ জন্য বলছি যাতে আমার বন্ধু প্রশান্তি লাভ করতে পারে।'[১] তারা বলেন যে, এভাবে অনুবাদ না করা হলে আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইবরাহীম তাঁর অন্তরে সংশয় অনুভব করেছিলেন। আর নবী ইবরাহীমকে তাদের এ কথিত সংশয়ের দায় থেকে মুক্ত রাখার জন্য এ ব্যাখ্যাকে জরুরী মনে করা হয়েছিল। অথচ ভাষাগত দিক থেকে এ আয়াতের সঠিক অর্থ করা হলে এমনিতেই প্রমাণিত হয় যে, ইবরাহীম ﷺ তাঁর অন্তরে কোনো সংশয় অনুভব করেননি।

আব্বাসী যুগের শেষের দিকে নবী ﷺ এর বংশধরদের প্রতি তথাকথিত 'চরম ভালোবাসার' প্রভাবে শিয়াদের তাফসীরসমূহ নিম্নোক্ত আয়াতকে:

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۝١٩

"দু'টি সমুদ্রকে তিনি পরস্পর মিলিত হতে দিয়েছেন।" (আর রাহ্মান, ৫৫: ১৯)

নবী ﷺ এর কন্যা ফাতিমা ও তাঁর জামাতা আলীর প্রতি ইঙ্গিত হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে। আর নিম্নোক্ত আয়াতে:

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝٢٢

"এই উভয় সমুদ্র থেকেই মুক্তা ও প্রবাল পাওয়া যায়।" (আর রাহ্মান, ৫৫: ২০)

তারা নবী ﷺ এর দৌহিত্রদ্বয় হাসান ও হুসাইনের ইঙ্গিত খুঁজে পেয়েছে।[২]

---

১ ইবনু ফাওরাক কর্তৃক প্রদত্ত এ তাফসীরটি মাবাহিস ফী 'উলূমিল কুরআন (পৃঃ ৩৫৮) গ্রন্থে উদ্ধৃত।

২ আল খিসাল গ্রন্থে ইবনু বাবুওয়াইহ। বিহারুল আনওয়ার (খন্ড ২৪, পৃঃ ৯৭-৯, টীকা ১-৭) গ্রন্থে উদ্ধৃত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতে আবির্ভূত পথভ্রষ্ট কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের দাবী হলো নিম্নোক্ত আয়াতে:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ.... ﴿٤٠﴾

"মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারো পিতা নয় বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।" (আল আহ্যাব, ৩৩: ৪০)

'খাতাম' মানে নবুওতের সীলমোহর নয়, বরং এর অর্থ হলো 'আংটি'। এ ব্যাখ্যার আলোকে তাদের দাবী হলো– আংটি যেভাবে আঙ্গুলকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে, নবী মুহাম্মাদ ﷺ-ও কেবল তেমনি নবুওতের সৌন্দর্য বর্ধন করেছেন। অতএব, উক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে, নবী মুহাম্মাদ ﷺ সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, কিন্তু সর্বশেষ নবী নন।[1] তারা আরো বলে যে, 'খাতাম' শব্দের অর্থ 'সীলমোহর' ধরে নেয়া হলেও তা হবে চিঠিপত্রের খামের উপর ব্যবহৃত সীলমোহরের ন্যায় যা তার বিষয়বস্তুকে মোহরাঙ্কিত করে, কিন্তু তাকে সীমাবদ্ধ করে না। এই পথভ্রষ্ট ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা মির্জা গোলাম আহমদের নবুওয়্যাত দাবীকে বৈধ করার জন্য এসব মনগড়া ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। নবী 'ঈসা ﷺ সম্পর্কিত নিম্নোক্ত আয়াতেও তারা বিকৃতি সাধন করেছে:

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ... بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ

"প্রকৃতপক্ষে তারা তাকে হত্যাও করেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি বরং ব্যাপারটিকে তাদের জন্য সন্দিগ্ধ করে দেয়া হয়েছে, বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের দিকে উর্ধ্বে) তুলে নিয়েছেন।" (আন নিসা, ০৪: ১৫৭-৫৮)

তাদের দাবী হলো–এ আয়াতে 'তাঁকে উর্ধ্বে তুলে নিয়েছেন' এর মানে হলো সমুন্নত করা। যেমন নিম্নোক্ত আয়াতে রয়েছে:

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾

"আর আমি তোমার (মর্যাদার) জন্য তোমার স্মরণকে সমুন্নত করেছি।" (আল ইনশিরাহ, ৯৪: ০৪)

---

১ কাদিয়ানীয়াত, পৃঃ ৩০৬।

এ ব্যাখ্যা তাদের মতলব হাসিলের জন্য জরুরী ছিল। কারণ এর মাধ্যমে তারা তাদের এ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল যে, 'ঈসা ﷺ বিয়ে করে কয়েকটি সন্তান জন্ম দিয়ে তারপর এ পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং কাশ্মীরে তিনি সমাহিত হয়েছেন। আর গোলাম আহমদ হলো সেই প্রতীক্ষিত মসীহ যার পুনরাগমনের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।[১]

এমনকি অতি সম্প্রতি আমেরিকাতে এলিজাহ ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা ও নবুওয়াতের দাবীদার এলিজাহ মুহাম্মাদ (মৃত্যু ১৯৭৫ 'ঈসায়ী) নিম্নোক্ত আয়াতকে

يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾

"যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং আমি অপরাধীদেরকে নীল চোখ (দৃষ্টিহীন) অবস্থায় সমবেত করবো।" (ত্ব-হা, ২০: ১০২)

এ বিষয়ের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, জাহান্নামের অধিবাসী সবাই হবে শ্বেতাঙ্গ। এ ব্যাখ্যাকে এলিজার এ মতবাদের সমর্থনে ব্যবহার করা হয়েছে যে, আল্লাহ নিজেও কৃষ্ণাঙ্গ, সকল কৃষ্ণাঙ্গ হলো দেবতা, আর সকল শ্বেতাঙ্গ হলো শয়তান।[২] 'যুরকা' শব্দের আক্ষরিক অর্থ নীল হলেও, এটি একটি বিশেষ ধরনের চক্ষুরোগের কারণে (যা চক্ষুকে নীলাভ ও ধূসর বর্ণ করে দেয়) কর্ণিয়ার ঘোলাটে হয়ে যাওয়া অংশ বুঝনোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ দিক থেকে এর বিশুদ্ধতম অনুবাদ হচ্ছে 'ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন'।

এলিজার মতে, শ্বেতাঙ্গ লোকেরা যেহেতু কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে কিছুটা সাদৃশ্য রাখে, সেহেতু কুরআনে তাদেরকে 'মানবজাতি' অর্থাৎ এক প্রকার মানুষ[৩] হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে! তার ফলে এলিজা নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ .... ﴿١٣﴾

---

১ শর্টার এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, পৃঃ ২৪।

২ ম্যাসেজ টু দ্যা ব্ল্যাক মেন ইন আমেরিকা, পৃঃ ১৪।

৩ অর্থাৎ, আধা মানুষ।

"হে মানবজাতি, আমরা[১] তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি।" (আল হুজুরাত, ৪৯: ১৩)

'আমরা' শব্দকে কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ/দেবতা অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন, যাদের ব্যাপারে তিনি মনে করেন যে, তারা শ্বেতাঙ্গ জাতিকে (মানবজাতিকে) সৃষ্টি করেছেন।[২]

তাফসীরের সঠিক পদ্ধতি উপেক্ষা করলে কী ধরনের ভয়াবহ অসংলগ্নতা ও প্রবঞ্চনা দেখা দেয়, এ অল্প ক'টি উদাহরণে তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ ধরনের বিষয়কে প্রশ্রয় দিলে কুরআন পরিণত হয় সকল পথভ্রষ্ট ও আল্লাহদ্রোহী বাতিল ফিরকার কণ্ঠস্বরে। এসব ফিরকার প্রতিষ্ঠাতাদের কাছে কোনো যৌক্তিক সীমারেখা ও সংগতিপূর্ণ বিধিমালা না থাকায় নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কুরআনকে ব্যবহার করা হয় নির্দয়ভাবে। এ কারণে তাদের কাছে একই আয়াতের বহু রকমের অর্থ থাকতে পারে। যে ব্যাখ্যাই তাদের স্বার্থ রক্ষা করে এবং চিন্তা-ধারাকে সমর্থন করে, তা-ই তাদের কাছে সঠিক হয়ে যায়। তাদের জন্য কুরআন আর তখন কোনো হিদায়াতের গ্রন্থ থাকে না, বরং তা হয়ে দাঁড়ায় তাদের ফিরকার গুপ্ত রহস্য সম্বলিত এমনই এক কিতাব যা কেবল তাদের নেতৃবৃন্দ ও বিশেষ দীক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরাই উন্মোচিত করতে পারে।

মুফাস্‌সির বা কুরআনের ব্যাখ্যাকার হওয়ার শর্তাবলী

পূর্বের অধ্যায়ে তাফসীর শাস্ত্রের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ, এর সঠিক পদ্ধতি ও সঠিক ধারা থেকে বিচ্যুত কিছু তাফসীরের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। এসব তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে কুরআনের বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য তাফসীর করার জন্য নিম্নোক্ত শর্তসমূহকে অপরিহার্য বিবেচনা করা হয়। এসব শর্তাবলীর কোনো একটি বাদ দিলে কুরআনের বিকৃত ব্যাখ্যা বেরিয়ে আসার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে:

---

১ আল্লাহ যখন নিজের জন্য 'আমরা' ব্যবহার করেন তখন তার অর্থের ব্যাখ্যা কী হয় তা জানার জন্য এই অধ্যায়ের ১ নং পাদটীকা দেখুন।

২ ম্যাসেজ টু দ্যা ব্ল্যাক মেন ইন আমেরিকা, পৃঃ ১১৮।

১. সঠিক আকীদা-বিশ্বাস

কুরআনের তাফসীরকে দ্বীনবিরোধী মারাত্মক ভুল থেকে মুক্ত রেখে এর বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে মুফাস্‌সিরকে সবার আগে ইসলামের সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের ধারক-বাহক হতে হবে। ইসলামের প্রতি কারও শুধু আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা থাকার মানে এই নয় যে, তার আকীদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধ। ইসলাম সম্পর্কে কারো আকিদা-বিশ্বাস কেবল তখনই বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হবে যখন তা নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। ইসলামের সঠিক আকিদা-বিশ্বাসের মৌলিক বিষয়সমূহের ব্যাপারে অজ্ঞতা মুফাস্‌সিরকে নিশ্চিতরূপে ভুল ব্যাখ্যার দিকে ধাবিত করবে। এমন ব্যক্তি অবধারিতভাবে সঠিক ব্যাখ্যা ও ভুল ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে অক্ষম হয়ে পড়বেন। ফলশ্রুতিতে তাকে তার ব্যক্তিগত রায়ের উপর নির্ভর করতে হবে। অজ্ঞতাপ্রসূত এ ধরনের কাজ ইসলাম, মুসলিম জাতি ও তার নিজের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সঠিক আকীদা-বিশ্বাস সবসময়ই মানুষকে ফিরকাবাজির সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্ত রাখে। বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসই কেবল মুফাস্‌সিরকে বিভিন্ন দর্শন, সংকীর্ণ দলাদলি, আন্দোলন ও ফিরকাবাজির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখে।[১] আগে থেকেই লালিত কোনো চিন্তাধারা ও মতবাদের অনুকূলে কুরআন থেকে নিছক সমর্থন খুঁজে বের করার প্রয়াস চালানো কোনো মুফাস্‌সিরের জন্য আদৌ সমীচীন নয়। এ ধরনের প্রয়াস নিশ্চিতভাবে তাকে কুরআনের ফিরকাভিত্তিক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও মারাত্মক অপব্যাখ্যার দিকে ধাবিত করবে।

২. সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন

তাফসীরের সকল ন্যায়নিষ্ঠ প্রচেষ্টার সূচনা হতে হবে স্বয়ং কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর করার মাধ্যমে। স্বয়ং কুরআনে কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা না পাওয়া গেলে তখন তার জন্য আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহতে অনুসন্ধান চালাতে হবে। তাতেও যদি খুঁজে পাওয়া না যায়, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবি'ঈনদের ব্যাখ্যার দিকে ফিরে যেতে হবে। এসব পদক্ষেপ অবলম্বনের

---

১ মাবাহিস ফী 'উলূমিল কুরআন, পৃঃ ৩২৯-৩০।

পর যা কিছু বাকি থাকে কুরআনের ভাষার সাহিত্যশৈলীর মধ্যে তা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এ পদ্ধতির মধ্যেই কেবল ওহী নাযিলকারী ও ব্যাখ্যাদাতা হিসেবে আল্লাহ তা'আলার ভূমিকা এবং ওহীর অনুশীলনধর্মী ব্যাখ্যাকার হিসেবে নবী ﷺ এর ভূমিকাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। একইভাবে নবী ﷺ কর্তৃক ওহীর বাস্তব প্রয়োগ-পদ্ধতি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবি'ঈনদের ভূমিকা এবং ওহীর বাহন হিসেবে আরবি ভাষার চিরায়ত ভূমিকা—এ সব কিছুকে এ প্রক্রিয়ায় যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়।

অন্য যে কোনো পদ্ধতি এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ার এক বা একাধিক ধারাকে সরাসরি নাকচ করে দেয়। এর মানে দাঁড়ায় এই যে, যেন তারাই আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি ওহী লাভ করেছেন; অথবা নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের চেয়েও তারা ওহীকে আরো সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছেন। যারাই তাফসীরের এ বাস্তবধর্মী প্রক্রিয়া উপেক্ষা করেছেন তাদের তাফসীর অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে, ইলহাম ও কাশফ এর মতো বিভিন্ন পরিভাষার ছদ্মাবরণে তারা যেন পরোক্ষভাবে তাদের উপরই ওহী অবতীর্ণ হওয়ার দাবী করে বসেছেন।

৩. সঠিক জ্ঞান

মুফাস্‌সিরকে অবশ্যই প্রাচীন আরবি ভাষা, এর ব্যাকরণগত গঠন ও বাকরীতির ব্যাপারে বাস্তব জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। কারণ আরবিই তো কুরআনের ভাষা। যে তাফসীর কেবল কুরআনের কিছু আয়াতের অনুবাদের ভিত্তিতে করা হয়, তাতে বিকৃতির ব্যাপক সম্ভাবনা থেকে যায়। ইবনু আব্বাস رضي الله عنه এর ছাত্র মুজাহিদ رحمه الله এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "আরবি ভাষার পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকলে কোনো ঈমানদারের জন্য আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা করা বৈধ নয়।"[1] মুফাস্‌সিরকে কুরআনের সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের অন্যান্য শাখার উপরও সম্যক সচেতন হতে হবে, যেমন: হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্র ইত্যাদি। তাকে হাদীস শাস্ত্রের সাথে পরিচিত হতে হবে এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য যে, নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের থেকে বর্ণিত যেসব ব্যাখ্যা তিনি তার তাফসীরে ব্যবহার করছেন তা নিশ্চিতভাবে বিশুদ্ধ ও সঠিক। তাকে ফিক্‌হ

১ মাবাহিস ফী 'উলূমিল কুরআন, পৃঃ ৩৩১ এ উদ্ধৃত।

শাস্ত্রের মৌলিক নীতিমালাও (উসূলুল ফিক্‌হ) জানতে হবে, যাতে তিনি কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে নির্ভুলভাবে ইসলামী আইন-কানুন বের করে আনতে সক্ষম হন। জ্ঞানের এ দু'টি শাখার পর্যাপ্ত ও বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত একজন মুফাস্‌সিরের পক্ষে তার তাফসীরকে ভুল ব্যাখ্যা ও তথ্য থেকে মুক্ত রাখা প্রায় অসম্ভব। কারণ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, দুর্বল ও জাল বর্ণনার পরিধি অনেক বিস্তৃত এবং ফিক্‌হ-কেন্দ্রিক মাযহাব ও মতপার্থক্যের পরিমাণও অনেক ও বহুমুখী।

২

তাফসীর গ্রন্থাবলী

কুরআনের তাফসীর গ্রন্থসমূহকে প্রধানত দু'টি সাধারণ ভাগে বিভক্ত করা হয়। যারা তাদের ব্যাখ্যাকে কুরআন দিয়ে কুরআনকে ব্যাখ্যা কিংবা শুধু নবী ﷺ, তাঁর সাহাবা ও তাবি'ঈনদের বক্তব্য ও বর্ণনার মধ্যে সীমিত রেখেছেন, তাঁদের তাফসীরসমূহকে বলা হয় 'তাফসীর বির রিওয়ায়াহ' কিংবা 'তাফসীর বিল মা'সূর' বা বর্ণনাভিত্তিক তাফসীর। এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থকারগণ সাধারণত ভিত্তিহীন কথাবার্তা ও অপ্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এড়িয়ে চলেন এবং সর্বদা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহ গ্রহণ করেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, এসব তাফসীর সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত রায় ও মতামত থেকে মুক্ত। কারণ, যে কোনো তাফসীরেই কম-বেশী অনিবার্যভাবে সংকলকের মতামতের প্রতিফলন ঘটবে। তবে, উল্লিখিত নিয়ম মেনে করা তাফসীরসমূহে ব্যক্তিগত মতামতকে একেবারেই ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা হয়েছে।

পক্ষান্তরে, যেসব তাফসীরে গ্রন্থকারগণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতের উপর নির্ভর করেছেন, তাদের তাফসীরকে বলা হয় 'তাফসীর বিদ দিরায়াহ' কিংবা 'তাফসীর বির রায়' বা মতামত ভিত্তিক তাফসীর। এ ধরনের কিছু কিছু তাফসীরে মুফাস্‌সির তার ব্যক্তিগত মত উল্লেখের পূর্বে নবী ﷺ, সাহাবা ও তাবি'ঈনদের থেকে বর্ণিত ব্যাখ্যা উল্লেখ করেন এবং সেসব ব্যাখ্যার আলোকেই তিনি তার মতামত প্রদান করেন, যা একই সাথে ব্যাকরণের নিয়মাবলী ও আভিধানিক অর্থের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ; এটি একটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি।

তাফসীর বিদ দিরায়াহ'র দ্বিতীয় প্রকার তাফসীর গ্রন্থ হলো সেগুলো যাতে সাহাবা, তাবি'ঈন ও তাবি'উত তাবি'ঈনদের থেকে বর্ণিত ব্যাখ্যা, ব্যাকরণের নিয়মাবলী ও শব্দের আসল অর্থকে আংশিক বা পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছে। প্রথম ধরনের তাফসীর গ্রহণযোগ্য; আর যেসব তাফসীর আংশিক বা

সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন মতের উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলোকে নব্যতান্ত্রিক কিংবা বিদ'আতী উৎপথগামিতার প্রান্তঘেঁষা তাফসীর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল ﷺ কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদানের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ.... ﴿٣٦﴾

"এমন কোনো বিষয়ে কথা বলতে যেও না যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই।" (আল ইসরা, ১৭: ৩৬)

নবী ﷺ-ও দ্বীনি বিষয়াবলীতে না জেনে মত দেয়াকে নিন্দা জানিয়ে বলেছেন,

ان الله لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برايهم فيضلون و يضلون

"আল্লাহ তোমাদেরকে জ্ঞান দান করার পর তা একেবারে তুলে নিবেন না। বরং তিনি ইল্‌ম সহ আলিমদেরকে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে জ্ঞান তুলে নিবেন। তারপর কেবল মূর্খ লোকেরাই বেঁচে থাকবে। তাদেরকে (দ্বীনি বিষয়ে) জিজ্ঞেস করা হলে তারা নিছক নিজেদের মতের ভিত্তিতে রায় প্রদান করে অন্যদেরকে বিপথগামী করবে এবং নিজেরাও বিপথগামী হবে।"[১]

অতএব, সাধারণ দৃষ্টিতেই একথা অনস্বীকার্য যে, নবী ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবি'ঈনদের ব্যাখ্যা মুফাস্‌সিরের ব্যক্তিগত মতামত ভিত্তিক ব্যাখ্যা থেকে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠতর। তবে, বর্ণনা ভিত্তিক তাফসীরের ক্ষত্রেও সে বর্ণনা যদি সম্পূর্ণ সহীহ না হয়, তাহলে এ ধরনের তাফসীর অনেক মতামত ভিত্তিক তাফসীরের চেয়েও খারাপ হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে সর্বাধিক খ্যাতনামা কিছু তাফসীর গ্রন্থ ও সেগুলোর গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে তুলে ধরা হলো:

---

১ সহীহ আল বুখারী, খণ্ড ৯, পৃঃ ৩০৫-৬, নং ৪১০।

তাফসীর বির রিওয়ায়াহ

১. তাফসীর ইবনু আতীয়্যাহ, আল মুহাররারুল ওয়াজীয

আব্দুল হক ইবনু আতিয়্যাহ আন্দালুসী ﷺ (৪৮১-৫৪০ হিঃ/১০৮৯-১১৪৬ 'ঈসায়ী) ছিলেন মালিকী মাযহাবের একজন খ্যাতনামা আলিম এবং স্পেন ও মরক্কো উভয় দেশের একজন বিজ্ঞ বিচারক। ইবনু আতিয়্যার তাফসীরে রয়েছে তার পূর্বে রচিত বর্ণনা ভিত্তিক তাফসীরসমূহে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহের একটি সারসংক্ষেপ। তিনি তার তাফসীর গ্রন্থে সালাফ-আস-সালেহীনদের সাহিত্যসম্ভার থেকে অসংখ্য উদাহরণ সন্নিবেশিত করার পাশাপাশি কুরআনের বিস্ময়কর ভাষাশৈলী বিস্তৃত আকারে আলোচনা করেছেন। অনেক বিশেষজ্ঞই ইবনু আতিয়্যার তাফসীরকে যামাখশারীর তাফসীরের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।[১] এ তাফসীরটির মূল পাণ্ডুলিপি বিশ খণ্ডে বিভক্ত। সম্প্রতি এটি ১৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।[২]

২. তাফসীর আবুল লাইস সমরকন্দী, বাহরুল 'উলূম

আবুল লাইস ইবনু ইবরাহীম সমরকন্দী ﷺ (মৃত্যু ৯৮৩ 'ঈসায়ী/৩৭২ হিঃ) ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত ফিক্‌হ বিশেষজ্ঞ এবং তার উপনাম ছিল ইমামুল হিন্দ। তার এই তাফসীরের ভিত্তি হলো আল্লাহর রাসূলের হাদীস, সাহাবা, তাবি'ঈন ও পরবর্তী প্রজন্মের বিশেষজ্ঞদের বর্ণনা। তবে, এতে বেশ কিছু দুর্বল বর্ণনা রয়েছে; সাহাবা ও তাবি'ঈনদের বক্তব্যের বর্ণনাসূত্রও উল্লেখ করা হয়নি এবং সে বর্ণনাগুলোকে পর্যালোচনাও করা হয়নি। এ তাফসীরটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত ও মুদ্রিত।[৩]

৩. তাফসীর আবু ইসহাক, আল কাশফ ওয়াল বায়ান আন তাফসীরিল কুরআন

নিশাপুরের আবু ইসহাক আহমদ ইবনু ইবরাহীম সা'লাবী ﷺ (মৃত্যু ৪২৭ হিঃ/১০৩৬ 'ঈসায়ী) ছিলেন তার সময়ের সুপরিচিত একজন কুরআনের

---

১ আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরুন, খণ্ড ১, পৃঃ ২৪৮-৫২।

২ ১৯৯২ সালে কায়রোস্থ মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়াহ কর্তৃক প্রকাশিত।

৩ আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরুন, খণ্ড ১, পৃঃ ২৩৫-৭।

কারী। তার তাফসীরে সাহাবীদের বক্তব্যসমূহের বর্ণনাসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে, তবে সংক্ষিপ্তভাবে। ব্যাকরণগত দিকসমূহ বেশ ব্যাপকভাবে এবং আইনগত বিষয়াবলী আরও দীর্ঘ পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে। তবে, বিষয়বস্তুর যাচাই-বাছাই ছাড়াই আবু ইসহাক বিপুল সংখ্যক ইসরাঈলী রেওয়ায়াতও উল্লেখ করেছেন। অধিকন্তু, হাদীস শাস্ত্রে তার বিশেষ পারদর্শিতা না থাকায় তিনি তার তাফসীরে অনেক দুর্বল ও জাল হাদীস অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১]

৪. তাফসীর ইবনু জারীর আত তাবারী, জামি'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন

মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী ﷺ (২২৫-৩১০ হিঃ/৮৩৯-৯২৩ 'ঈসায়ী) বর্তমান পশ্চিম ইরানের তাবরীজ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন সুপরিচিত ফকীহ, হাদীস বিশেষজ্ঞ ও ইতিহাস বিশারদ। মূলত একজন শাফিয়ী বিশেষজ্ঞ হলেও তিনি নিজেও একজন মুজতাহিদ ছিলেন এবং সুনির্দিষ্ট মাযহাবের গণ্ডি থেকে বের হয়ে অনেক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দিতেন। তার তাফসীরটিই হলো সর্বপ্রাচীন তাফসীর যা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় পৌঁছেছে। তিনি এতে অনেক বর্ণনা সংযোজন করেছেন এবং তার অধিকাংশই যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। তিনি বিভিন্ন রকমের কিরাআত ও তার তাৎপর্য উল্লেখ করেছেন। তিনি অনেক ইসরাঈলী রেওয়ায়াত নিয়ে আলোচনা করেছেন। মু'তাযিলাদের মতো পথভ্রষ্ট ফিরকাসমূহের মতামত উল্লেখ করে তা খণ্ডন করেছেন। পরবর্তীকালে রচিত সকল তাফসীরই কোনো না কোনোভাবে এ তাফসীরের উপর নির্ভরশীল।[২] এ গ্রন্থের মুদ্রিত সংস্করণসমূহের মধ্যে সর্বাধিক মানসম্পন্ন সংস্করণ হলো সেটি, যেখানে গ্রন্থকারের উদ্ধৃত বর্ণনাসমূহের সনদের উপর শায়েখ আহমাদ শাকিরের তাহ্কীক রয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, শায়েখ আহমাদ শাকিরের মৃত্যুতে তাহ্কীকের এ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় যা তিনি মাত্র সূরা আল মায়িদা'র পঞ্চম আয়াত পর্যন্ত সম্পন্ন করেছিলেন।[৩]

---

১ দেখুন আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরুন, খণ্ড ১, পৃঃ ২৩৮-৪৫।

২ প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃঃ ২১৫-৩৪।

৩ কায়রোস্থ দারুল মাআরিফ কর্তৃক মুদ্রিত।

৫. তাফসীর আল বাগাবী, মা'আলিমুত তানযীল

হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ আল বাগাবী رحمه الله (৫১০ হিঃ/মৃত্যু ১১১৭ 'ঈসায়ী) ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত ফকীহ ও তার সময়ের একজন প্রথম সারির হাদীস বিশারদ। তার তাফসীরটি হলো তাফসীরুস সা'লাবী'র একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ যেখানে অধিকাংশ জাল ও দুর্বল বর্ণনা বাদ দেয়া হয়েছে এবং উল্লিখিত বর্ণনাসমূহের সকল সনদ উল্লেখ করা হয়েছে। সা'লাবীর তাফসীরে উল্লিখিত বিদ'আতী অনেক ধারণা ও তাফসীরের সাথে অপ্রাসঙ্গিক অনেক তথ্যও তিনি বাদ দিয়েছেন। ইমাম বাগাবী বিভিন্ন কিরাআতের কয়েকটিকে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন এবং কেবল অনিবার্য স্থানসমূহেই ব্যাকরণগত দিকসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন। তবে যাচাই-বাছাই ছাড়া কিছু ইসরাঈলিয়াত উল্লেখ করা হয়েছে এবং তুলনামূলক পর্যালোচনা ছাড়াই পূর্বসূরী আলিমদের মতপার্থক্যপূর্ণ কিছু মতামতও উল্লেখ করা হয়েছে। এ তাফসীরটি ইবনু কাসীরের তাফসীর ও তাফসীরে খাযেন এর সাথে একটি একক সংস্করণে মুদ্রিত হয়েছে এবং এটি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাভিত্তিক তাফসীরসমূহের অন্যতম।[১]

৬. তাফসীর ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম

আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনু কাসীর দিমাশকী رحمه الله (৬৯৯-৭৭৪ হিঃ/১৩০০-১৩৭৩ 'ঈসায়ী) ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত আলিম এবং ইবনু তাইমিয়া رحمه الله এর ছাত্র। তিনি একইসাথে একজন হাদীস বিশেষজ্ঞ ও ইতিহাসবেত্তাও ছিলেন। তার ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ 'আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ'কে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ইসলামী ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাফসীরে ইবনু কাসীরকেও সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। উলামায়ে কেরামগণের মধ্যে জনপ্রিয়তার দিক থেকে তাফসীরুত তাবারীর পরেই এর স্থান। এ গ্রন্থে তাফসীর করার পদ্ধতির উপর একটি বিস্তৃত ভূমিকা রয়েছে এবং সেখানে কুরআনের মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদানের উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইবনু কাসীর رحمه الله গভীর পর্যালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তার সকল বর্ণনা যাচাই-বাছাই

---

১ দেখুন আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন, খণ্ড ১, পৃঃ ২৪৫-৮।

করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবি'ঈনদের মতপার্থক্যসমূহকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করেছেন। বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে উল্লিখিত ইসরাঈলিয়াত ও অন্যান্য ভুল তথ্যের বিপদ সম্পর্কেও তিনি সতর্ক করেছেন। এতে ইসলামী শরী'আর বিভিন্ন বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং আইন বিশারদদের মতের ভিন্নতাসমূহকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে।[১] আশির দশকে এ তাফসীরের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, যা থেকে যয়ীফ ও জাল বর্ণনাগুলোকে বাদ দেয়া হয়েছে।[২]

৭. তাফসীর সা'লাবী, আল জাওয়াহিরুল হিসান ফী তাফসীরিল কুরআন

আব্দুর রহমান ইবনু মাখলুফ সা'লাবী জাযায়েরী ﵀ (মৃত্যু ৮৭৭ হিঃ/১৪৭২ 'ঈসায়ী) ছিলেন উত্তর আফ্রিকার অধিবাসী এবং মালিকী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত আলিম। তিনি তার দ্বীনদারী ও জ্ঞানের গভীরতার জন্য বেশ সুপরিচিত ছিলেন। তার তাফসীরটি হলো ইবনু আতিয়্যা'র তাফসীরের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, যেখানে তিনি বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য তাফসীরসমূহ বিশেষত তাফসীরুত তাবারী থেকে আরও কিছু তথ্য যোগ করেছেন। এ তাফসীরে উল্লিখিত সকল হাদীস সুপরিচিত গ্রন্থসমূহ থেকে নেয়া হয়েছে এবং সমস্ত ইসরাঈলী বর্ণনার যথাযথ পর্যালোচনা করা হয়েছে। ইমাম সা'লাবী ﵀ বিভিন্ন কিরাআতকে তালিকাভুক্ত করেছেন ও কিছু ব্যাকরণগত বিষয়ও আলোচনা করেছেন। সর্বোপরি তার তাফসীরটি হলো মূলত পূর্বেকার তাফসীরসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন যেখানে তার নিজের পক্ষ থেকে খুব কমই যোগ করা হয়েছে।[৩]

৮. তাফসীর জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আদ দুররুল মানসূর ফিত তাফসীর বিল মা'সূর

জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনু মুহাম্মাদ সুয়ূতী ﵀ (১৪৪৫-১৫০৫ 'ঈসায়ী/৮৪৯-৯১০ হিঃ) ছিলেন একজন বিখ্যাত শাফেয়ী ফিক্হ বিশেষজ্ঞ ও তার সময়ের প্রথম সারির হাদীস বিশারদ। প্রথমে তিনি তরজুমানুল কুরআন

---

১ দেখুন আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরুন, খণ্ড ১, পৃঃ ২৫২-২৫৭।

২ রাফেয়ী কর্তৃক সংক্ষেপিত।

৩ দেখুন আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরুন, খণ্ড ১, পৃঃ ২৫৭-২৬১।

নামে চার খণ্ডে একটি তাফসীর রচনা করেন যেখানে তিনি বর্ণনাসূত্রসহ দশ হাজারেরও বেশী হাদীস সংকলন করেন। যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, তার ছাত্ররা হাদীসের সনদ শিখতে খুব একটা আগ্রহী নয়, তখন তিনি সনদ মুছে দিয়ে কেবল হাদীসসমূহের মূল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে তাফসীরটিকে সংক্ষিপ্ত করে দেন। তাফসীরটিকে পুনরায় নাম দেয়া হয় আদ দুররুল মানসূর। হাদীস শাস্ত্রে তার ব্যাপক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মনে হয় তিনি শুদ্ধ অশুদ্ধের মধ্যে তফাৎ না করে কেবল অধিক পরিমাণ হাদীস সংগ্রহের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন।[১]

৯. তাফসীর আশ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর

মুহাম্মাদ ইবনু আলী শাওকানী ﵀ (মৃত্যু ১২৫৫ হিঃ/১৮৩৯ 'ঈসায়ী) ছিলেন ইয়েমেনের সানা'র অধিবাসী। তিনি যাইদী মাযহাবের একজন ছাত্র হিসেবে তার জ্ঞানান্বেষণ শুরু করেন। হাদীস শাস্ত্রে ব্যাপক অধ্যয়ন করে তিনি সুনির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণ থেকে স্বাধীন হয়ে যান। ইমাম শাওকানী তার তাফসীরে বর্ণনা ও মতামতভিত্তিক তাফসীরের উভয় পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করেছেন। তিনি হাদীসের বর্ণনাসূত্রকে সংক্ষেপ করে কেবল মূল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন এবং অধিকাংশ মতামত উৎসসহ উল্লেখ করেছেন। তার তাফসীরে ব্যাকরণগত, আইনী ও দার্শনিক অনেক বিষয় আলোচনা করা হয়েছে এবং বিখ্যাত মুফাস্‌সিরদের বক্তব্যও উল্লেখ করা হয়েছে। এ তাফসীরটি পাঁচ খণ্ডে মুদ্রিত এবং আহ্‌লুস সুন্নাহ'র আলিমদের মধ্যে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। সাম্প্রতিক একটি সংস্করণে এ গ্রন্থে উদ্ধৃত হাদীসসমূহের তাহ্‌কীক সমৃদ্ধ পাদটীকা সংযুক্ত হয়েছে।[২]

১০. তাফসীর ইবনু আব্বাস, তানবীরুল মিকবাস মিন তাফসীরি ইবনে আব্বাস

এ তাফসীরটি সঙ্কলন করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু ইয়া'কুব ফাইরুজাবাদী ﵀ (মৃত্যু ৮১৭ হিঃ/১৪১৪ 'ঈসায়ী), যিনি ছিলেন একজন শাফেয়ী মাযহাবের বিশেষজ্ঞ আলিম। তিনিই আল কামুসুল মুহীত নামক বিখ্যাত আরবি অভিধান প্রণেতা। এ তাফসীরের বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে বিখ্যাত সাহাবী ও মুফাস্‌সির

---

১ দেখুন আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরুন, খণ্ড ১, পৃঃ ২৬১-৪।

২ ফাতহুল কাদীর, সাইয়িদ ইবরাহীমের প্রামাণিকীকরণ (কায়রোঃ দারুল হাদীস)।

ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত ব্যাখ্যামূলক বক্তব্যসমূহ। গ্রন্থকার তাফসীরের প্রত্যেকটি অংশের বর্ণনাসূত্র উল্লেখ করেছেন। এ কারণে এ তাফসীরটিকে তাফসীর বির রিওয়ায়াহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে ইবনু আব্বাসের নামে সংকলিত ব্যাখ্যাসমূহ সনদের বিশুদ্ধতার দিক থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর। কেননা তার গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করছে স্বয়ং বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতার উপর। মুয়াবিয়া ইবনু সালিহ ও কাইস ইবনু মুসলিম কুফী'র বর্ণনাসূত্রকে বিশুদ্ধ মনে করা হয়, আর ইতিহাসবিদ ইবনু ইসহাকের বর্ণনাসূত্রকে মনে করা হয় হাসান (গ্রহণযোগ্য); পক্ষান্তরে ইসমাঈল ইবনু আব্দির রহমান সুদ্দী, কাবীর ও আব্দুল মালিক ইবনু জুরাইজের বর্ণনাসূত্রকে সংশয়পূর্ণ মনে করা হয়। দাহ্হাক ইবনু মাযাহিম হিলালী, 'আতিয়্যাহ 'আওফী, মুকাতিল ইবনু সুলাইমান আযদী ও মুহাম্মাদ ইবনুস সায়েব কালাবী, (যার বিরুদ্ধে হাদীস জাল করার অভিযোগ রয়েছে) এদের বর্ণনাসূত্রসমূহ দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। যেসব বর্ণনার সনদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনুস সায়েব কালাবী রয়েছে এমন বর্ণনার ভিত্তিতেই তাফসীরু ইবনি আব্বাস এর প্রায় পুরোটা রচিত হয়েছে। এ কারণে এ তাফসীরকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনির্ভরযোগ্য মনে করা হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ এটিকে প্রায় পুরোপুরিই প্রত্যাখ্যান করেছেন।[১]

তাফসীর বিদ দিরায়াহ

১. তাফসীর ফখরুদ্দীন রাজী, মাফাতীহুল গাইব

ফখরুদ্দীন ইবনু আলী রাজী رحمه الله (৫৪৪-৬০৬ হিঃ/১১৫০-১২১০ 'ঈসায়ী) ছিলেন ব্যাকরণশাস্ত্রে পারদর্শী ও দর্শনশাস্ত্রে উৎকর্ষ সাধনকারী একজন শাফে'য়ী বিশেষজ্ঞ। তার তাফসীরটি আটটি বৃহৎ খণ্ডে মুদ্রিত; তবে তার সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ বলেছেন যে, তিনি নিজে তার তাফসীরটি সমাপ্ত করেননি বরং তার ছাত্র শামসুদ্দীন আহমদ ইবনুল খলীল খুয়াইনী এ তাফসীরটি সমাপ্ত

১ দেখুন মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন, পৃঃ ৩৬০-৬২ ও আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরুন, পৃঃ ৮১-৩।

করেছেন।[১] জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার রকমারি বিষয়ে বিশদ আলোচনা থাকার কারণে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে রাজীর তাফসীরটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। আয়াত ও সূরার মধ্যকার সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে এ তাফসীরটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ তাফসীরটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি বিশ্বকোষের মতো। গ্রন্থকার গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিয়ে গভীর অনুসন্ধান চালিয়েছেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের পরিভাষা ব্যবহার করে তাদের মতামতসমূহ মূল্যায়ন করেছেন। মু'তাযিলাদের বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করে মৃদুভাবে খণ্ডন করেছেন এবং ফিক্‌হী বা আইনগত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন মাযহাবের মতামত বিশ্লেষণ করেছেন। তবে, এক্ষেত্রে তিনি সবসময়ই তার শাফেয়ী মাযহাবকে সমর্থন করেছেন। বেশ কম পরিসরে হলেও তিনি ব্যাকরণগত বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছেন।[২]

২. তাফসীর কুরতুবী, আল জামি'উ লিআহ্‌কামিল কুরআন ওয়াল মুবায়্যিন লি মা তাদাম্মানা মিনাস সুন্নাহ ওয়া আহ্‌কামিল ফুরকান

আবু আব্দিল্লাহ মুহামদ ইবনু আহ্‌মদ আনসারী কুরতুবী رحمه الله (মৃত্যু ৬৭১ হিঃ/১২৭৩ 'ঈসায়ী) বর্তমান স্পেনের কর্ডোভাতে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি তার অধ্যয়ন শুরু করেন এবং পরবর্তীতে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। এই জিহাদের সময় তিনি বন্দী হন এবং কৌশলে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন।[৩] পরিশেষে তিনি প্রাচ্যে ভ্রমণ করে শেষে মিশরে স্থায়ী হন এবং সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি তার তাফসীর গ্রন্থের জন্য সর্বাধিক খ্যাত, তবে পরকাল বিষয়ক গ্রন্থ আত তাযকিরাহ বি আহ্‌ওয়ালিল মাওত ওয়া আহ্‌ওয়ালিল আখিরাহ ও যুহ্‌দ (পরকালীন সফলতায় মনোনিবেশ করার লক্ষ্যে পার্থিব উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা) এর উপর একখানা গ্রন্থের জন্যও তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।[৪]

১ দেখুন শর্টার এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, পৃঃ ৪৭০।

২ দেখুন আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরুন, খণ্ড ১, পৃঃ ২৯৮-৩০৪।

৩ দেখুন আল জামি' লিআহ্‌কামিল কুরআন, খণ্ড ১০, পৃঃ ১৭৫-১৭৬।

৪ দেখুন শাযারাতুয যাহাব, খণ্ড ৫, পৃঃ ৩৩৫, এবং আল জামি' লিআহ্‌কামিল কুরআন, খণ্ড ১, প্রকাশকের ভূমিকা।

তার তাফসীরটি শুরু হয়েছে কুরআনের ফযিলত, তিলাওয়াতের শিস্টাচার ও তাফসীরের সঠিক পদ্ধতির উপর প্রায় সত্তর পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ভূমিকা দিয়ে। এ তাফসীরের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এখানে ফিক্‌হ সংক্রান্ত বিষয়াবলীর উপর ব্যাপক জোর দেয়া হয়েছে ঠিকই, তবে কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। কেউ মনে করতে পারেন যে, কুরতুবীর তাফসীরটি তাফসীর বিদ দিরায়াহ প্রকৃতির। কারণ স্বাভাবিকভাবেই ফিক্‌হ শাস্ত্রের সম্পর্কই হলো কুআনের আয়াত থেকে আইন-কানুন বের করে আনার সাথে। এ তাফসীরে তিনি প্রত্যেকটি আয়াতের সাথে প্রাসঙ্গিক হাদীসসমূহ সংযুক্ত করেছেন এবং বর্ণনাসূত্র বাদ দিলেও সাহাবা, তাবি'উন ও প্রখ্যাত উলামায়ে কেরামগণের ব্যাখ্যাসমূহ সন্নিবেশিত করেছেন। উদ্ধৃত হাদীস কোন গ্রন্থে পাওয়া যাবে অথবা কোন গ্রন্থকার তা সংকলন করেছেন—তিনি তা উল্লেখ করেছেন। মূল আয়াত উপস্থাপন করার পর তিনি বলে দেন, এ আয়াতকে কেন্দ্র করে তিনি কোন কোন বিষয় আলোচনা করতে চান। কঠিন শব্দসমূহ বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে এক দু' ছত্র কবিতার উদ্ধৃতির মাধ্যমে ব্যাখ্যা শুরু করা হয়েছে। বিভিন্ন কিরাআত ও তার কারীদের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। ফিক্‌হ সংক্রান্ত ইস্যু আলোচনা করার সময় তিনি প্রধান মতামতসমূহ প্রমাণসহ উল্লেখ করে সেগুলো মূল্যায়ন করেছেন। তিনি সাধারণত মালিকী মাযহাবকে সমর্থন করেন, তবে তা সবসময় নয়। এ তাফসীরে শী'য়া, মু'তাযিলা ও কাদ্‌রিয়্যাদের মতো পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের চিন্তাধারাসমূহকে জ্ঞানগর্ভ পদ্ধতিতে খণ্ডন করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি তাফসীরশাস্ত্রের জগতে বিশাল কীর্তিসমূহের অন্যতম। কুরআনের ফিক্‌হ সংক্রান্ত বিষয়াবলী বুঝার জন্য এ তাফসীরটি সত্যিই অতুলনীয় এক রচনা।[১]

৩. তাফসীর বায়দাবী, আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তা'ওয়ীল

নাসিরুদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবনু আলী বায়দাবী رحمه الله (মৃত্যু ৬৯১ হিঃ/১২৯১ 'ঈসায়ী) ছিলেন পারস্য অঞ্চলের একজন শাফে'য়ী মাযহাবের আলিম এবং তিনি শাসক সিরাজের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তার তাফসীরটি যামাখশারীর আল কাশ্‌শাফ এর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, যেখান থেকে

১ দেখুন আল জামি' লিআহ্‌কামিল কুরআন, খণ্ড ১, পৃঃ ৬-৭, গ্রন্থকারের ভূমিকা, ও আল মাবাহিস ফী 'উলূমিল কুরআন, পৃঃ ৩৯১।

তিনি মু'তাযিলা দর্শনের অধিকাংশ বাদ দিয়েছেন। তবে, মাঝেমধ্যেই তিনি যামাখশারীর ব্যাখ্যার ফাঁদে আটকে গেছেন। যেমন, প্রতি সূরার শেষে তা পাঠ করার ফজিলত উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যামাখশারীর দুর্বল ও জাল হাদীস উল্লেখ করার রীতি তিনিও অনুসরণ করেছেন। ইমাম বায়দাবী তার কিছু কিছু তথ্য রাজীর মাফাতীহুল গাইব ও রাগিব ইস্পাহানীর তাফসীর থেকে নিয়েছেন এবং তিনি সাহাবা ও তাবী'ঈনদের বর্ণনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ কারণে তিনি সৃষ্টির বিস্ময় সম্বলিত সব আয়াতকেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যের দ্বারা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি কুরআনের আয়াতসমূহের বিভিন্ন তিলাওয়াতও উল্লেখ করেছেন; তবে তিনি নিজেকে বিশুদ্ধ বর্ণনার মধ্যে সংযত রাখেননি। তা সত্ত্বেও এ তাফসীরটি ইসরাঈলিয়াত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এর ভাষাও অনেক পরিশীলিত ও রুচিশীল। যুগ যুগ ধরে ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ এ তাফসীরটিকে অনেক উঁচু মর্যাদা দিয়েছেন এবং এর অনেক ব্যাখ্যা ও টীকাগ্রন্থ রচনা করেছেন।[1]

৪. তাফসীর আন নাসাফী, মাদারিকুত তানযীল ওয়া হাকাইকুত তা'ওয়ীল

আব্দুল্লাহ ইবনু মাহমুদ নাসাফী ﷺ (মৃত্যু ৭০১ হিঃ/১৩০২ 'ঈসায়ী) ছিলেন খ্যাতিমান একজন হানাফী আলিম। তিনি উসূলুল ফিক্‌হের উপর অনেকগুলো গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি ক্লাসিক্যাল বেশ কিছু গ্রন্থের ভাষ্য লিখেছেন। তার তাফসীর গ্রন্থটি মূলত বায়দাবীর তাফসীরেরই একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, যেখানে তিনি সূরার ফজিলত সংক্রান্ত জাল হাদীসগুলোকে মুছে দিয়েছেন। কিরাআতের ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে সাতটি বিশুদ্ধ কিরাআতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন এবং প্রত্যেকটি কিরাআতকে তার কারীর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। ইমাম নাসাফী আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ফিক্‌হী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং প্রত্যেক মাযহাবের যুক্তিসমূহ বিশ্লেষণ ও খণ্ডন করে তার নিজের হানাফী মাযহাবের অবস্থানকে সমর্থন করেছেন। ব্যাকরণগত বিষয়াবলীর আলোচনা এ গ্রন্থে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, তাফসীরটি মাঝারি পরিসরের এবং এর বর্ণনা পদ্ধতি সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট।[2]

---

১ দেখুন, আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরুন, খণ্ড ১, পৃঃ ৩০৪-১১।

২ প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃঃ ৩১১-১৭।

৪. তাফসীর খাযিন, লুবাবুত তা'ওয়ীল লি মা'আনিত তানযীল

আলী ইবনু খলীল শাইহী রহিমাহুল্লাহ (৬৭৮-৭৪০ হিঃ/১২৭৯-১৩৪০ 'ঈসায়ী) ছিলেন 'খাযিন' অর্থাৎ গুদামঘরের রক্ষক উপনামে পরিচিত; কারণ তিনি ছিলেন দামেশকের একটি বইয়ের গুদামঘরের তত্ত্বাবধায়ক। এই শাফেয়ী বিশেষজ্ঞের জন্ম ও বেড়ে ওঠা বাগদাদে; তবে তিনি তার অধ্যয়নের বেশীরভাগ সম্পন্ন করেছেন দামেশকে। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেমন: তার মাকবূলুল মানকূল নামক দশ খণ্ডের একটি বিশাল সংকলন রয়েছে যেখানে তিনি ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মুসনাদ, সিহাহ সিত্তাহ, ইমাম মালিকের মুয়াত্তা ও দারুকুতনীর সুনানে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ একত্রিত করেছেন। তার তাফসীরটি ইমাম বাগাবীর তাফসীরের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, যেখানে পূর্বের অন্যান্য তাফসীর থেকে কিছু বাড়তি তথ্য যোগ করা হয়েছে। তিনি যাচাই-বাছাই ছাড়াই ইসরাঈলী বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। কুরআনের যেখানেই নবী ﷺ এর যুগে সংঘটিত যুদ্ধের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, খাযিন সেগুলোর উপর ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তার তাফসীরে ফিক্হী বিষয়াবলীও সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। তবে মাঝে-মধ্যে এমনসব বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে তাফসীরের সাথে যার আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। সুফীবাদ দ্বারা প্রভাবিত আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও উপদেশের উপরও তাফসীরটিতে ব্যাপক জোর দেয়া হয়েছে—যা সুফীবাদের প্রতি ইমাম খাযিনের ঝোঁকের কিছুটা প্রতিফলন ঘটিয়েছে। তাফসীরটি সাতটি মাঝারি পরিসরের খণ্ডে বিভক্ত ও বহুল প্রচারিত। গল্পপ্রিয় পাঠকদের কাছে এ তাফসীরটি বিশেষ পছন্দনীয়। তবে, বিশেষজ্ঞদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এতে উল্লিখিত বিভিন্ন তথ্যের শুদ্ধতার ব্যাপারে যাচাই-বাছাই প্রয়োজন।[1]

৬. তাফসীর আবী হাইয়ান, আল বাহরুল মুহীত

মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ ইবনু হাইয়ান আন্দালুসী রহিমাহুল্লাহ (৬৫৪-৭৪৫ হিঃ/১২৫৬-১৩৪৪ 'ঈসায়ী) আবু হাইয়ান নামে সমধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন কুরআন তিলাওয়াত, কবিতা ও ব্যাকরণ বিষয়ে ব্যাপক পাণ্ডিত্যের অধিকারী।

১ দেখুন, আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরুন, খণ্ড ১, পৃঃ ৩১৮-২৪।

প্রাথমিক জীবনে তিনি যাহিরী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে তা ছেড়ে দিয়ে তিনি শাফেয়ী মাযহাব গ্রহণ করেন। উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে তিনি পরিশেষে মিশরে স্থায়ী হন। এ তাফসীরটি আট খণ্ডে সমাপ্ত। কুরআনের ভাষাশৈলীর উপর বিশেষায়িত একটি তথ্যসূত্র গ্রন্থ হিসেবে উলামায়ে কেরামগণ এটিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। আবু হাইয়ান ব্যাকরণবিদদের মধ্যকার মতপার্থক্যসমূহকে সবিস্তারে উল্লেখ করে তার তাফসীরের অধিকাংশ আলোচনা করেছেন ব্যাকরণের দৃষ্টিভঙ্গিতে। এ তাফসীর রচনায় ব্যাকরণের প্রতি এতোটাই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, তার এ গ্রন্থটিকে কেউ কুরআনের তাফসীর মনে না করে ব্যাকরণ গ্রন্থ মনে করে বসতে পারেন। তবে তিনি তার তাফসীরে ফিক্‌হ শাস্ত্র, কুরআন তিলাওয়াত, কুরআনের বাগ্মিতা ও আহ্‌লুস সুন্নাহ্‌র পূর্বেকার উলামায়ে কেরামগণের বেশ কিছু বক্তব্যও সংকলন করেছেন। অনেক স্থানে তিনি যামাখশারীর দার্শনিক যুক্তি ও তার ব্যাকরণগত ব্যাখ্যাকেও খণ্ডন করেছেন।[1]

৭. তাফসীর নিশাপুরী, গারাইবুল কুরআন ওয়া রাগাইবুল ফুরকান

নিজামুদ্দীন ইবনুল হাসান নিশাপুরী رحمه الله (৭২৮ হিঃ/মৃত্যু ১৩২৮ ‘ঈসায়ী), উপনাম নিজাম আ’রাজ, কোম শহরে জন্মগ্রহণ করলেও বেড়ে ওঠেন নিশাপুরে। পরবর্তীতে তিনি একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক, ব্যাকরণবিদ ও কারীতে পরিণত হন। ইমাম রাজী’র তাফসীরটিকে যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে সংক্ষেপ করে, আল কাশ্‌শাফ, অন্যান্য তাফসীর, সাহাবা ও তাবি‘ঈনদের তাফসীর থেকে বাড়তি তথ্য সংগ্রহ করে নিশাপুরী তার তাফসীরটি রচনা করেছেন। তার তাফসীরে অনুসরণীয় পদ্ধতিটি তাফসীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে একেবারেই অনন্য। আয়াত উল্লেখ করার পর প্রথমে তিনি তার বিভিন্ন কিরাআত উল্লেখ করেছেন এবং দশজন প্রধান কারীর মধ্যে এ তিলাওয়াতটি কে করেছেন তা প্রমাণ করেছেন। তারপর তিনি কোথায় কোথায় থামা যেতে পারে তার সম্ভাব্য স্থানসমূহ উল্লেখ করেছেন এবং কিরাআতের ভিন্নতা থেকে উদ্ভূত আয়াতের অর্থসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন। তারপর তিনি আয়াতসমূহের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং আয়াতের

---

১ প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃঃ৩২৫-২৯।

ব্যাকরণগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাফসীর শুরু করেছেন। অতঃপর তিনি ফিক্হী মাসআলা-মাসাইল এবং বিভিন্ন দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তিভিত্তিক মতামতসমূহ উল্লেখ করে আহলুস সুন্নাহ্র বিশুদ্ধ অবস্থানকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন। সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কিত আয়াতসমূহকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করা হয়েছে। সুফীবাদের প্রতি গ্রন্থকারের প্রচণ্ড ঝোঁক থাকার কারণে প্রত্যেক আয়াতের তাফসীরের শেষে আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত ও তার ব্যক্তিগত ফয়েয হাসিলের আলোচনায় মনোনিবেশ করেছেন। বর্তমানে এ তাফসীরটি তাফসীরে তাবারীর একটি সংস্করণের পৃষ্ঠার পাশে মুদ্রিত এবং বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বহুল পঠিত।[১]

৮. তাফসীর জালালাইন

এ তাফসীরটি জালালুদ্দীন নামক দু'জন বিশেষজ্ঞের যৌথ রচনা। এদের উভয়েরই উপাধি ছিল 'জালালুদ্দীন' বা দ্বীনের মহিমা। এরা হলেন আদ দুররুল মানসূর প্রণেতা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (১৪৪৫-১৫০৫ 'ঈসায়ী) ও জালালুদ্দীন মহল্লী رحمه الله (৭৯১-৮৬৪ হিঃ/১৩৮৯-১৪৬০ 'ঈসায়ী)। জালালুদ্দীন সুয়ূতী সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে; অতএব এখন আমরা আলোচনা করবো দ্বিতীয়জন সম্পর্কে । তার আসল নাম ছিল মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম মহল্লী। তিনি মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের একজন বিখ্যাত আলিম। তাকে তৎকালীন শাসকের পক্ষ থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু তিনি এ পদ গ্রহণের চেয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ফিক্হ শাস্ত্রের পাঠদান ও ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করাকে প্রাধান্য দেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি বেশ কিছু সহজ ও সংক্ষিপ্ত আকারের গ্রন্থ রচনা করেছেন যা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সূরা কাহ্ফ থেকে তিনি তার তাফসীর শুরু করে সূরা নাস পর্যন্ত সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি কুরআনের প্রথম সূরা আল ফাতিহার তাফসীর করেছেন; তবে বাকীটুকু সম্পন্ন করার আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তারপর জালালুদ্দীন সুয়ুতী সূরা আল বাকারা থেকে সূরা আল ইস্রা পর্যন্ত তাফসীর সম্পন্ন করেছেন– যা কুরআনের অর্ধেকের চেয়ে কিছুটা কম।

---

১ দেখুন আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরুন, খণ্ড ১, পৃঃ ৩২৯-৩৪০।

তাফসীরের ক্ষেত্রে তিনিও জালালুদ্দীন মহল্লীর পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এ তাফসীরে আয়াতের মৌলিক অর্থ ব্যাখ্যা করে সর্বাধিক সম্ভাব্য মতামতসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। একান্ত প্রয়োজনবশত মাঝেমধ্যে ব্যাকরণগত ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করা হয়েছে। প্রসিদ্ধ তিলাওয়াতসমূহের কিছু উদ্ধৃতিও প্রদান করা হয়েছে। অল্প কয়েকটি স্থানে লেখকদ্বয় একে অন্যের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। সেগুলোর একটি হলো রূহ বা আত্মা, যাকে সূরা সা-দে মহল্লী ব্যাখ্যা করেছেন একটি সূক্ষ্ম পদার্থ বা মৌল হিসেবে যা মানুষের ভেতর ফুঁকে দেয়া হলে সে জীবন্ত হয়ে ওঠে। সুয়ুতী সূরা আল হিজর এর তাফসীরে মহল্লীর সাথে একমত পোষণ করেছেন, তবে সূরা আল ইস্‌রা'র ৮৫ নং আয়াতে:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

"এরা তোমাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বলে দাও, এই রূহ আমার রবের হুকুম মাত্র; কিন্তু তোমাদেরকে খুব সামান্যই জ্ঞান দেয়া হয়েছে।" (আল ইসরা, ১৭: ৮৫)

সুয়ূতী মহল্লীর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, এ আয়াতের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত হলো এই যে, রূহের প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে আল্লাহর বিশেষ এক জ্ঞান; অতএব একে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা না করাই শ্রেয়। সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এ তাফসীরটি সন্দেহাতীতভাবে একটি অত্যন্ত মূল্যবান কীর্তি এবং এটি সর্বাধিক জনপ্রিয় তাফসীরসমূহের অন্যতম। এর অনেকগুলো সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে এবং এর উপর অসংখ্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হলো হাশিয়াতুল জামাল ও হাশিয়াতুস সাওয়ী।[১] ভারতীয় উপমহাদেশের হানাফী মাযহাবের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এ তাফসীরের পাঠ দান করা হয়।

৯. তাফসীর খতীব শিরবীনি, আস সিরাজুম মুনীর

মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ শিরবীনি رحمه الله (মৃত্যু ৯৭৭ হিঃ/১৫৬৯ 'ঈসায়ী) ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের একজন মিশরীয় বিশেষজ্ঞ। তিনি জনসাধারণের মাঝে 'আল খতিব' উপাধিতে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তার তাফসীরটি

১ দেখুন আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরুন, খণ্ড ১, পৃঃ ৩৪১-৫।

পূর্বের তাফসীরসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ এবং তাফসীরুর রাজী থেকে অনেক উদ্ধৃতিতে পরিপূর্ণ। কেবল সর্বাধিক সঠিক কিংবা তার কাছাকাছি মতামতসমূহ বেছে নিয়ে তিনি অধিক মাত্রায় মতপার্থক্যপূর্ণ মতামতসমূহ এড়িয়ে চলেছেন। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই কেবল তিনি ব্যাকরণগত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এবং মাঝেমধ্যে সাতজন বিখ্যাত কারীর কারো কারো তিলাওয়াত উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া, তিনি কেবল সহীহ কিংবা হাসান শ্রেণীর নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহই উল্লেখ করেছেন এবং জাল হাদীস ব্যবহার করার কারণে যামাখশারী ও বায়দাবীর মতো পূর্বের কতিপয় মুফাস্‌সিরের সমালোচনাও করেছেন। শিরবীনি বিভিন্ন জটিল আয়াত ও আয়াতের মধ্যে বিষয়গত সম্পর্ক নিয়েও সযত্ন আলোচনা করেছেন। আইনগত বিষয়াবলী তিনি খুব কমই উল্লেখ করেছেন, তাও আবার সংক্ষিপ্তভাবে। তবে, শুদ্ধতা বিশুদ্ধতা যাচাই-বাছাই না করে গ্রন্থকার প্রায়ই বিভিন্ন কাল্পনিক গল্প ও খুবই অদ্ভূত প্রকৃতির ইসরাঈলী বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।[১]

১০. তাফসীর আবীস সা'উদ, ইরশাদুল আকলীস সালীম ইলা মাযাইয়াল কিতাবিল কারীম

আবুস সা'উদ মুহাম্মাদ ইবনু মুস্তাফা ঈমাদী ﷺ (৮৯৪-৯৮২ হিঃ/১৪৮৯-১৫৭৪ 'ঈসায়ী) কন্সট্যান্টিনোপলের নিকটবর্তী একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরবর্তীতে হানাফী মাযহাবের একজন বিশেষজ্ঞ আলিমে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি তুরস্কের বেশ কিছু ইসলামী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এবং খোদ কন্সট্যান্টিনোপলসহ বেশ কয়েকটি শহরের বিচারপতি নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি মুফতী পদে নিযুক্ত হন এবং ত্রিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।[২] তার তাফসীরটি মূলত আল কাশ্‌শাফ ও বায়দাবীর তাফসীরের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে; ব্যতিক্রম কেবল এতোটুকু যে, তিনি তাদের দুর্বলতাগুলো পরিহার করেছেন। তারপরও তিনি সূরার ফজিলত বর্ণনার ক্ষেত্রে জাল হাদীসের ফাঁদে পড়েছিলেন। কুরআনী বর্ণনার অলৌকিক গঠন ও বাগ্মিতা বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে গ্রন্থকার ব্যাপক প্রয়াস

---

১ দেখুন আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরুন, খণ্ড ১, পৃঃ ৩৪৬-৫২।

২ বস্তুত, তিনি ছিলেন সম্ভবত উসমানী সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এককভাবে সর্বাধিক প্রভাবশালী বিশেষজ্ঞ। দেখুন দ্যা ভেঞ্চার অব ইসলাম, খণ্ড ৩, দ্যা গানপাউডার এম্পায়ারস, পৃঃ ১১০-১১।

চালিয়েছেন। তিনি কেবল সেখানেই ভিন্ন ভিন্ন কিরাআত উল্লেখ করেছেন, যেখানে সেগুলো আয়াতের কোনো বাড়তি ব্যাখ্যা প্রদান করে। খুবই কম ইসরাঈলিয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। আইনগত বিষয়াবলীতে বিভিন্ন মতামত মাঝেমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি মাঝেমধ্যে আয়াতের বিভিন্নধর্মী ব্যাকরণগত অর্থ উল্লেখ করেছেন এবং প্রমাণ উপস্থাপন সাপেক্ষে সর্বাধিক সঠিক অর্থটি বেছে নিয়েছেন। তাফসীরটি পাঁচটি মাঝারী পরিসরের খণ্ডে বহুবার পুনঃমুদ্রিত হয়েছে। প্রাঞ্জল উপস্থাপনা ও নান্দনিকতার কারণে এটি বিশেষজ্ঞদের মাঝে বেশ জনপ্রিয়।[১]

১১. তাফসীর আলূসী, রূহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস সাব'ইল মাসানী

সাইয়েদ মাহমুদ আফেন্দী আলূসী رحمه الله[২] (১২১৭-১২৬৯ হিঃ/১৮০২-১৮৫৩ 'ঈসায়ী) ছিলেন ইরাকে শাফে'য়ী মাযহাবের প্রথম সারির বিশেষজ্ঞদের অন্যতম। তিনি বাগদাদের মুফতী নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিভিন্ন মাযহাবের আইনগত মতামতগুলো সম্পর্কে তিনি বেশ ভালো জ্ঞান রাখতেন। অনেক বিষয়ে তিনি প্রায়ই ইমাম আবু হানিফা رحمه الله এর মতের অনুসরণ করেছেন। গ্রন্থকার তার তাফসীরে পূর্বের বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং পরবর্তীকালের বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যাসমূহ অনেক যত্ন ও সতর্কতা সহকারে সঙ্কলন করেছেন। যে বক্তব্য যিনি দিয়েছেন তা সতর্কতার সাথে তার নামেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের পরস্পর-বিরোধী মতামতসমূহকে কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব না করে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। ইমাম আলূসী প্রায়ই মু'তাযিলা ও শী'য়াদের অশুদ্ধ ব্যাখ্যা ও বিদ'আতী বিশ্লেষণসমূহ খণ্ডন করেছেন। তিনি সৃষ্টি সম্পর্কিত আয়াতসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহও উল্লেখ করেছেন এবং তিনি যেগুলোকে ভুল কিংবা অবাস্তব মনে করেছেন সেগুলোর সমালোচনাও করেছেন। কোনো পক্ষপাতিত্ব ছাড়া ব্যাকরণ ও আইন সংক্রান্ত বিষয়াবলী সুদীর্ঘ পরিসরে আলোচনা করেছেন। ইমাম আলূসী ইসরাঈলিয়াতের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং এমনকি মাঝেমধ্যে এগুলোকে হাস্যরসাত্মক বানিয়ে ছেড়েছেন। তবে তিনি বিভিন্ন তিলাওয়াত

---

১ দেখুন আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরুন, খণ্ড ১, পৃঃ ৩৫৩-৬০।

২ আলূসী ফোরাত নদীর একটি দ্বীপের নাম। তার পূর্বপুরুষগণ সেখানকার এক গ্রামে বসবাস করতেন।

উল্লেখ করার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধগুলোর মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেননি। তার ব্যাকরণগত যুক্তিসমূহের সমর্থনে সালাফ আলিমদের রচনা থেকে তিনি বহু উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। তিনি সাধারণত আধ্যাত্মিক বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করার মাধ্যমে প্রতিটি অধ্যায় শেষ করেছেন।

রূহুল মা'আনী মূলত একটি তাফসীর বিশ্বকোষ যেখানে তাফসীরের উপর পূর্বে লিখিত তথ্যসমূহের অধিকাংশকে জড়ো করে পর্যালোচনাসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। যদিও সরাসরি তাফসীরের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন বিভিন্ন বিষয়ের উপর গ্রন্থকার মাঝেমধ্যে অতিরিক্ত জোর দিয়েছেন, তদুপরি তার পদ্ধতিটি সবসময় ভারসাম্যপূর্ণ ও পক্ষপাতমুক্ত।[1]

মু'তাযিলাদের তাফসীর

মু'তাযিলা বিশেষজ্ঞগণ নিজেদের অশুদ্ধ ধারণাসমূহকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কুরআনকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যেভাবে সাহাবাগণ, তাবি'ঈন কিংবা তাঁদের ছাত্রদের কোনো আলিম কখনো করেননি। প্রথম যুগের আহ্‌লুস সুন্নাহ্‌র আলিমদের তাফসীর গ্রন্থসমূহের মতো তাদের প্রথম দিকের অধিকাংশ তাফসীরও সময়ের আবর্তে হারিয়ে গিয়েছে। সমসাময়িক মু'তাযিলী আলিমদের দেয়া উদ্ধৃতির মাধ্যমেই কেবল আমরা সেগুলো সম্পর্কে জানতে পারি। তাদের তাফসীর পদ্ধতিটি সর্বনিকৃষ্ট পদ্ধতির তাফসীর বিদ দিরায়াহ হিসেবে বিবেচিত। প্রথম যুগের মুফাস্‌সিরদের মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা ও অভিধানের চিরন্তন অর্থসমূহকে পুরোপুরি বাতিল করে দেয়ার ক্ষেত্রে এসব তাফসীর উল্লেখযোগ্য। মু'তাযিলাদের যেসব তাফসীর আজও টিকে আছে নিম্নে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করা হলো।

১. তাফসীর আব্দুল জাব্বার হামদানী, তানযীহুল কুরআন আনিল মাতা'ইন

আব্দুল জাব্বার ইবনু আহমদ হামদানী রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ৪১৫ হিঃ/১০২৪ 'ঈসায়ী) তার সময়ের একজন প্রধান মু'তাযিলা বিশেষজ্ঞ। তিনি রাই শহরের বিচারক নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং সেখানেই তিনি প্রায় গোটা জীবন শিক্ষকতা করে পার করেছেন। তিনি উসূলুল ফিক্‌হসহ ইসলামী জ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও বেশ

১ দেখুন আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরুন, খণ্ড ১, পৃঃ ৩৬০-৭০।

কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। দালাইলুন নুবুওয়াহ বা 'নবুওয়াতের প্রমাণসমূহ' নামক ইতিহাসবিষয়ক চমৎকার গ্রন্থটিও তারই রচনা। তার তাফসীরটিকে কুরআনের পূর্ণাঙ্গ তাফসীর বলা যায় না; কারণ তাতে আহ্‌লুস সুন্নাহ্‌র বিশেষজ্ঞ আলিমদের মতামতকে খণ্ডন করার লক্ষ্যে কেবল বিতর্কিত ও দ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাফসীরটি সূরা আল ফাতিহা দিয়ে শুরু করে সূরা আন নাস-এ গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। তবে অনেক সূরা ও আয়াতেরই ব্যাখ্যা করা হয়নি। গ্রন্থটি নির্দিষ্ট কিছু বিষয়কে কেন্দ্র করেই সাজানো হয়েছে এবং যেখানেই এ ধরনের কোনো বিষয় এসেছে সেখানে মুফাস্‌সিরের মতাদর্শের আলোকে তার সমাধান পেশ করা হয়েছে।[১]

২. তাফসীর শরীফ মুরতাদা, গারারুল ফাওয়াইদ ও দুরারুল কাবাইদ

আলী ইবনুত তাহির, আবু আহমদ হুসাইন (৩৫৫-৪৩৯ হিঃ/৯৬৬-১০৪৮ 'ঈসায়ী) এর পূর্বপুরুষদের শেকড় জাফর সাদিকের পুত্র শী'য়া ইমাম মূসা কাযিম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। ইরাকে তিনি ছিলেন শী'য়াদের প্রধান বিশেষজ্ঞ ও মু'তাযিলা চিন্তাধারার একনিষ্ঠ অনুসারী। আলী ইবনু আবী তালিবের প্রতি আরোপিত বক্তব্য সঙ্কলনমূলক গ্রন্থ নাহযুল বালাগাহ তিনি অথবা তার ভাই শরীফ রিদা রচনা করেছেন। শরীফ মুরতাদার তাফসীরে রয়েছে ব্যাখ্যা, হাদীস ও সাহিত্য সংক্রান্ত অনেকগুলো ভাষণ যা তিনি আঠারটি নির্দেশনামূলক পাঠ আকারে প্রদান করেছেন। এ কারণে তার তাফসীরের উপনাম হলো 'আমালীশ শরীফ মুরতাদা' বা শরীফ মুরতাদার দিকনির্দেশনা। গ্রন্থটির তাফসীর পরিচ্ছেদে সমগ্র কুরআনের ব্যাখ্যা নেই, বরং মু'তাযিলাদের মৌলিক নীতিমালাসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তাতে কিছু বাছাইকৃত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি গ্রন্থকার দক্ষতার সাথে মু'তাযিলা বিশ্বাসের সাথে স্পষ্ট সাংঘর্ষিক কিছু আয়াত বেছে নিয়ে সেগুলোকে অশুদ্ধ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল অর্থ থেকে দূরে সরিয়ে ফেলেছেন। সব মিলে তার গোটা তাফসীরটি ভাষাতাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণমূলক ব্যাপক পক্ষপাতদুষ্টতায় ভরা।[২]

---

১ দেখুন আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরুন, খণ্ড ১, পৃঃ ৩৯৯-৪১০।

২ দেখুন আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরুন, খণ্ড ১, পৃঃ ৪১০-৩৬।

৩. তাফসীর যামাখশারী, আল কাশ্‌শাফ 'আন হাকাইকিক তানযীল

মাহমুদ ইবনু উমার যামাখশারী খাওয়ারাজমী (৪৬৭-৫৩৮ হিঃ/১০৭৫-১১৪৪ 'ঈসায়ী) ছিলেন একজন হানাফী বিশেষজ্ঞ যিনি বাগদাদ ও খোরাসানে লেখাপড়া করেছেন। তিনি আরবি সাহিত্য, ব্যাকরণ, উসূলুল ফিক্‌হ, হাদীসের ভাষ্য ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। মু'তাযিলী আকীদা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও তার তাফসীরটিকে সাহিত্যিক দিক বিবেচনায় একটি অসাধারণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কুরআনের বিভিন্ন অলৌকিক দিকসমূহ সম্পর্কে তার ব্যাখ্যা সর্বাধিক বিস্তৃত ও ব্যাপক; আর কুরআনের অন্তঃমিল, ছন্দ ও বাগ্মিতা বিষয়েও তার আলোচনা সর্বাধিক সমন্বিত। মু'তাযিলী চিন্তাধারা অনুযায়ী কুরআনকে ব্যাখ্যা করার জন্য যামাখশারী তার আরবি ভাষার বিপুল পাণ্ডিত্যকে কাজে লাগিয়েছেন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, যেসব আয়াত তার মৌলিক চিন্তার সাথে সাংঘর্ষিক প্রতীয়মান হয়েছে সেগুলোকে তিনি রূপক আখ্যায়িত করে নতুন করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ফিক্‌হী বিষয়াবলীতে তার আলোচনা সংক্ষেপ ও পক্ষপাতমুক্ত এবং তিনি খুবই কম ইসরাঈলী বর্ণনা ব্যবহার করেছেন।[১]

---

১ দেখুন আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরুন, খণ্ড ১, পৃঃ ৪৩৭-৮৯।

৩

কুরআনের অর্থের অনুবাদ

মানবজাতির প্রতি আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষ গ্রন্থ আল কুরআন নাযিল হয়েছে আখেরী নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর নিজ জাতির ভাষায়। এদের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা বিশ্বের সর্বত্র তাঁর সর্বশেষ বাণী পৌঁছে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিচিত্র বর্ণে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে বিভিন্ন ভাষা শিখিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাঁর বাণী সহজে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে তিনি তাঁর প্রত্যেক রাসূলকে স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছেন। এ বিষয়টি নিম্নোক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে:

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ

"আমি প্রত্যেক রাসূলকে তাঁর নিজ জাতির ভাষাতেই প্রেরণ করেছি।"[১]

এভাবে প্রত্যেক নবীকেই তার নিজ জাতির লোকদের মধ্য থেকে বেছে নেয়া হয়েছে। তাঁরা সকলেই একই মৌলিক বার্তা বহন করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

"আর আমি প্রত্যেক জাতির নিকট এই মর্মে একজন রাসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।"[২]

পূর্বেকার যুগে আল্লাহ তা'আলা কোনো নবী-রাসূলকে সামগ্রিকভাবে গোটা মানবজাতির প্রতি প্রেরণ করেননি। প্রত্যেককে কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছেন। কিন্তু সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে প্রেরণ

১ সূরা ইবরাহীম (১৪): ৪।
২ সূরা আন নাহল (১৬): ৩৬।

করেছেন গোটা মানবজাতির প্রতি। সর্বশেষ বাণীর ব্যাপক এ সার্বজনিনতা নিম্নে উল্লিখিত দু'টি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়:

قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

"বলে দাও, হে মানব সম্প্রদায়, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল।"[১]

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا

"আর আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যই সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী করে পাঠিয়েছি।"[২]

সর্বশেষ বাণী আল কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য সার্বজনীন হলেও এ বার্তা নাযিল হয়েছে আরবি ভাষায়।

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রথমে আরব উপদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পর্যায়ক্রমে পুরো দ্বীপকে পরিবেষ্টন করে নেয় এবং আফ্রিকা, এশিয়া মাইনর, ভারত ও এশিয়ার নিকটবর্তী ভূ-খণ্ডসমূহে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অল্প সময়ের মধ্যে আরবি কেবল ইসলামের চূড়ান্ত বাণীর ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং বহুমুখী সংস্কৃতি ও বিভিন্ন ভাষার জনসমষ্টি নিয়ে গড়ে ওঠা এক বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের সরকারী ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর মধ্যে কোনো কোনো অঞ্চলের ভাষা যদিও আগে থেকেই আরবি ছিলো, কিন্তু অধিকাংশই ছিলো অন্যান্য ভাষাভাষী জাতি-গোষ্ঠী। তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলাম ও আরবি মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যান্য ভাষার লোকেরা আরবি-ইসলামী অনেক পরিভাষা গ্রহণ করে নেয় এবং সেসব পরিভাষা লেখার ক্ষেত্রেও আরবি বর্ণ ব্যবহার শুরু করে। পরিশেষে এসব ভাষার অনেকগুলোই আরবি দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে, এমনকি অনেকগুলো ভাষা আরবির মধ্যে একেবারে বিলীন হয়ে যায়। মিশরীয়দের কিবতি (Coptic) ও উত্তর আফ্রিকার অধিবাসীদের বার্বার ভাষা আরবি দ্বারা

১ সূরা আল আ'রাফ (৭): ১৫৮।

২ সূরা সাবা (৩৪): ২৮।

প্রতিস্থাপিত হওয়ার দু'টি প্রোজ্জ্বল উদাহরণ। অন্যদিকে হাউসা, ফার্সী ও মালয় ইত্যাদি ভাষা প্রচুর পরিমাণে আরবি শব্দ গ্রহণ করে নিয়েছে এবং এ ভাষাগুলো আরবি বর্ণমালায় লেখা আরম্ভ হয়েছে। অন্যান্য অনেক অঞ্চলে সমাজ, সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষায়ও আরবির ব্যাপক প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এমনকি এক পর্যায়ে এগুলোর অনেক ভাষা লেখাও হতো আরবি বর্ণমালায়। তবে, আব্বাসী খিলাফত দুর্বল হয়ে যাওয়ায় পারস্য ও তুর্কী যুদ্ধনেতারা রাষ্ট্রটিকে বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ও প্রতিদ্বন্দ্বী সালতানাতে বিভক্ত করে ফেলে। এসব সালতানাতের অনেকগুলোই সরকারী ভাষা হিসেবে ফার্সীকে গ্রহণ করে নেয়।[১] পরিশেষে মুসলিম রাষ্ট্রের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব গিয়ে পড়ে প্রথমে মঙ্গোলদের হাতে ও পরবর্তীতে তুর্কীদের হাতে; এর ফলে জন্ম নেয় এক ধরনের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ যেখানে তুর্কী ভাষা রাষ্ট্রের সরকারী ভাষায় পরিণত হয়। ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানাদি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে আরবির উপর গুরুত্ব একেবারেই কমিয়ে দেয়া হয়।[২] নবী ﷺ এর বিখ্যাত হাদীস

من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنة

"যে আল্লাহর কিতাব থেকে একটি অক্ষর পাঠ করবে, তার জন্য এর বিনিময়ে রয়েছে একটি সাওয়াব।"[৩]

একটি নতুন অর্থ পরিগ্রহ করে। বলা হয় যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ একথা বলেছিলেন আরবি ভাষাভাষী মুসলিমদেরকে কুরআন পাঠে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে। প্রকৃতপক্ষে এ উৎসাহের নেপথ্য উদ্দেশ্য ছিল এ বাণীর মর্ম অনুধাবন করে আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্কের উৎকর্ষ সাধন করা; নিছক তোতা পাখীর মতো বুলি আওড়ানো কখনো এর উদ্দেশ্য ছিল না। তুর্কী সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের উত্থানের সাথে সাথে নিছক সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআনের অক্ষর ও শব্দ পাঠের ধারণার উদ্ভব হয়। একটি শব্দের অর্থও না বুঝেই

---

১ দেখুন দ্যা নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, খণ্ড ২২, পৃঃ ১১৮-১৯।
২ দেখুন দ্যা ভেঞ্চার অব ইসলাম, খণ্ড ৩, দ্যা গানপাউডার এম্পায়ারস এন্ড মডার্ন টাইমস, পৃঃ ১২০-১।
৩ তিরমিযী কর্তৃক সংগৃহীত এ হাদীসটিকে আলবানী সহীহু সুনানিত তিরমিযী গ্রন্থে (খণ্ড ৩, পৃঃ ৯, হাদীস নং ২৩২৭) প্রামাণ্য আখ্যায়িত করেছেন। (আরো দেখুন রিয়াদুস সালিহীন, খণ্ড ২, পৃঃ ৫১২, নং ৯৯৯, ইংরেজি সংস্করণ)।

অনেক ছাত্র সমগ্র কুরআন মুখস্থ করতে শুরু করে। তোতা পাখীর ন্যায় কুরআন পাঠ একটি গ্রহণযোগ্য ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন প্রথায় পরিণত হয়।

মুসলিম রাষ্ট্রের ভাঙ্গান ও পতন এবং ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের উত্থানের সাথে সাথে অন্যান্য ভাষার উপর আরবি ভাষার প্রভাব বিস্তারের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ থেমে যায়। উপনিবেশবাদীরা মুসলিম অঞ্চলসমূহকে বিভক্ত করে নেয় এবং যেসব ভাষা তখনো আরবিতে সম্পূর্ণরূপে বিবর্তিত হয়নি সেগুলোকে ল্যাটিন বর্ণমালায় লিখতে জনগণকে বাধ্য করে। আফ্রিকার হাউসা ও সুহাইলী, মধ্যপ্রাচ্যের তুর্কি ও মালয়ের মতো এশীয় ভাষাসমূহকে জোরপূর্বক ল্যাটিন বর্ণমালা দিয়ে লিখতে বাধ্য করা হয়। আরবি ভাষার প্রভাব বিস্তারের ধারাকে জোর করে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার এ এক ন্যক্কারজনক দৃষ্টান্ত।[1] এর পর আরবি ভাষা শিক্ষার অনেক কুরআনী প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, এমনকি এগুলোকে 'ঈসায়ী বিদ্যালয় দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আর হাতেগোনা যে কয়টি প্রতিষ্ঠান টিকে যায় সেগুলোতে কেবল আরবির উচ্চারণ শেখানো হতো। পরিণতিতে মুসলমানদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এক পর্যায়ে আরবি বুঝতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়ে। কেউ কেউ আরবি জানলেও তা কেবল বর্ণমালা উচ্চারণ পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো।

এ শূন্যতা পূরণের মহৎ উদ্দেশ্যেই এসব অনারবি ভাষাভাষী দেশসমূহে কতিপয় মুসলিম বিশেষজ্ঞ তাদের স্থানীয় ভাষায় কুরআন অনুবাদ শুরু করেন। জ্ঞাত ইতিহাসে এ ধরনের অনুবাদের জগতে সর্বপ্রাচীন কীর্তি হলো দিল্লীর শাহ আব্দুল কাদিরের (মৃত্যু ১৮২৬ 'ঈসায়ী) অনুবাদ।[2] 'ঈসায়ী অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে অনুবাদের এ ধারা গতি সঞ্চার করতে শুরু করে। তবে, এগুলো বিদেশী ভাষায় প্রাচীনতম অনুবাদ ছিল না।

আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাসমূহ বিবর্তিত হওয়ার পূর্বে রোমান সাম্রাজ্যের ল্যাটিন ছিল ইউরোপে সংস্কৃতির ভাষা। এ কারণে সর্বপ্রাচীন যে অনুবাদের তথ্য পাওয়া যায় তা হলো ল্যাটিন ভাষায়। ১১৪৩ সালে সে অনুবাদ করা

১ দেখুন দ্যা নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, খণ্ড ২৯, পৃঃ ৮৫১-২ এবং খণ্ড ৭, পৃঃ ৭২৮। আরো দেখুন দ্যা ভেঞ্চার অব ইসলাম, খণ্ড ৩, দ্যা গানপাউডার এম্পায়ারস এন্ড মডার্ন টাইমস, পৃঃ ২৬৫-৬, ৩২৭-৮।

২ আলী, আব্দুল্লাহ ইউসুফ, দ্যা হলি কুরআন, পৃঃ ১৪।

হয়েছিল ক্লানীর মঠের (Monastery of Cluny) জন্য। তবে তা প্রথম প্রকাশিত হয় সুইজারল্যান্ডের বেসলেতে (Basle/Basel) ওরিয়েন্টালিস্ট সুইস প্রকাশ বিব্লিয়ান্ডার (Bibliander) কর্তৃক ১৫৪৩ সালে।[১] ল্যাটিন এ অনুবাদটি পরবর্তীতে ১৬১৬ সালে ব্যাভারিয়ায় (Bavaria) সুইগার (Schweigger) কর্তৃক জার্মান ভাষায়, ১৬৪৭ সালে প্যারিসে ডুরায়ার (DuRyer) কর্তৃক ফরাসী ভাষায় এবং ১৭৭৬ সালে সেন্ট পিটার্সবার্গে রুশ ভাষায় অনূদিত হয়।[২] এ. রসের (A. Ross) প্রথম ইংরেজি অনুবাদটি ছিল ডুরায়ারের ফরাসী অনুবাদের অনুবাদ মাত্র যা ডুরায়ারের কয়েক বছর পরই প্রকাশিত হয়।[৩] এ সময়ে ১৬৯৮ সালে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী পাপীদের পাপের স্বীকারোক্তি শোনার জন্য পোপ একাদশ ইনোসেন্টের নিযুক্ত কনফেসর মারাক্কী (Maracci) আরেকটি ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইউরোপীয়দের সামনে ইসলামের সম্ভাব্য সর্বনিকৃষ্ট চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যে মূল আরবি আয়াতের সাথে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারদের বক্তব্য থেকে চতুরতার সাথে বাছাই করে অনেক অসংলগ্ন তথ্য জুড়ে দেওয়া হয়। মারাক্কী ছিলেন একজন শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি, আর তার উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তিনি তার অনুবাদটিকে রোমান সম্রাট প্রথম লিওপল্ডকে উৎসর্গ করেন এবং ভূমিকার আড়ালে 'দ্য রিফিউটেশন অব দ্যা কুরআন' বা 'কুরআন খণ্ডন' শিরোনামে একটি পুস্তকের মতো রচনা করে তা এ গ্রন্থের শুরুতে জুড়ে দেন।[৪]

১৭৩৪ সালে প্রণীত জর্জ সেইলের (George Sale) অনুবাদটি সর্বাধিক প্রচারিত ইংরেজি অনুবাদসমূহের অন্যতম। সেইল মারাক্কীর ল্যাটিন সংস্করণ থেকে অনুবাদ করে তার সাথে নিজের পক্ষ থেকে আরও ভয়ানক পক্ষপাতদুষ্ট ভূমিকা ও টীকা-টিপ্পনী জুড়ে দিয়েছেন।[৫] এ ধরনের অন্যান্য দৃষ্টান্তের মধ্যে রয়েছে ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত রেভারেন্ড জে এম রডওয়েলের (JM Rodwell) অনুবাদ, যাতে সূরাসমূহকে এলোমেলো ক্রমধারায় স্থান দেয়া

১ আরবেরী, এ.জে., দ্যা কুরআন ইন্টারপ্রিটেড এর ভূমিকা, পৃঃ ৭।
২ আলী, আব্দুল্লাহ ইউসুফ, দ্যা হলি কুরআন, পৃঃ ১৪।
৩ দ্যা কুরআন ইন্টারপ্রিটেড এর ভূমিকা, পৃঃ ১০।
৪ আলী, আব্দুল্লাহ ইউসুফ, দ্যা হলি কুরআন, পৃঃ ১৪।
৫ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।

হয়েছে এবং ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত ই এইচ পালমারের (EH Palmer) অনুবাদ।[১]

এসব অনুবাদ গ্রন্থের প্রত্যেকটির ভূমিকা ও পাদটীকাগুলোতে ন্যক্কারজনক ইসলাম-বিদ্বেষী পক্ষপাতিত্ব বিদ্যমান। ফলে ভারতের কতিপয় মুসলিম বিশেষজ্ঞ ইংরেজি ভাষায় কুরআনের বিশুদ্ধ অনুবাদ প্রণয়নের প্রশংসনীয় কাজে হাত দেন। ১৯০৫ সালে সর্বপ্রথম কাজটি করেন পাতিয়ালার অধিবাসী ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হাকীম খান। দুর্ভাগ্যক্রমে, কিছু দিন পর ১৯১৭ সালে পথভ্রষ্ট আহ্মদিয়া ফিরকার পণ্ডিত মৌলভী মুহাম্মাদ আলীর একটি অনুবাদ প্রকাশ পায়। তার অনুবাদের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই আহ্মদিয়া চিন্তাধারার ব্যাপক প্রতিফলন ঘটে। সম্প্রদায়টির শক্তিশালী মিশনারী কার্যক্রমের ফলে এখনও পর্যন্ত তাদের অনুবাদটি পাশ্চাত্যে বহুল প্রচারণা পেয়েছে। ১৯১৯ সালে দিল্লীর মির্জা হাইরাতও একটি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। আর হাফিজ গোলাম সারওয়ারের অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৯ সালে। তবে এগুলোর কোনোটিই তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি।[২]

১৯৩০ সালে আরবি ভাষার ইংরেজ বিশেষজ্ঞ মুহাম্মাদ মারমাডিউক পিকথলের অনুবাদটি নওমুসলিম কোনো ব্যক্তির করা প্রথম ইংরেজি অনুবাদ। এ বিশেষজ্ঞ তার নিজ বক্তব্যমতে প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করার চেষ্টা করেছেন এবং একেবারে অল্প কিছু ব্যাখ্যামূলক পাদটীকা সংযুক্ত করেছেন।[৩] তা সত্ত্বেও তার অনুবাদটি মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় দ্বিতীয় অনুবাদ গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।

সম্ভবত সর্বাধিক পঠিত ইংরেজি অনুবাদটি হলো আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলীর অনুবাদ যা ১৯৩৪ সালে লাহোরে প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল। এটি একেবারে আক্ষরিক অনুবাদ নয়। এ গ্রন্থকার উচ্চতর ইংরেজি সাহিত্যে পারদর্শী হওয়ায় তিনি মূল আরবির সৌন্দর্যকে ধারণ করে একটি শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যকর্ম সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। তিনি কিছু সারমর্ম ও প্রচুর পাদটীকা সংযুক্ত করেছেন। এগুলোতে কয়েকটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বিদ'আতী না হলেও অত্যন্ত অশুদ্ধ কিছু

১ আলী, আব্দুল্লাহ ইউসুফ, দ্যা হলি কুরআন, পৃঃ ১৫।

২ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।

৩ পিকথল, মুহাম্মাদ মারমাডিউক, দ্যা মীনিং অব দ্যা গ্লোরিয়াস কোরান, পৃঃ ৭।

মতামত রয়েছে। কুরআনের নির্ভরযোগ্য ইংরেজি অনুবাদ প্রস্তুত করার জন্য ১৯৮০ সালে সৌদি আরবে একটি কমিটি গঠন করা হয়। তারা আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী'র অনুবাদের উঁচু মানের রচনাশৈলী ও মূল শব্দার্থের নিকটতম শব্দ চয়নের পাশাপাশি পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা ও ভাষ্য দেখে এটিকে সর্বোত্তম অনুবাদ হিসেবে বেছে নেন।[১] তারা অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, এতে কিছু মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে। তারা সেগুলো দূর করার লক্ষ্যে তার অনুবাদ ও টীকায় বেশ কিছু সংশোধনীও এনেছেন। সংশোধিত এ সংস্করণটি ১৯৮৫ সালে মদীনাস্থ 'কিং ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং প্রেস' কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

যেসব অনুবাদকে সৌদি পর্যালোচনা পরিষদ প্রকাশ করতে অসম্মতি জানিয়েছেন সেগুলোর অন্যতম হলো অস্ট্রিয়ার নওমুসলিম মুহাম্মাদ আসাদের অনুবাদ। প্রথমে এটি প্রকাশ করার কথা বিবেচনা করা হয়েছিল, কিন্তু মু'তাযিলা দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব[২] থাকার কারণে রাবিতাহ (মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ) তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে আসাদ নিজেই তা প্রকাশ করেন এবং তা বিতরণের জন্য খ্যাতনামা ওরিয়েন্টালিস্ট প্রকাশক ই. জে. ব্রিলের সাথে চুক্তি করেন।[৩]

আরেক নওমুসলিম প্রফেসর টি বি আরভিং এর কাছে পিকথল ও ইউসুফ আলীর সেকেলে ধাঁচের ভাষা পছন্দ না হওয়ায় তিনি আধুনিক ইংরেজিতে একটি আমেরিকান সংস্করণ রচনা করেন যা ১৯৯২ সালে প্রকাশ পায়।[৪] এ গ্রন্থে আধুনিক ইংরেজিতে কুরআন অনুবাদের সমস্যা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গ্রন্থের শুরুতেই প্রতিটি সূরার উপর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি ভূমিকা সংযুক্ত করা হয়েছে, তবে এখানে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

অনুবাদের এ ধারাবাহিকতায় এরপর রয়েছেন প্রফেসর মুহাম্মাদ তাকিউদ্দীন হিলালী ও ড. মুহাম্মাদ মুহসিন খান। এ দু'জনই মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের

---

১ দ্যা হলি কুরআন, ইংলিশ ট্রান্সলেশন অব দ্যা মীনিংস আন্দ কমেন্টারী এর ভূমিকা, পৃঃ ৬।

২ তিনি সবসময়ই অলৌকিক ঘটনা সম্বলিত আয়াতসমূহকে রূপক আখ্যা দিয়ে কৈফিয়তমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেসবের ব্যাখ্যা এড়িয়ে যান এবং আল্লাহ পাকের বর্ণনাসম্বলিত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও তিনি একই পন্থা অবলম্বন করেন। বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, তিনি মুহাম্মাদ আব্দুহুর মতামতের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেন। দেখুন দ্যা ম্যাসেজ অব দ্যা কুরআন, শুরুর কথা, পৃঃ ৫, পাদটীকা ৪।

৩ দেখুন দ্যা ম্যাসেজ অব দ্যা কুরআন, গ্রন্থসূত্রের তথ্য সংক্রান্ত পৃষ্ঠা।

৪ দেখুন টি.বি. আরভিং, দ্যা নোবল কুরআন, পৃঃ ৩৭।

সাথে সম্পৃক্ত। তারা ১৯৮৫ সালে তাদের যৌথ অনুবাদ 'ইন্টারপ্রিটেশন অব দ্যা মীনিংস অব দ্যা নোবল কুরআন' প্রকাশ করেন। এটির বিশেষত্ব হলো, অনুবাদের ভেতরেই ইমাম তাবারী, কুরতুবী ও ইবনু কাসীরের তাফসীরসমূহের সারসংক্ষেপ সংযুক্ত করা হয়েছে। ফাসিকূন, আবরার, হানীফ এর মতো অনেক আরবি পরিভাষা অপরিবর্তিত রেখে বন্ধনীর মধ্যে সেগুলোর অর্থ ও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ পাদটীকাতে সহীহ বুখারী থেকে আয়াতের সাথে ব্যাখ্যামূলক হাদীসসমূহ সংযুক্ত করা হয়েছে। এ অনুবাদটিতে প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য রয়েছে, তবে অনেক বেশী ব্রাকেট ব্যবহারের কারণে ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ ও গতি হারিয়ে কিছুটা বেমানান হয়ে পড়েছে। তাছাড়া অনুবাদের মধ্যে ব্যাখ্যা সংযুক্ত করায় আরবি না বুঝে পাঠকগণ সে ব্যাখ্যাকে মূল আয়াতেরই অংশ মনে করতে পারেন। যেমন, সূরা নিসার ১৫৭ নং আয়াতে 'ঈসা ﷺ এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার দাবীকে ভ্রান্ত আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে,

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ

এ আয়াতের শাব্দিক তর্জমা হলো:

'They neither killed nor crucified him, but it was made to appear so to them.'

কিন্তু নোবেল কুরআনে এর তর্জমা করা হয়েছে এভাবে:

"But they killed him not, nor crucified, but the resemblance of Isa (Jesus) was put over another man."[১]

এ শতকে ওরিয়েন্টালিস্টরাও এ ক্ষেত্রে বেশ সক্রিয় ছিলেন এবং তারা আরও কিছু ইংরেজি অনুবাদ প্রস্তুত করেন। উদাহরণস্বরূপ, আর. বেল. এডিনবার্গ, ১৯৩৭-৩৯; এবং এ. জে. আরবেরী, লন্ডন ১৯৬৪। তবে মুসলিম স্কলারদের অনেক অনুবাদ প্রকাশ পাওয়ায় অমুসলিমদের এসব অনুবাদ মুসলিম জাতি পরিহার করেছে।

১ এম হিলালী ও এম খান, ইন্টারপ্রিটেশন অব দ্যা মীনিংস অব দ্যা নোবল কুরআন, পৃঃ ১৫৭।

অনুবাদের প্রকারভেদ

কুরআন শুধু কতগুলো শব্দ, ব্যাকরণিক বিন্যাস, বাগ্মিতা, ছন্দ ও অন্তমিলেরই সমষ্টি নয়; বরং তা এর চেয়ে অনেক ব্যাপক অর্থবহ একটি গ্রন্থ। এটি এমনই একটি মহান বাণী যা বিশ্বজাহানের স্রষ্টা মহান আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ। একই সাথে সাহিত্যের বিবেচনায় তা এমনই এক শাশ্বত মু'জিযা যে, এর সমমানের কোনো কিছু কেউ কোনোদিন তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। অতীত কিংবা বর্তমানের কোনো আরব কিংবা অনারব কেউই নিচের আয়াতসমূহে দেয়া সামান্য এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ

"আর আমি আমার বান্দার উপর যা নাযিল করেছি সে ব্যাপারে যদি তোমরা কোনো সন্দেহের মধ্যে থাকো, তাহলে তার মতো মাত্র একটি সূরা তৈরী করে আনো।"[১]

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ

"তারা কি বলে যে, তিনি (মুহাম্মাদ) নিজেই এটি রচনা করেছেন? বলো, তাহলে তোমরা এর মতো মাত্র একটি সূরা রচনা করে আনো।"[২]

সত্যিকার অর্থে কুরআনের কোনো অনুবাদ করা যায় না। এর অনেক কারণ রয়েছে। আরবি ভাষার ব্যাকরণগত বিন্যাস, বাকরীতি, অন্তমিল ও ছন্দ আরবি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কিছুতেই রক্ষা করা যায় না। তাছাড়া, অনুবাদে কুরআনের একক অনন্য বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায় এবং এর চ্যালেঞ্জ অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ কোনো অনুবাদকের সাহিত্যিক দক্ষতা ও নৈপুণ্য যতোই উঁচু মানের হোক না কেন– সে কখনও একক অনন্যতা দাবী করতে পারে না। তাছাড়া কুরআনকে আক্ষরিকভাবে অনুবাদও করা যায় না। কারণ, আলংকারিক অর্থের দিকটি বাদ দিলেও কেবল আক্ষরিক দিক থেকেও অধিকাংশ আরবি শব্দসমূহেরই একাধিক অর্থ রয়েছে। আর, আরবির অনেক

১ সূরা আল বাকারাহ (২): ২৩।
২ সূরা ইউনুস (১০):৩৮।

বাক্য বিন্যাসের মধ্যে অর্থের এমন সূক্ষ্মতা নিহিত থাকে যা অন্য ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তাই কোনো অনুবাদকেই আল্লাহর কালাম বলা যায় না, বা সেভাবে বিবেচনা করা হয় না। আল্লাহর কালাম হলো শুধু আরবি কুরআন; যেমন তিনি নিজেই বলেন:

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا

“নিশ্চয় আমি একে নাযিল করেছি আরবি ভাষার কুরআন হিসেবে।”[১]

ভাবানুবাদের মাধ্যমে কুরআনের সৌন্দর্য বজায় রাখার চেষ্টা করাও অনুমাননির্ভর, বিভ্রান্তিকর ও ব্যর্থ হতে বাধ্য। যে অতুলনীয় ঐকতান ও ধ্বনি মানুষের হৃদয়কে বিগলিত করে, তাকে অশ্রুসিক্ত করে এবং এক পবিত্র আধ্যাত্মিক অনুভূতির দিকে ধাবিত করে[২]–তা কেবল আরবি কুরআনেই রয়েছে। অনুবাদের মান যতোই ভাল হোক না কেন তাও কেবল পাঠকদেরকে বোকাই বানাবে। অনুবাদ পড়ে তারা হয়তো ভাবতে শুরু করবেন যে, তারা আল্লাহর কালাম পাঠের অভিজ্ঞতাই লাভ করছেন; অথচ বাস্তবে তারা কেবল অনুবাদকের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও তার সাহিত্যিক নৈপুণ্যেরই অভিজ্ঞতা লাভ করছেন।

এমনকি কুরআনের অর্থের যথাযথ অনুবাদ করতে সক্ষম হওয়ার দাবী করাও মিথ্যে। কারণ যেসব আরবি শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে এবং যেসব শব্দের কোনো অনারবি সমার্থবোধক শব্দ নেই, সেসব ক্ষেত্রে অনুবাদক সেই অর্থটিই বেছে নেন যা তার বিবেচনায় যথোপযুক্ত। তিনি শাব্দিক ও রূপক অর্থের মধ্যেও সেই অর্থটাই বাছাই করেন যা তার কাছে সঠিক মনে হয়। সকল অনুবাদই মূলত এক ধরনের তাফসীর–একটি হয়তো অন্যটি থেকে বিশুদ্ধতর। অধিকাংশ অনুবাদের ভূমিকায় সেসব ক্লাসিক্যাল তাফসীর ও অভিধানের নাম উল্লেখ করা হয় যেগুলোর উপর তারা নির্ভর করেছেন। এটি একটি অত্যন্ত সুন্দর বিষয় মনে হতে পারে; কিন্তু ভিন্নভাবে বললে হয়তো পার্থক্য আরো সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। মুফাস্সিরগণ ব্যাখ্যা করার ভঙ্গিতে

---

১ সূরা ইউসুফ (১২): ২।

২ পিকথল, দ্যা মীনিং অব দ্যা গ্লোরিয়াস কুরআন, পৃঃ ৭।

কথা বলেন; যেন তিনি বলছেন: "আমি এ আয়াত থেকে যা বুঝি তা হলো এই।" অনুবাদক এমনভাবে কথা বলেন যেন মনে হয়, তিনি আয়াতের অর্থ পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধাবন করেই তা অনুবাদ করেছেন; যেন তিনি বলছেনঃ "এই হলো আয়াতের অর্থ।" অথচ মূল আয়াত ও অনুবাদের মধ্যে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য; আর এটাই স্বাভাবিক। তাই অনুবাদকদের উচিত তাদের ভূমিকায় এ বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া যে, এ হলো কুরআনের ব্যাপারে তাদের ব্যক্তিগত অনুধাবন। অনুবাদকের জন্য সম্ভবত সর্বোত্তম পদ্ধতি হবে ক্লাসিক্যাল তাফসীরসমূহের মূল পাঠের সরল অনুবাদ করা এবং পাদটীকা ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যান্য সম্ভাব্য অর্থ বলে দেয়া এবং প্রয়োজন মনে হলে আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা। অনুগ্রহপূর্বক কেউ আমার কথার ভুল অর্থ করবেন না। আমি বলছি না যে, বিদ্যমান অনুবাদসমূহের কোনোই মূল্য নেই এবং যারা আরবি বুঝে না তাদের সেগুলো পড়া বন্ধ করে দেয়া উচিত। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এসব অনুবাদ কুরআনের মৌলিক বার্তা সেসব মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার কাজ করবে যারা আরবি ভাষায় কুরআনের মর্ম অনুধাবন করতে সক্ষম নন। আমি শুধু বলতে চাই যে, অনুবাদ পাঠের সময় প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত যে, সে যা পড়ছে তা স্বয়ং কুরআন বা কুরআনের সকল অর্থের অনুবাদ নয়, বরং তা হলো অন্য ভাষায় রূপান্তরিত একটি ব্যাখ্যা মাত্র। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত আরবি শিখতে সচেষ্ট হওয়া; যেন তারা আল্লাহর কালাম যেভাবে নাযিল হয়েছে সেভাবে পড়তে, শুনতে ও হৃদয়ঙ্গাম করতে পারে।

৪

কুরআন: অনন্য কিতাব

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ‘কুরআন’ শব্দটি ‘কিরাআহ’ শব্দের মতো একই অর্থ বহন করে। কারণ, উভয়টিই ‘কারাআ’ ক্রিয়াপদ থেকে এসেছে যার অর্থ হলো ‘পড়া’, ‘পাঠ করা’ বা ‘আবৃত্তি করা’। অর্থাৎ, আক্ষরিকভাবে কুরআন মানে পাঠ করা বা আবৃত্তি করা।[১] তবে ঐতিহাসিকভাবে ‘কুরআন’ শব্দটি সুনির্দিষ্টভাবে এমন এক গ্রন্থকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে যা সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। পুরো কিতাবের বেশ কয়েকটি স্থানে কুরআন পরিভাষাটি স্বয়ং কুরআনকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ:

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

“নিশ্চয় এ কুরআন প্রদর্শন করে সে (পথের) দিকে যা সর্বাধিক সরল-সঠিক...।” (আল ইসরা, ১৭:০৯)

‘কুরআন’ নামটি সামগ্রিকভাবে কুরআন এবং কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াত বা আয়াতসমষ্টিকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন নীচের আয়াতে রয়েছে:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“যখন কুরআন পড়া হয়, তোমরা তা মনোযোগ সহকারে শোনো এবং নীরব থাকো; আশা করা যায় তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।” (আল আ‘রাফ, ০৭: ২০৪)

মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে ‘কুরআন’ ছাড়াও অন্যান্য বেশ কিছু নামে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন:

---

১ এরাবিক-ইংলিশ লেক্সিকন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৫০২।

১. ফুরকান (পার্থক্য নির্ণয়কারী):

تَبٰرَكَ الَّذِىۡ نَزَّلَ الۡفُرۡقَانَ عَلٰى عَبۡدِهٖ لِيَكُوۡنَ لِلۡعٰلَمِيۡنَ نَذِيۡرَا ۙ﴿۱﴾

"মহান বরকতময় তিনি যিনি এ ফুরকান (সত্য মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়কারী) তার বান্দার ওপর নাযিল করেছেন, যাতে তিনি গোটা বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারেন।" (আল ফুরকান, ২৫: ০১)

২. যিক্‌র (স্মারক):

اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا الذِّكۡرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوۡنَ ﴿۹﴾

"নিশ্চয় আমিই এ যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমি নিজেই এর সংরক্ষক।" (আল হিজ্‌র, ১৫: ০৯)

কুরআনকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যে, কুরআন হলো আল্লাহর কালাম যা আরবিতে নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। ইসলামের বিভিন্ন ইবাদাতের ক্ষেত্রে এ কুরআন তিলাওয়াত করা হয় এবং তার সবচেয়ে ছোট্ট সূরাটিও অলৌকিক প্রকৃতির।

ওহীর আলোকে দেয়া নবী ﷺ এর বক্তব্যসমূহকে হাদীস নামে অভিহিত করা হয় যা তাঁর সাহাবাগণ সংরক্ষণ করেছেন। যেমন, নবী ﷺ এর সাহাবা উমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

"নিশ্চয় সকল কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।"[১]

নবী ﷺ কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার কথাকে নিজ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। যেমন আবু হুরায়রা رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন,

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ

১ সহীহ বুখারী, খণ্ড ১, পৃঃ ১, নং ১ ও সহীহ মুসলিম, খণ্ড ৩, পৃঃ ১০৫৬, নং ৪৬৯২।

"মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমাকে যেভাবে বিশ্বাস করে, আমি সেভাবেই তার বিশ্বাসের প্রতিদান দিয়ে থাকি। সে যখন আমাকে স্মরণ করে, আমি তখন তার সাথেই থাকি। যদি সে একাকী আমাকে স্মরণ করে তাহলে আমি তাকে একাকী স্মরণ করবো, আর যদি সে কোনো সমাবেশের মধ্যে আমাকে স্মরণ করে তাহলে আমি তাকে তার চেয়ে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করবো।"[১]

প্রথমে উল্লিখিত সাধারণ প্রকৃতির হাদীস থেকে এ ধরনের হাদীসকে আলাদা করার লক্ষ্যে একে 'হাদীসে কুদ্সী' নামে অভিহিত করা হয়। আর অন্যান্য হাদীসকে বলা হয় 'হাদীসে নববী' বা নবী ﷺ এর হাদীস।

তবে বেশ কিছু কারণে কুরআন কখনোই হাদীসে কুদ্সীর মতো নয়।

প্রথমতঃ কুরআনের শব্দ ও অর্থ উভয়টিই এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে; অন্যদিকে হাদীসে কুদ্সীর বক্তব্যটি এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিন্তু তার শব্দ এসেছে নবী ﷺ এর নিজের পক্ষ থেকে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তা'আলা গোটা মানবজাতিকে কুরআনের যেকোনো সূরার মতো একটি সূরা রচনা করার জন্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার অক্ষমতা কুরআনের যে ধরনের অলৌকিক প্রকৃতির প্রমাণ বহন করে, হাদীসে কুদ্সীর ব্যাপারটি মোটেই তেমন নয়।

তৃতীয়তঃ সালাতের সময় কুরআন তিলাওয়াত করা হয়।

চতুর্থতঃ এ গ্রন্থের শুধু তিলাওয়াতই একটি ইবাদাত হিসেবে বিবেচ্য। কেননা নবী ﷺ বলেছেন,

من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنة و الحسنة بعشر امثالها لا اقول الم حرف و لكن الف حرف و لام حرف و ميم حرف

"যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি অক্ষর পাঠ করে সে একটি নেকী লাভ করবে, আর সকল নেক আমলকে দশ গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। আমি বলছি না যে,

---

১ সহীহ বুখারী, খণ্ড ৯, পৃঃ ৩৬৯-৭০, নং ৫০২ ও সহীহ মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃঃ ১৪০৮, নং ৬৪৭১।

'আলিফ-লাম-মীম' একটি অক্ষর, বরং 'আলিফ' একটি অক্ষর, 'লাম' একটি অক্ষর ও 'মীম' একটি অক্ষর।"[১]

হাদীসে কুদ্সী পাঠের ক্ষেত্রে নেকীর এমন কোনো আশ্বাস নেই।[২]

মূল আলোচ্য বিষয়

কুরআন কেবল তার উৎস ও বিশুদ্ধতার দিক দিয়েই অনন্য নয়, বরং বিষয়বস্তু উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও সকল গ্রন্থের মধ্যে এটি অদ্বিতীয়। 'গ্রন্থ' শব্দের সাধারণ অর্থ অনুযায়ী এটি এমন কোনো গ্রন্থ নয়– যেখানে ভূমিকা, বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা ও সবশেষে উপসংহার টেনে কোনো বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থ নিছক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, দার্শনিক জটিলতা, বৈজ্ঞানিক তথ্য কিংবা সামাজিক আইন-কানুন উপস্থাপনার মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। যদিও বাহ্যিক কোনো কারণ ও প্রাসঙ্গিকতা ছাড়াই এসব বিষয়ের অনেক আলোচনাই এখানে পাওয়া যায়। পটভূমি বর্ণনা ছাড়াই সরাসরি বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে, ক্রমধারা অবলম্বন না করে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী আলোচনা করা হয়েছে। মানবীয় বিচারে বাহ্যিক কোনো কারণ ছাড়াই এক বিষয়ের আলোচনার মধ্যে অন্য বিষয়ে কথা বলা হয়েছে। এছাড়া প্রায়ই বাক্যের মধ্যে বক্তা ও শ্রোতার পরিবর্তন ঘটেছে।

কুরআনের এই ব্যতিক্রমধর্মী বর্ণনাভঙ্গীর ব্যাপারে অসচেতন পাঠক বিষয় বিন্যাসের ব্যাপারে প্রচলিত ধারণার কারণে প্রায়ই ধাঁধায় পড়ে যান। কারণ, কোনো বই, বিশেষত ধর্মীয় বই সম্পর্কে তার যে ধারণা– কুরআনের বিষয় বিন্যাস প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ তার বিপরীত। এ কারণে কুরআনকে তার কাছে অগোছালো ও এলোমেলো মনে হতে পারে। তবে যারা এর বিষয়বস্তু, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মূল আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত, তাদের কাছে কুরআনকে কখনোই অগোছালো বা এলোমেলো মনে হবে না।

---

১ সুনান আত তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাস'উদ (রা.) এর বর্ণনায়।৩ নং পাদটীকা দেখুন।

২ দেখুন প্রিন্সিপলস অব ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স, পৃঃ ১৫, ও কাওয়া'ইদুত তাহদীস মিন ফুনুনি মুস্তালাহিল হাদীস, পৃঃ ৫৬।

কুরআনের বিষয়বস্তু মূলত মানুষ, মানুষের সাথে তার প্রভু প্রতিপালক আল্লাহর সম্পর্ক, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং গোটা সৃষ্টিকুলের সাথে মানুষের সম্পর্ক ইত্যাদি। ওহীর প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষকে তার প্রভু প্রতিপালকের সাথে, তার নিজের সাথে এবং সৃষ্টিকুলের সাথে তার আচরণবিধি সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা। সেহেতু, কুরআনের সামগ্রিক আলোচনা যে মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় তা হলো– আল্লাহর একত্ববাদ, তথা একমাত্র মহান আল্লাহই যে সকল 'ইবাদত-আনুগত্য লাভের যোগ্য তা বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে দেয়া। অতএব, মানুষের উচিত তার ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সমগ্র সৃষ্টিকুলের সাথে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আল্লাহর আইনের কাছে নিজেকে সঁপে দেয়া। অন্য কথায় বলা যায়, কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয় হলো আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন ও আল্লাহর বিধান অনুযায়ী নেক কাজ সম্পাদনের জন্য মানুষকে আহ্বান করা।

এসব মৌলিক তথ্য মনে রাখলে পাঠক দেখতে পাবেন যে, কুরআনের প্রতিটি বিষয়ই তার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত এবং পুরো গ্রন্থটি তার মূল আলোচ্য বিষয়ের উপর বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রাসঙ্গিক যুক্তিতে ভরপুর। কুরআন সবসময় এই একই লক্ষ্য সামনে রাখে–চাই তা মানুষ ও বিশ্বজগৎ সৃষ্টির বর্ণনা প্রসঙ্গ হোক কিংবা হোক তা ইতিহাসের অন্য কোনো ঘটনা। কুরআনের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সঠিক পথের নির্দেশনা দেয়া। তাই অন্যান্য বিষয় নিয়ে কুরআন ঠিক ততটুকু আলোচনা করে যা মূল লক্ষ্যের সাথে প্রাসঙ্গিক। অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক খুঁটিনাটি তথ্য সবসময়ই সে এড়িয়ে চলে। প্রতিটি নতুন বিষয় উপস্থাপনার সময় এটি বারবার তার মূল আলোচ্য বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করে।

কুরআনের সবচেয়ে ভালো ওরিয়েন্টালিস্ট অনুবাদসমূহের একটির ভূমিকায় অনুবাদক আর্থার জন আরবেরী লিখেছেন, "সমগ্র কুরআন জুড়ে একটি সুপরিচিত বিষয় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন আঙ্গিকে আলোচিত হয়েছে; প্রত্যেক সূরাতে[১] সেসব আলোচ্য বিষয়ের এক বা একাধিক ইস্যু সংক্ষেপে[২] কিংবা

---

১ কুরআনের অধ্যায়।
২ অর্থাৎ অস্পষ্টভাবে কিংবা রূপরেখাতে।

বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। ছন্দময় ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যেকটি সূরাকে সাবলীল সুর ঝংকারে প্রকাশ করা হয়েছে– যেখানে রয়েছে সামগ্রিক কিংবা আংশিক লাইট-মোটিফ[১]; এবং বক্তব্যের ছন্দময় প্রবাহে সূক্ষ্ম তারতম্যের মাধ্যমে একই বিষয় বারবার আলোচিত হয়েছে।"[২]

কুরআনের নতুন পাঠক যদি অমূলক সংশয় ও অস্পষ্টতা এড়িয়ে চলতে চান তাহলে তাকে নীচের চারটি মূলনীতি মনে রাখতে হবে:

১. এ ধরনের গ্রন্থ পৃথিবীতে মাত্র একটিই আছে;

২. এর সাহিত্যশৈলী অন্য সকল গ্রন্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন;

৩. এর প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন; এবং

৪. গ্রন্থ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার উপর ভিত্তি করে কুরআন বুঝতে চেষ্টা করলে তা কেবল তার জন্য প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করবে।

কুরআনের মু'জিযা

মানুষ মানুষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে প্রকৃতিগতভাবেই অপছন্দ করে, যতক্ষণ না সে বিপরীত পক্ষের দৈহিক শক্তি কিংবা আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তা করতে বাধ্য হয়। অথবা যদি তাকে এমন কোনো অলৌকিক কৃতিত্বপূর্ণ কিছু দেখানো হয় যা মানুষের সামর্থ্যের অনেক বাইরে। প্রথম দু'টি ক্ষেত্রে সে অনিচ্ছা সহকারে আত্মসমর্পণ করে, কিন্তু তৃতীয়টির ক্ষেত্রে তার আত্মসমর্পণের কারণ হলো মানবীয় ক্ষমতার তুলনায় একটি উচ্চতর অতিপ্রাকৃতিক শক্তি বা ক্ষমতার উপর তার বিশ্বাস। এ কারণে আল্লাহ তাঁর রাসূলদেরকে কেবল ওহীর নেয়ামত দান করেই ক্ষান্ত হননি, বরং তাদেরকে এমন কিছু মু'জিযাও দান করেছেন যা সুস্পষ্টভাবে মানুষের সামনে তাদের আনীত বাণীর ঐশ্বরিক সত্যতার প্রমাণ দেয়। নবীদের এসব মু'জিযা নকল করতে অক্ষম হয়ে লোকেরা স্বেচ্ছায় আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দিয়েছে এবং নবীদের আনুগত্য মেনে নিয়েছে।

---

১ পুনরাবৃত্তির ঘটনা।

২ দ্যা কুরআন ইন্টারপ্রিটেড, পৃঃ ২৮।

মুহাম্মাদ ﷺ এর পূর্বের প্রত্যেক নবীকেই প্রেরণ করা হয়েছিলো তাঁর নিজ নিজ জাতির কাছে। তাই তাঁদেরকে যেসব মু'জিযা দেয়া হয়েছিলো তা ছিল জ্ঞানের সেসব শাখার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী, যেগুলোতে তাঁদের জাতির লোকেরা চরম উৎকর্ষ সাধন করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল তাদের উপর মু'জিযার সর্বোচ্চ প্রভাব বিস্তার করা। উদাহরণস্বরূপ: নবী মূসা ﷺ মিশরীয়দের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। তারা ঐন্দ্রজালিক শিল্প, যাদু-মন্ত্র ইত্যাদি বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য পৃথিবীজুড়ে খ্যাতি লাভ করেছিল। এ কারণে আল্লাহ তাঁকে এমন এক মু'জিযা দান করেছিলেন যে, তিনি তাঁর হাত নিজের আলখাল্লার মধ্যে ঢুকিয়ে বের করে আনলে সে হাত অত্যন্ত উজ্জ্বল আলোর বিকিরণ ঘটাতো। যখন মায়াতন্ত্রবিদ ও যাদুকররা নবী মূসা ﷺ-কে চ্যালেঞ্জ করার জন্য জড়ো হলো এবং তাদের নিক্ষিপ্ত লাঠিগুলো যখন দর্শকদের সামনে সাপ হিসেবে আবির্ভূত হলো, তখন আল্লাহ মূসার লাঠিটিকে এমন এক বিশাল ও বাস্তব সাপে পরিণত করে দিলেন যা তাঁর বিরোধী পক্ষের সাপগুলোকে গিলে ফেলল। এ পরাজয় যাদুকরদের জন্য মূসার নবুওতের সত্যতার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট ছিলো; কারণ তারা জানতো যে, কেউ লাঠির প্রকৃতি পরিবর্তন করতে পারে না, যেমনটা মূসা পেরেছেন। তাদেরকে হত্যার ব্যাপারে তাদের প্রভু ফেরাউনের হুমকি থাকা সত্ত্বেও তারা মূসার রবের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস ও আনুগত্যের সাথে সাজদায় পড়ে গিয়েছিলেন।

আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো নবী 'ঈসা ﷺ এর। তাঁকে মহান আল্লাহ ইহূদীদের মধ্য থেকে নবুওতের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শিতার জন্য ইহূদীদের ছিল বিশেষ খ্যাতি। হাড় জোড়া লাগানো, ক্ষত উপশম ও অসুস্থদের নিরাময় সাধনে দৃশ্যত যাদুকরী ক্ষমতার জন্য ইহূদী ডাক্তাররা ছিলেন উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের পাত্র। এই সময়ে জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি, খোঁড়াকে হাঁটার শক্তি ও মৃতকে জীবনীশক্তি প্রদানের অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে আল্লাহ নবী ঈসা ﷺ-কে অনুগ্রহ করেছিলেন। এসব ক্ষমতা ছিল তৎকালীন ইহূদী ডাক্তারদের ক্ষমতার বাইরে এবং তারা ভালো করেই জানতো যে, কোনো সাধারণ মানুষ কখনোই এগুলো করতে পারে না। নবী 'ঈসা ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলা চোখ-ধাঁধানো আরো একটি মু'জিযা দিয়েছিলেন।

তিনি কাদামাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরী করে তাতে ফুঁ দিতেন, আর সেগুলো উড়ে চলে যেতো।

যেহেতু নবী মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন সর্বশেষ নবী; তিনি জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন; তাই তাঁকে এমন এক মু'জিযা দান করা হয়েছে যা কেবল তাঁর সমসাময়িক জনগোষ্ঠীকেই অভিভূত করেনি, বরং তা পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত গোটা মানবজাতিকে অভিভূত করবে এবং তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিবে। তাঁর পূর্বের অন্যান্য নবীদের মতো নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কেও কুরআন ছাড়া আরও এমন কিছু মু'জিযা দেয়া হয়েছিল যা শুধু তাঁর সময়ের লোকেরাই প্রত্যক্ষ করেছে। চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাওয়া, নিজের হাত থেকে পানির প্রবাহ সৃষ্টি, কঙ্কর ও শিলা কর্তৃক তাঁকে সালাম প্রদান ইত্যাদি তাঁর এমনই মু'জিযার কয়েকটি মাত্র।[১] বিভিন্ন যুগে নবীদেরকে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ মু'জিযা দানের যে নিয়ম অব্যাহত রেখেছেন সেই ধারাবাহিকতায় নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে যে মু'জিযা তিনি দান করেছেন তা হলো সাহিত্যশৈলীর এক মহান মু'জিযা।

কোনো বিশেষ শিল্প-নৈপুণ্য কিংবা কোনো জ্ঞান-গবেষণায় আরবদের তেমন কোনো দখল ছিল না; তবে তাদের বাগ্মিতা ও সাহিত্য-নৈপুণ্য নিয়ে তারা বেশ গর্ব করতো। উকাযের মতো বিভিন্ন মেলায় বার্ষিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে তারা কবিতা ও বক্তৃতার অসংখ্য লাইন স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করতো। ভাষাশৈলীর ক্ষেত্রে তারা এমনই উন্নতির শিখরে পৌঁছে গিয়েছিল যে, সামাজিকভাবে বাগ্মিতাকে মনে করা হতো একজন মানুষের অর্জনযোগ্য সর্বোচ্চ গুণ। দশটি বিখ্যাত কবিতাকে এতোটা সম্মান করা হতো যে, সেগুলোকে স্বর্ণাক্ষরে লিখে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য কা'বার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো।[২] তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ নবীর নিকট এমন একখানা কিতাব অবতীর্ণ করলেন যার কিছু সূরা 'আলিফ-লাম-মীম' অথবা 'ক্বাফ' কিংবা 'নূন' এর মতো আদ্যক্ষর দিয়ে অবোধগম্য ভঙ্গিতে শুরু হয়েছে। আরবদের ভাষাগত পাণ্ডিত্যকে এই মর্মে উপহাস করা হয়েছে

১ দেখুন সহীহ বুখারী, খণ্ড ৫, পৃঃ ৩৩৬, নং ৪৭৩; খণ্ড ৬, পৃঃ ৩৬৫, নং ৩৮৭; ও সহীহ মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃঃ ১২৩০, নং ৫৬৫৪।

২ দেখুন দ্যা কনসাইজ এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, পৃঃ ২৭৭-৮।

যে, এ গ্রন্থ তোমাদের সাহিত্য-নৈপুণ্যের নাগালের ঊর্ধ্বে। কুরআন যেন বলছে, তোমাদের দৈনন্দিন আলাপচারিতা ও গদ্য-পদ্যের মহাকীর্তি সৃষ্টিতে তোমরা যেসব অক্ষর ব্যবহার করো সেসব অক্ষর দিয়েই এ কিতাব রচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থের সবচেয়ে ছোট সূরাটি মাত্র ছোট্ট তিনটি আয়াতের সমষ্টি; তারপরও তোমরা যতোই চেষ্টা করো এর সমমানের কিছুই রচনা করতে পারবে না। অতএব, সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর একমাত্র স্থায়ী ও চিরন্তন মু'জিযা হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন। এ প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন,

ما من الانبياء نبي الا اعطى ما مثله امن عليه البشر و انما كان الذى اوتيت وحيا اوحاه الله الى فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامة

"সকল নবীকেই এমন কিছু দেয়া হয়েছে যার কারণে লোকেরা তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আমাকে যা দেয়া হয়েছে তা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত ওহী (কুরআন); তাই আমি আশা করি, কেয়ামতের দিন তাদের মধ্যে বেশী অনুসারী হবে আমার।"[১]

চ্যালেঞ্জ

কেবল বিষয়বস্তু উপস্থাপনার ক্ষেত্রেই কুরআন অনন্য নয়, বরং মু'জিযা হিসেবেও এ কুরআন অনুপম ও অনন্য। 'মু'জিযা' শব্দ দ্বারা আমরা এমন কোনো অতিপ্রাকৃতিক কিংবা অসাধারণ ঘটনাকে বুঝি যা মানুষ নকল করতে পারে না। নবী মুহাম্মাদ ﷺ আরবদেরকে কুরআনের সমমানের একটি সাহিত্যকর্ম রচনার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাগ্মিতা ও সাহিত্য-নৈপুণ্যে তাদের ব্যাপক উন্নতি সত্ত্বেও সে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তারা অক্ষম হয়। আরব অনারব নির্বিশেষে গোটা মানবজাতির কাছে কুরআনের মতো কোনো সাহিত্যকর্ম রচনার চ্যালেঞ্জ তিনটি ধাপে উপস্থাপন করা হয়েছে:

---

১ সহীহ বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৪৭৪, নং ৫০৪ ও সহীহ মুসলিম, খণ্ড ১, পৃঃ ৯০-১, নং ২৮৩।

১. সমগ্র কুরআন

আল্লাহ কুরআনে নবী ﷺ-কে গোটা সৃষ্টিকুলের প্রতি কুরআনের মতো একটি গ্রন্থ রচনার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন:

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

“বলে দাও, যদি মানুষ ও জিন সবাই মিলেও এই কুরআনের মতো কিছু রচনার চেষ্টা করে তাহলে তারা তা পারবে না, তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়ে গেলেও।”[১]

২. দশটি সূরা

যারা কুরআনের ঐশী উৎসকে অস্বীকার করে, আল্লাহ তাদেরকে এরপর মাত্র দশটি সূরার সমমানের কিছু রচনা করার আহ্বান জানিয়ে চ্যালেঞ্জটিকে আরও সহজ করে দিয়েছেন:

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾

“এরা কি বলছে যে নবী নিজেই এ কিতাবটি রচনা করেছে? বলো, ঠিক আছে, তাই যদি হয়, তাহলে এর মতো দশটি সূরা তোমরাও রচনা করে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের যেসব মা‘বুদকে ডাকতে পারো ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।”[২]

৩. মাত্র একটি সূরা

চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জটি ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে আরও সহজতর করে যে, কুরআনের যে কোনো সূরার মতো মাত্র একটি সূরা রচনার আহ্বানের মাধ্যমে। অথচ কুরআনের সবচেয়ে ছোট সূরা আল কাউসার মাত্র তিনটি আয়াত সম্বলিত। তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

---

১ সূরা আল ইসরা (১৭): ৮৮।

২ সূরা হুদ (১১): ১৩।

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

"আর আমি আমার বান্দার ওপর যা নাযিল করেছি সে ব্যাপারে যদি তোমরা কোনো সন্দেহের মধ্যে থাকো, তাহলে তার মতো মাত্র একটি সূরা রচনা করে আনো এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সমর্থকদেরকে ডেকে আনো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"[১]

এসব চ্যালেঞ্জ নিছক কোনো ফাঁকা বুলি ছিল না যে, তা মোকাবেলায় কেউ কোনো চেষ্টা করেনি। আল্লাহর একত্ববাদ, সকল শির্কী প্রথার বিলোপ এবং এক আল্লাহর বান্দা হিসেবে সকল মানুষের মধ্যে সমতার প্রতি মুহাম্মাদ ﷺ এর দাওয়াত মক্কাবাসীদের আর্থ-সামাজিক কাঠামো এবং বিশেষত নবী ﷺ এর নিজ গোত্র ক্ষমতাসীন কুরাইশদের অবস্থানকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছিল। তাই আরবের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্মীয় কেন্দ্র মক্কার কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী ইসলামের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তাদের এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কুরআনের সবচেয়ে ছোট্ট সূরাটির মতো মাত্র একটি সূরা রচনা করে আনাটাই যথেষ্ট ছিলো; কিন্তু তা করতে তারা সক্ষম হয়নি। বেশ কয়েকজন বাগ্মী ও কবি কুরআনকে নকল করার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

তারপর তারা মুহাম্মাদ ﷺ-কে ইসলামের দাওয়াত পরিত্যাগের বিনিময়ে বিপুল পরিমাণ সম্পদ, শাসন কর্তৃত্ব ও তাদের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ও সুন্দরী নারী উপহার দেয়ার প্রস্তাব দেয়। সূরা ফুস্‌সিলাত এর প্রথম তেরটি আয়াত তিলাওয়াতের মাধ্যমে তিনি তাদের জবাব দেন।[২] কুরাইশরা তাদের গোলাম ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা ইতোমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদেরকে নিষ্ঠুর নির্যাতন করে মুশরিকী চিন্তাধারায় ফিরিয়ে নেয়ার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছিল। পরবর্তীতে তারা নবী ﷺ, তাঁর সাহাবীগণ ও তাঁর গোত্র বনু হাশিমের বিরুদ্ধে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে তাদেরকে

---

১ সূরা আল বাকারাহ (২): ২৩।

২ ইমাম হাকিম, বাইহাকী, আবু ইয়া'লা ও ইবনু হিশাম কর্তৃক সংগৃহীত ও ইবরাহীম আলী কর্তৃক সহীহুস সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ (পৃঃ ৬৪) গ্রন্থে হাসান আখ্যায়িত।

চরম অমানুষিক কষ্ট দেয়। কিন্তু সব ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হয়। পরিশেষে তারা কুরাইশের সকল গোত্রের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত এক সশস্ত্র আততায়ী দল পাঠিয়ে তাঁকে তাঁর নিজ বাড়ীতে হত্যার চক্রান্ত করে; যাতে তাঁকে হত্যার দায়ভার সকল গোত্রের উপর বর্তায় এবং নবী ﷺ এর গোত্রের পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

তবে আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ ও তাঁর অনুসারীদেরকে মক্কা থেকে হিজরত করে 'ইয়াসরিব' নগরীর নতুন ইসলাম গ্রহণকারীদের সাথে যোগ দেওয়ার সামর্থ্য দান করলেন। ইয়াসরিবের বিভিন্ন গোত্রে ইসলাম খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এবং মাত্র এক বছরের মধ্যে মুসলিমরা শহরের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টিতে পরিণত হলো। নবী মুহাম্মাদ ﷺ শাসক নিযুক্ত হলেন এবং শহরের নাম 'ইয়াসরিব' পরিবর্তন করে রাখা হলো 'মদীনা'। পরবর্তী আট বছরে মক্কা ও আশেপাশের এলাকার গোত্রসমূহ মদীনার উদীয়মান মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একের পর এক ব্যর্থ যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করে, যার পরিসমাপ্তি ঘটে মুসলিমদের স্বয়ং মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়ে।

কুরাইশ ও তাদের মিত্ররা কুরআনের সবচেয়ে ছোট্ট সূরাটির মতো মাত্র তিনটি ছত্র কাব্য রচনা করে দিতে সক্ষম হলেই এই রক্তপাত এড়ানো সম্ভব ছিল। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, তা কারও পক্ষেই সম্ভব হয়নি। অতএব, কুরআনের সাহিত্যশৈলীর এই স্বকীয়তা, এর অন্তমিল ও গতিশীল ছন্দের অলৌকিকতা নিয়ে কোনো সংশয় থাকতে পারে না।

স্বকীয়তার ব্যাপারটি যে শুধু কুরআনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়। কারণ শেকস্‌পিয়ার, চসার, কিংবা যে কোনো ভাষার বিখ্যাত কবিদেরও একটি স্বতন্ত্র রচনাশৈলী রয়েছে, যা তাদেরকে অন্যান্য লেখকদের থেকে একটি আলাদা মর্যাদা দিয়েছে। তবুও বর্তমান সময়ের কোনো পারদর্শী কবি যদি শেকস্‌পিয়ারের রচনাবলী গভীরভাবে অধ্যয়ন করে তার রচনাশৈলী নকল করে পুরাতন কাগজে পুরাতন কালি দিয়ে একটি 'সনেট' লিখে দাবী করে যে, সে শেকস্‌পিয়ারের হারিয়ে যাওয়া একটি কবিতার সন্ধান পেয়েছে, তাহলে সতর্ক যাচাই-বাছাই সত্ত্বেও সাহিত্য জগৎ হয়তো এ দাবীকে গ্রহণ করে নিবে। অতএব, যতই অনুপম রচনাশৈলীর অধিকারী হোক না কেন,

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদেরও নকল হতে পারে; যেভাবে নকল করা হয়েছে বিখ্যাত অনেক চিত্রকরদেরকে।[১] তবে, কুরআন এসবের অনেক উর্ধ্বে, কারণ যুগে যুগে এর বিভিন্ন সূরা জাল করার অপচেষ্টা করা হয়েছে; কিন্তু এগুলোর একটিও শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকেনি। আগেও বলেছি যে, অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় ওহী নাযিলের সময়েই কুরআনকে নকল করার অপচেষ্টা সবচেয়ে বেশী করা হয়েছে। সাহিত্য-নৈপুণ্যে তখনকার আরবরা উন্নতির চূড়ান্ত শিখরে থাকা সত্ত্বেও তাদের কোনো অপচেষ্টাই সফলতার মুখ দেখেনি।

কুরআনের অলৌকিক প্রকৃতির অন্যান্য দিক

কোনো গ্রন্থকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হিসেবে বিবেচিত হতে হলে তাকে অবশ্যই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের বাস্তবতা বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ সম্পূর্ণ নির্ভুল হতে হবে। পূর্বের অনেক নবী ও তাদের জাতি-গোষ্ঠীর ইতিহাস নিয়ে কুরআনে অনেক বর্ণনা রয়েছে। এসব বর্ণনার বেশ কয়েকটিতে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যেগুলো যাচাই করে দেখলে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, কুরআন অনাদি অনন্ত মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকেই নাযিলকৃত গ্রন্থ।

ঐতিহাসিক ঘটনা বিশ্লেষণে কুরআনের বিশুদ্ধতার একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে নবী ইউসুফ ﷺ এর ঘটনার মধ্যে। ইউসুফ ﷺ-কে শৈশবে দাস হিসেবে মিশরে বিক্রি করে দেয়া হলেও তিনি পরবর্তীতে মিশর সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন। এরপর তিনি তাঁর পুরো পরিবারকে সেখানে নিয়ে এসে সম্মানের সাথে বসবাস করতে সক্ষম হন। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ একমত যে, বনী ইসরাঈলরা যখন মিশরে প্রবেশ করেছিল তখন দেশটির উত্তরার্ধ শাসন করতো সেমিটিয় আক্রমণকারী হিক্সসরা (The Hyksos), যারা ছিল প্রাচীন রাজত্বের উত্থানের পর মিশরের ইতিহাসে প্রথম অ-মিশরীয় শাসকগোষ্ঠী। মূসা ﷺ এর বিরুদ্ধাচারী মিশরীয় শাসককে কুরআন সবসময়ই

১ কতিপয় ইংরেজ পণ্ডিত সত্যিই মনে করেন যে, শেকস্‌পিয়ারের নামে যেসব সাহিত্যকর্ম রয়েছে তার একটি বিশাল অংশ লিখেছেন তার সমসাময়িক অন্য এক ব্যক্তি যার নাম ক্রিস্টোফার মারলো।

'ফেরাউন' উপাধি সহকারে উল্লেখ করে। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে চতুর্থ আমেনহোটেপের রাজত্বকাল থেকে শুরু করে মিশরের প্রত্যেক শাসককে এ উপাধিতে ডাকা হতো; এর আগে কাউকে এ উপাধি দেয়া হয়নি। ইউসুফ ﷺ ছিলেন চতুর্থ আমেনহোটেপের কমপক্ষে দু'শ বছর পূর্বে। তাই কুরআন সবসময়ই ইউসুফের সমসাময়িক শাসককে 'আল মালিক' বা রাজা হিসেবে উল্লেখ করেছে। যেমন:

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ

"রাজা বললো, তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো।"[১]

উল্লেখ্য যে, বাইবেলে ইউসুফ ﷺ এর সমসাময়িক শাসককেও 'ফেরাউন' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা ঐতিহাসিক ঘটনার সময়-কাল নির্দেশের ক্ষেত্রে সেসব লেখকের মারাত্মক ভুল, যারা মূসা ﷺ এর বহু শতাব্দী পরে 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' লিপিবদ্ধ করেছেন।[২]

কুরআনের শাশ্বত সত্যতা ও বিশুদ্ধতাকে আক্রমণ করার হীন উদ্দেশ্যে কতিপয় সমালোচক কিছু খুঁটিনাটি বিষয়কে বেছে নিয়েছে। এর একটি বিখ্যাত উদাহরণ হলো মারইয়াম ﷺ এর ঘটনা। একটি নির্জন স্থানে শিশু ঈসাকে জন্ম দেয়ার পর তাঁকে নিয়ে তিনি যখন তার নিজ জাতির লোকদের সামনে হাজির হয়েছিলেন তখন তারা বলেছিল:

يَٰٓأُخْتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾

"হে হারুনের বোন! তোমার বাপ তো কোনো খারাপ লোক ছিল না, না তোমার মা ছিল কোনো ব্যভিচারিনী।" [৩]

সমালোচকদের যুক্তি হলো, কুরআনে এখানে ইতিহাসের দু'জন ব্যক্তিকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। একজন হলেন 'ঈসা ﷺ এর মা মারইয়াম এবং অন্যজন হলেন হারুন ﷺ এর বোন মিরিয়াম। তাদের এ বিভ্রান্তি মূলত

১ সূরা ইউসুফ (১২): ৫০।
২ মোজেজ এন্ড ফারাওহঃ দ্যা হিব্রুজ ইন ইজিপ্ট, পৃঃ ১৭৬।
৩ সূরা মারইয়াম, (১৯): ২৮।

আরবদের ভাষারীতি সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতারই কুফল। কুরআনে নবী হূদ ﷺ-কে 'আদের ভাই' হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে:

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ ۖ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ

"আদের ভাই (হূদ)- এর কাহিনি স্মরণ করো, যখন সে আহ্‌কাফে তাঁর কওমকে সতর্ক করেছিলো।"[১]

আরবরা বিভিন্ন গোত্রকে তাদের সেসব নেতৃস্থানীয় পূর্বপুরুষের নামের সাথে মিলিয়ে নামকরণ করে থাকে যার থেকে তাদের বংশধারার গোড়াপত্তন হয়েছে। 'আদ' গোত্রটি 'আদ' নামক এক ব্যক্তির বংশ থেকে বিস্তার লাভ করেছে। হূদ ﷺ আক্ষরিক অর্থে 'আদ' কিংবা তাঁর গোত্রের প্রত্যেক ব্যক্তির ভাই ছিলেন না। এটি হলো আরবদের একটি ভাষারীতি যা তারা কোনো জনগোষ্ঠীর সাথে কোনো ব্যক্তির সম্পর্ক বুঝাতে ব্যবহার করে। মারইয়াম ছিলেন হারুন ﷺ এর বংশধর। এ কারণে এখানে তাঁকে হারুনের বোন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। একই ধরনের রীতি অনুসরণ করে নিউ টেস্টামেন্টে ইয়াহ্‌ইয়া ﷺ এর মা এলিজাবেথকে হারুন ﷺ এর বোন হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।[২]

ভবিষ্যদ্বাণী

আল কুরআন নিম্নোক্ত আয়াতে নির্ভুলভাবে পারসিকদের উপর রোমানদের (বাইজান্টাইন) সামরিক বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলো:

غُلِبَتِ الرُّومُ ۙ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۚ

"রোমানরা নিকটবর্তী অঞ্চলে পরাজিত হয়েছে এবং এ পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যেই তারা আবার বিজয় লাভ করবে।"[৩]

---

১ সূরা আল আহ্‌কাফ (৪৬): ২১।
২ লূক ১:৫।
৩ সূরা আর রুম (৩০): ২-৪।

আরবি 'বিদউন' শব্দটি ইংরেজি 'few' ও বাংলা 'অল্প/কয়েক' শব্দের তুলনায় অধিকতর সুনির্দিষ্ট। তিন থেকে দশের মধ্যে কোনো সংখ্যাকে বুঝাতেই কেবল বিদউন শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীকে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে পরিণত করে ৬১৬ 'ঈসায়ী সনে পারসিকরা রোমানদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে তাদের কাছ থেকে বৃহত্তর সিরিয়া ও মিশর ছিনিয়ে নেয় এবং তাদেরকে রাজধানী কন্সট্যান্টিনোপলে অবরোধ করে। এরপর ৬২২ 'ঈসায়ী সনে ইসুসের যুদ্ধে রোমানরা পারসিকদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করে তারা তাদের হৃত ভূখণ্ডসমূহ পুনর্দখল করতে সক্ষম হয়।[১]

কুরআন এ ব্যাপারেও নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, মুসলিমরা 'উমরা হাজ্জ করতে শান্তিপূর্ণভাবে মক্কায় প্রবেশ করতে সক্ষম হবে।[২] মুসলিম জাতি ও মক্কার মূর্তিপূজারী শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে সুদীর্ঘ তিক্ত যুদ্ধাবস্থার মধ্যেও এ ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হয়েছে। কুরআনে নেককার ঈমানদারদেরকে আরো প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে, যদি তারা এক আল্লাহর ইবাদাত করে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করে তাহলে আল্লাহ তাদেরকে গোটা পৃথিবী শাসনের ক্ষমতা প্রদান করবেন, তাদের দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তারা যে ভীতির মধ্যে জীবন যাপন করছে তাকে তিনি নিরাপত্তা দ্বারা বদলে দিবেন।[৩] এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে কার্যকর হয়েছিল।

প্রকৃতির বিস্ময়কর ঘটনাবলীর বর্ণনা

কুরআন প্রাকৃতিক জগতের এমন অসংখ্য বিস্ময়কর ঘটনাবলীর দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে যা আল্লাহর শক্তিমত্তা, প্রজ্ঞা ও দয়া ইত্যাদির নির্দেশক। প্রাকৃতিক জগতের বিভিন্ন বিষয় অনুধাবনের ক্ষেত্রে মানুষ প্রভূত উন্নতি সাধন করায় কুরআনের এসব বর্ণনার অলৌকিক প্রকৃতি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার জায়গা এটি নয়, তবে বিষয়টি উপলব্ধির জন্য সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো:

---

১ দেখুন দ্যা হলি কুরআনঃ ইংলিশ ট্রান্সলেশন অব দ্যা মীনিংস এন্ড কমেন্টারী, পৃঃ ১২০২-৩।

২ সূরা আল ফাত্হ (৪৮): ২৭।

৩ সূরা আন নূর (২৪): ৫৫।

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ﴿٤٧﴾

"আসমানকে আমি হাত দিয়ে বানিয়েছি এবং তাকে আমি সম্প্রসারিত করে চলছি।"[১]

আরবি 'মূসি'উন' শব্দটি সক্রিয় বিশেষণ। এটি একটি চলমান ক্রিয়া নির্দেশক যা বর্তমান সময়ে সংঘটিত হয়ে চলছে এবং ভবিষ্যতেও হতে থাকবে। স্পেকট্রোগ্রাফ ও ১০০ ইঞ্চি ব্যাসের অতিকায় রিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপ আবিষ্কারের পর এডওয়ার্ড হাবল ১৯২৬ সালে বেশ কয়েকটি ছায়াপথ আবিষ্কার করেন। ১৯২৭ সালে তিনি ছায়াপথগুলো থেকে বিকিরিত বর্ণালীতে রেড শিফ্ট (red shift) অর্থাৎ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করেন। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ছায়াপথগুলো ক্রমশ একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে, 'এ আবিষ্কারের তাৎপর্য অনেক গভীর। দীর্ঘদিন যাবৎ যে মহাবিশ্বকে স্থির মনে করা হয়েছিল তা মূলত সম্প্রসারণশীল'।[২]

সূরা আন নূরে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ

"তুমি কি দেখ না, আল্লাহ মেঘমালাকে ধীর গতিতে সঞ্চালন করেন, তারপর সে খণ্ডগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করেন, তারপর তাকে পুঞ্জীভূত করে একটি ঘন মেঘে পরিণত করেন, তারপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে বৃষ্টিবিন্দু একাধারে ঝরে পড়ছে। আর তিনি আকাশে স্থিত মেঘমালার পাহাড় থেকে শিলা বর্ষণ করেন, তারপর যাকে চান এর দ্বারা আঘাত করেন এবং যার থেকে চান তা দূরে রাখেন।"[৩]

১৯৯৭ সালের ৩০ মে শুক্রবার গালফ নিউজে এ সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, পৃথিবী প্রতিদিন 'মহাজাগতিক বৃষ্টি'তে স্নাত হয়। আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের

১ সূরা আয যারিয়াত (৫১): ৪৭।
২ দ্যা নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, খণ্ড ৬, পৃঃ ১১৪।
৩ সূরা আন নূর (২৪): ৪৩।

লুই এ. ফ্রাঙ্ক জানিয়েছেন, প্রতিদিন দু'রুম বিশিষ্ট একটি বাসার সমান আয়তনের ২০ থেকে ৪০ টন ওজনের হাজার হাজার তুষারখণ্ড অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। কোনোরূপ ক্ষয়ক্ষতি না ঘটিয়ে এরা ৬০০ থেকে ১৫০০ মাইল উপরে নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং জলীয় বাষ্পসমৃদ্ধ বিপুল মেঘমালার জন্ম দেয়। এটি পরিশেষে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে বৃষ্টির আকারে ঝরে পড়ে। লুই এ. ফ্রাঙ্ক এর নেতৃত্বাধীন গবেষণা দলটি প্রথম মহাজাগতিক বৃষ্টির উৎসের ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছেন। ছবিগুলো অতিবেগুনী ও দৃশ্যমান—দুই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যতেই তোলা হয়েছে। আর এজন্য ব্যবহার করা হয় ফ্রাংকের তৈরী বিশেষ কিছু যন্ত্র এবং এক বছর ধরে মেরুতে থাকা নাসা'র (NASA) নভোযান।[১]

এসব উদাহরণ কুরআনের বিশুদ্ধতার সামান্য কিছু নমুনা মাত্র। মহাসমুদ্র সংক্রান্ত বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, পৃথিবীর উৎপত্তি, সৃষ্টি ও বিবর্তন সংক্রান্ত বিদ্যা, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা, ভ্রূণতত্ত্ব, শব্দবিজ্ঞান, পানিবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে কুরআনের আরো অনেক অনন্য ও অসাধারণ নির্ভুল বক্তব্য রয়েছে।[২]

কুরআনে অসঙ্গতি

যারা বিশ্বাস করে না যে, আল কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত গ্রন্থ—তাদেরকে এর মধ্যে কোনো স্ববিরোধী বক্তব্য বা অসঙ্গাতি খুঁজে বের করার জন্য চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

"তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো তাহলে তারা এর মধ্যে অনেক অসঙ্গাতি খুঁজে পেতো।"[৩]

---

১ গালফ নিউজ, শুক্রবার, ৩০ মে, ১৯৭৭, পৃঃ ১০।

২ আরো বিস্তারিত পড়ার জন্য দেখুন মরীস বুকাইলীর 'দ্যা কুরআন এন্ড মডার্ন সায়েন্স' ও গেরী মিলারের 'এমাজিং কুরআন'।

৩ সূরা আন নিসা (৪): ৮২।

সঠিক ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে সমালোচকরা কুরআনের যে বিষয়সমূহকে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে করে থাকে, এমন কয়েকটি উদাহরণ ও তার সঠিক ব্যাখ্যা নিচে তুলে ধরা হলো।

প্রথম উদাহরণ:

এক সমালোচক লিখেছেন: ৪১ নং সূরার ১১ নং আয়াত অনুযায়ী সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় আকাশ ও পৃথিবী প্রথমে আলাদা ছিল এবং পরে দু'টিকে একত্রিত হওয়ার জন্য ডাকা হয়; পক্ষান্তরে ২১ নং সূরার ৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, এগুলো পূর্বে এক সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এবং পরে দু'টিকে আলাদা করা হয়। তাহলে কোনটাকে আমরা সঠিক মনে করবো?

প্রথমে আমরা মূল আয়াতের দিকে লক্ষ্য করি। সূরা আল আম্বিয়া'র ৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ۖ

"কাফিররা কি দেখে না যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবী পূর্বে এক সাথে সংযুক্ত ছিল, তারপর আমি[১] তাদেরকে আলাদা করলাম!"

অন্যদিকে সূরা ফুস্‌সিলাতের ১১ ও ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

ثُمَّ اسْتَوٰٓى إِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ۖ قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ ﴿١١﴾ فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحٰى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ۚ

"অতঃপর[২] তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন যা তখন ছিল কেবল ধোঁয়া। তিনি একে ও পৃথিবীকে বললেন, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, তোমরা এগিয়ে

---

১ এখানে ব্যবহৃত শব্দটির অর্থ 'আমরা'। আরবী ভাষারীতিতে মহান সম্মানিত কারো ক্ষেত্রে 'আমি' এর পরিবর্তে 'আমরা' ব্যবহার করা হয়ে থাকে যাকে 'রাজকীয় বচন' বলা যেতে পারে। এখানে মহান আল্লাহর শানে তা ব্যবহার করা হয়েছে।

২ এখানে আরবি শব্দটি হলো 'সুম্মা'। এটি একটি সংযোজক অব্যয় যা সাধারণত ঘটনার ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে, আবার কখনও করে না। মুহাম্মাদ আসাদ মনে করেন, এখানে শব্দটি ধারাবাহিকতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়নি, তাই তিনি এটিকে 'এবং' অর্থে অনুবাদ করেছেন। 'সুম্মা' শব্দের অর্থ ও ব্যবহার-রীতির ব্যাখ্যার জন্য দেখুন দিয়াউস সালিক ইলা আওদাহিল মাসালিক। ধারাবাহিকতা ছাড়া অন্যান্য অর্থে এ শব্দের ব্যবহার রীতির আরো দৃষ্টান্ত জানতে দেখুন কুরআন, ২: ১৯৮-৯ ও ৬: ১৫৪।

এসো। উভয়ে বললো, আমরা অনুগতদের মতোই এগিয়ে এলাম। তারপর তিনি দু'দিনের মধ্যে সাত আসমান বানালেন এবং প্রত্যেক আসমানে তিনি তার নিয়ম-কানুন প্রত্যাদেশ করলেন।"

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথিবীর উৎপত্তি, সৃষ্টি ও বিবর্তন সংক্রান্ত যে প্রভাবশালী তত্ত্বটি শেখানো হয় তা হলো Big Bang Theory বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন সমালোচক 'বিগব্যাং তত্ত্ব' ও কুরআনের এ দু'টি আয়াতের মধ্যে অসঙ্গতি খুঁজে পান। জ্যোতির্বিদ ও পদার্থবিজ্ঞানীদের মতে, মহাবিশ্বের সকল বস্তু অকল্পনীয় উচ্চ তাপমাত্রার, অতি পুঞ্জীভূত ঘনত্বের একটি বিন্দু থেকে উদ্ভূত হয়েছে যা তারপর বিগব্যাং বা মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে দূর দূরান্তে ছিটকে পড়ে। ফলশ্রুতিতে তাপমাত্রা ও ঘনত্ব দ্রুত হ্রাস পায় এবং কিছু পারমাণবিক মৌল গঠিত হয়। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, লক্ষ-কোটি বছর পর মহাবিশ্ব হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পরমাণু গঠিত হওয়ার মতো যথেষ্ট শীতল হয়। কয়েক শ' মিলিয়ন বছর পর সম্প্রসারণশীল গ্যাসপুঞ্জের ঘনত্বে হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে পরিশেষে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন ছায়াপথের রূপ পরিগ্রহ করেছে। তারপর ছায়াপথসমূহের গ্যাসপুঞ্জ একত্রিত হয়ে স্বতন্ত্র নক্ষত্র গঠন করেছে।[১] এ পর্যালোচনা থেকে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার দু'টি চিত্র ফুটে ওঠে। প্রথমটি হলো, একটি অকল্পনীয় ঘন কঠিন বস্তুপিণ্ড। দ্বিতীয়টি হলো, সম্প্রসারণশীল উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কণিকাপুঞ্জ যা পরিশেষে এতোটা শীতল হয়ে পড়েছিল যার নাম দেয়া হয়েছে গ্যাসপুঞ্জ, যা থেকে তৈরী হয়েছে বিভিন্ন ছায়াপথ।

এ সমালোচক কুরআনের যে দু'টি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে মূলত মহাবিশ্ব সৃষ্টি প্রক্রিয়ার দু'টি স্তর বর্ণিত হয়েছে। কোনটি আগে হয়েছে সে ব্যাপারে কোনো আয়াতেই স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়া হয়নি; তবে এটি ধরে নেয়া অস্বাভাবিক নয় যে, আদিতে ছিল একটি পরস্পর সংযুক্ত ঘন বস্তুপিণ্ড যা বিস্ফোরিত হয়ে ছিটকে পড়ে– যার ফলে সৃষ্টি হয় গ্যাসীয় (ধুম্র) অবস্থা, অতঃপর তা থেকে মহাকাশ আলাদা হয়ে যায়।

---

১ দেখুন দ্যা নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, খণ্ড ১৬, পৃঃ ৭৭৬-৭। অবশ্য এ চিত্রটি বেশ অনুমান-নির্ভর, তবে ভৌতিক বাস্তবতার কিছু দৃশ্যমান দিকও রয়েছে যা থেকে এ তত্ত্বের সাধারণ রূপরেখার সমর্থন পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় উদাহরণ:

একই সমালোচক লিখেছেন যে, কুরআনে একেক আয়াতে মানুষকে একেক উপাদান থেকে সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে মানুষ আসলে কিসের তৈরী? 'আলাকাহ (৯৬:১-২), পানি (২১:৩০, ২৪:৪৫, ২৫:৫৪), ঠনঠনে অর্থাৎ ঝলসানো কাদামাটি (১৫:২৬), ধুলা (৩:৫৯, ৩০:২০, ৩৫:১১), অবস্তু (১৯:৬৭) এবং তারপর এটি (৫২:৩৩) আয়াতে অস্বীকার করা হয়েছে, মাটি (১১:৬১), এক ফোঁটা ঘন তরলবস্তু (১৬:৪, ৭৫:৩৭)।

আসুন যেসব আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে আমরা সেগুলোর দিকে একটু লক্ষ্য করি:

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿٦٧﴾

"মানুষের কি স্মরণ হয় না, আমিই ইতিপূর্বে তাকে সৃষ্টি করেছি; অথচ সে তখন কিছুই ছিল না?"[১]

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾

"কোনো কিছু ছাড়াই কি তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে? না কি তারা নিজেরাই সৃষ্টিকর্তা?"[২]

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

"এবং প্রত্যেকটি প্রাণীকে আমি পানি থেকে সৃষ্টি করেছি।"[৩]

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ

"আর আল্লাহ প্রত্যেক বিচরণশীল প্রাণীকে এক ধরনের পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন।"[৪]

---

১ সূরা মারইয়াম (১৯): ৬৭।
২ সূরা আত তূর (৫২):৩৫।
৩ সূরা আল আম্বিয়া (২১): ৩০।
৪ সূরা আন নূর (২৪): ৪৫।

وَهُوَ الَّذِىۡ خَلَقَ مِنَ الۡمَآءِ بَشَرًا

"আর তিনিই পানি থেকে একটি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।"[১]

وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ مِنۡ صَلۡصَالٍ مِّنۡ حَمَاٍ مَّسۡنُوۡنٍ ۚ﴿۲۶﴾

"আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি শুকনো ঠনঠনে ঝলসানো কাদামাটি থেকে।"[২]

هُوَ اَنۡشَاَكُمۡ مِّنَ الۡاَرۡضِ

"তিনিই তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।"[৩]

وَمِنۡ اٰيٰتِهٖۤ اَنۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ تُرَابٍ

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটিও রয়েছে যে, তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।"[৪]

اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّكَ الَّذِىۡ خَلَقَ ۚ﴿۱﴾ خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ مِنۡ عَلَقٍ ۚ﴿۲﴾

"পড়ো (হে নবী); তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাটবাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে।"[৫]

اَلَمۡ يَكُ نُطۡفَةً مِّنۡ مَّنِىٍّ يُّمۡنٰى ۙ﴿۳۷﴾

"সে কি সামান্য পানির মতো এক ফোঁটা বীর্য ছিল না যা (মায়ের জরায়ুতে) নিক্ষিপ্ত হয়?"[৬]

---

১ সূরা আল ফুরকান (২৫): ৫৪।

২ সূরা আল হিজর (১৫): ২৬। এ আয়াতে ব্যবহৃত 'সলসল' পরিভাষাটির অর্থ হলো 'বালি মিশ্রিত কাদা যা শুকিয়ে যাওয়ার পর তাতে আঘাত করা হলে শব্দ উৎপন্ন করে। এরাবিক–ইংলিশ লেক্সিকন, খণ্ড ২, পৃঃ ১৭১১।

৩ সূরা হুদ (১১): ৬১।

৪ সূরা আর রুম (৩০): ২০।

৫ সূরা আল আলাক (৯৬: ১-২)। এখানে 'আলাক' শব্দটির 'রক্তপিণ্ড' এর তুলনায় 'জাপটে লেগে থাকা বস্তু' অনুবাদটি অধিকতর নির্ভুল।

৬ সূরা আল কিয়ামাহ (৭৫): ৩৭।

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ④

"তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সামান্য এক ফোঁটা বীর্য থেকে। অথচ সে-ই এখন (তার স্রষ্টা সম্পর্কে) তর্কে লিপ্ত।"[১]

কুরআনের এসব আয়াতের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা খুঁজে পাওয়ার মূল কারণ হলো অধিবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জীববিদ্যা এবং জীবতাত্ত্বিক সৃষ্টির বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে অক্ষমতা। উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম দু'টি আয়াতে অধিবিদ্যার (metaphysics) পরিভাষায় সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে আল্লাহ মানবজাতিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি মূলত অনস্তিত্ব থেকে তাদেরকে এবং সকল সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেছেন, যা তাঁর অন্যতম মহিমান্বিত গুণ। নাস্তিকতার অসারতাকে মানুষের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে তিনি দ্বিতীয় আয়াতে একটি আলঙ্কারিক প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন, "তোমরা যদি আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করো, তাহলে তোমরা কি বিশ্বাস করো যে, শূন্য থেকেই তোমরা অস্তিত্বে এসেছ?" অতএব এ দু' আয়াতের মধ্যে কোনো স্ববিরোধিতা নেই।

পরবর্তী তিনটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানবজাতিসহ সকল প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি একটি জীবতাত্ত্বিক বাস্তবতা যা কেউ অস্বীকার করে না। সকল প্রাণীর শারীরিক অস্তিত্বই পানির উপর নির্ভরশীল।

পরবর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে ধুলা ও কাদামাটি থেকে। এসব আয়াতের দু'টি গ্রহণযোগ্য তাফসীর রয়েছে। প্রথমটি হলো, এসব আয়াতে মানবজাতির পূর্বপুরুষ আদম ﷺ এর কথা বলা হয়েছে। অপরটি হলো, এগুলোতে মানবদেহের রাসায়নিক গঠনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি উপাদান মাটিতে বিদ্যমান। সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ তার খাদ্য প্রস্তুতের সময় নিজ প্রয়োজন অনুসারে মাটি থেকে এসব রাসায়নিক উপাদান গ্রহণ করে। আর মানুষ সরাসরি উদ্ভিদ খাওয়ার মাধ্যমে কিংবা তৃণভোজী প্রাণীর মাংস খাওয়ার মাধ্যমে উল্লিখিত উপাদানসমূহ তার রক্তে ধারণ করে থাকে।

---

১ সূরা আন নাহল (১৬): ৪।

এ প্রক্রিয়ায় সকল প্রাণীর উৎস মূলত মাটি; কিংবা ভিন্নভাবে বলতে গেলে, মাটির ধুলা পানির সাথে মিশে গেলে যার নাম হয় কাদা।

অবশিষ্ট আয়াতসমূহে মানুষ সৃষ্টির জীবতাত্ত্বিক দিকসমূহ উল্লিখিত হয়েছে। 'নুতফাহ' শব্দটি সাধারণত পুরুষের বীর্য বুঝাতে ব্যবহৃত হয়, তবে ভাষাতাত্ত্বিকভাবে নারীর প্রজনন উপাদান অর্থেও এ শব্দের ব্যবহার সম্ভব। নিষিক্ত ডিম্বাণুকে কুরআনে 'নুতফাতুন আমসাজ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে যার অর্থ 'মিশ্রিত তরল'।[1]

একটি হাদীসে নুতফাহ শব্দটি স্পষ্টভাবে নারীর প্রজনন উপাদান বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। মানবজাতিকে কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে– মর্মে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

من كل يخلق من نطفة الرجل و من نطفة المراة

"তাকে পুরুষ ও নারীর উভয়ের নুতফাহ্ থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে।"[2]

নিষিক্ত হওয়ার পর ভ্রূণ জরায়ুর গায়ে নিজেকে গেঁথে রাখে। এ স্তরকেই আরবিতে 'আলাক' বলা হয়।[3] অতএব এসব আয়াতের কোনোটিতেই কোনো অসঙ্গতি নেই, আলহামদু লিল্লাহ।

---

১ সূরা আল ইনসান (৭৬): ২। এ অভিব্যক্তিতে একটি বিস্ময়কর সূক্ষ্মতা রয়েছে যা প্রথম দিকের ভাষ্যকারদেরকে বেশ ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল। 'নুতফাহ' শব্দটি একবচন বিশেষ্য, অন্যদিকে তার বিশেষণ হিসেবে যে 'আমসাজ' শব্দটি এসেছে তা আবার বহুবচন। সাধারণত বিশেষণ ও বিশেষ্যকে অবশ্যই বচন, লিঙ্গ ও কারকের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হয়। নিষিক্ত হওয়ার পর নুতফাহ একটি একক সত্তা, তবে তার ক্রমোজমসমূহের অর্ধেক পিতার ও অর্ধেক মাতার। অতএব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে একবচন নুতফাহ কে বিশেষায়িত করার জন্য আমসাজ শীর্ষক বহুবচনবোধক বিশেষণ সম্পূর্ণ নির্ভুল। দ্যা কুরআন এন্ড মডার্ন সায়েন্সঃ কোরিলেশান স্টাডিজ, পৃঃ ২৭-৯।

২ মুসনাদে আহমদ, নং ৪২০৬। আল হুসাইন ইবনুল হাসানের কারণে ইসনাদে দুর্বলতা রয়েছে। তিনি সত্যবাদী ছিলেন, তবে তার মধ্যে ভুল করার প্রবণতা ছিল। (দেখুন তাকরীবুত তাহযীব, পৃঃ ১৬৬, নং ১৩১৭) হাদীসের এ অংশটি আব্দুল্লাহ ইবনু সালামের হাদীস দ্বারা সমর্থিত; বুখারীর সংগৃহীত সে হাদীসে উল্লেখ আছে যে, নারীর বীর্য (মা-উল মারআহ) পুরুষের বীর্যের উপর বিজয়ী হলে শিশুটি মায়ের সদৃশ লাভ করবে। (সহীহ বুখারী, খণ্ড ৫, পৃঃ ১৮৯-৯০, নং ২৭৫)

৩ দ্যা কুরআন এন্ড মডার্ন সায়েন্সঃ কোরিলেশান স্টাডিজ, পৃঃ ৩১।

কুরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক অলৌকিকত্ব

এ তত্ত্বের উদ্ভাবক ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত এক খ্যাতিমান মিশরীয় প্রাণরসায়নবিদ ডঃ রাশাদ খলিফা। তার মতে, কুরআনে একটি অলৌকিক সংখ্যাতাত্ত্বিক কোড রয়েছে যা ১৯টি অক্ষর সম্বলিত। তার এ ধারণার ভিত্তি হলো কুরআনের প্রথম আয়াত 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'। তার ধারণা, ১৯ হরফ সম্বলিত এই অলৌকিক কোডটির কথাই বুঝানো হয়েছে ৭৪তম সূরা আল মুদ্দাস্‌সিরের ৩০তম আয়াতে– যেখানে বলা হয়েছে, 'তার উপরে রয়েছে ১৯'। এ দু'টি ধারণার ভিত্তিতে ডঃ রাশাদ দাবী করছেন যে, তিনি গোটা কুরআনে– বিশেষত ২৯টি সূরার শুরুতে যে আদ্যক্ষর আলিফ, লাম, মীম ইত্যাদি রয়েছে সেগুলোতে– ১৯ ও এর গুণিতক সংক্রান্ত একটি জটিল গাণিতিক বিন্যাস আবিষ্কার করেছেন। এ আবিষ্কার থেকে ডঃ খলিফা উপসংহার টেনেছেন যে, এই গাণিতিক কোডের জটিল বিন্যাসের কারণে কুরআনের মতো কোনো সাহিত্য রচনা করা মানবীয় সামর্থ্যের সম্পূর্ণ বাইরে; এবং এটি একাই এমন এক অলৌকিকতা যা কুরআনের ঐশী উৎসের প্রমাণ বহন করে।[১] তিনি আরো অনুসিদ্ধান্ত টেনেছেন যে, ১৯ ও এর গুণিতকসমূহের মধ্যেই কুরআন ও ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যার মূলনীতি নিহিত রয়েছে। আর ১৯ কে বেছে নেয়ার কারণ হলো, ১৯ মানে আল্লাহ এক– যা কুরআনের মূল বার্তা।[২]

যাচাই-বাছাই না করে শুরুতে অনেকেই এ তত্ত্বকে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। তবে সমালোচকরা যখন তার সংখ্যাগুলোকে যাচাই করতে শুরু করলেন, তখন তারা তার উপাত্তে অসংখ্য অমিল ও কিছু সুস্পষ্ট জালিয়াতি খুঁজে পেলেন। তার দাবীসমূহের ভিত্তি ছিল একটি অক্ষর বা শব্দ একটি নির্দিষ্ট সূরায় বা সূরাসমষ্টিতে কতবার উল্লেখ হয়েছে তার সংখ্যার উপর।

---

১ 'প্রব্লেম অব নাইনটিন' শীর্ষক প্রবন্ধে রাশাদ খলিফা কর্তৃক স্বীয় তত্ত্ব উপস্থাপনা দেখুন ইম্প্যাক্ট ইন্টারন্যাশনাল, ১৩-২৬ নভেম্বর, ১৯৮১, পৃঃ ১৪-১৫।

২ কুরআনঃ ভিজুয়াল প্রেজেন্টেশন অব দ্যা মিরাকল, পৃঃ ৭০-৭৩, ২৪৩।
নোট: এ গণনার ভিত্তি হলো 'আবজাদ' পদ্ধতির সংখ্যাতত্ত্ব যেখানে আরবি বর্ণমালার অক্ষরগুলোকে সংখ্যাতাত্ত্বিক মান প্রদান করা হয়েছে– এ পদ্ধিতিটি ইহুদীদের কাব্বালাহ নামক আধ্যাত্মবাদী পদ্ধতি থেকে ধার করা হয়েছে।

পর্যালোচনা করে দেখা গেল যে, তিনি কখনো হামযাকে আলিফ হিসেবে গণ্য করেন, আবার মাঝে মধ্যে তা করেন না। আসলে তার তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সূরায় সর্বমোট যে সংখ্যার প্রয়োজন পড়তো তার ভিত্তিতে তিনি এটি করতেন। মাঝে-মধ্যে তিনি এমন কিছু অক্ষর গণনা করেছেন যা সেখানে নেই, মাঝেমধ্যে তিনি বিদ্যমান অক্ষরগুলোকে গণনা করতে ভুল করেছেন। কখনো তিনি দু'টি শব্দকে একটি হিসেব করেছেন, কখনো বা তিনি কুরআনের মূলপাঠে কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছেন, আবার কখনো তা থেকে কোনো কিছু মুছে ফেলেছেন। এ সবই করা হয়েছে অক্ষর ও শব্দ গণনাকে তার তত্ত্বের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য।

উপরন্তু, তিনি সরাসরি একটি সূরার ক্ষেত্রে একটি বিন্যাস প্রতিষ্ঠা করতে চান, নাকি সূরাসমষ্টির একটি অংশ হিসেবে—এর উপর নির্ভর করে তার অক্ষর গণনা একেক সময় একেক রকম হয়। তার উপাত্তের অসঙ্গতির ব্যাপারে প্রশ্নের মুখোমুখি হলে তিনি দাবী করতে শুরু করেন যে, কুরআনে এমন কয়েকটি আয়াত জুড়ে দেয়া হয়েছিল যা আসলে সেখানে ছিল না।

কুফরের এই সুস্পষ্ট বক্তব্য দেয়ার পর তিনি আরেকটু এগিয়ে দাবী করেন যে, তিনি কিয়ামতের সঠিক দিন-ক্ষণের জ্ঞান রাখেন এবং পরিশেষে তিনি নিজের জন্য নবুওত দাবী করে বসেন। এরিজোনার টাসকন এলাকায় তিনি একদল অনুসারী আকর্ষণ করতে সক্ষম হন, কিন্তু ১৯৯০ সালে এক অজ্ঞাত আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে তার সম্মুখযাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটে।[1]

---

১ দেখুন মিশন টু আমেরিকা, পৃঃ ১৩৭-১৬৮। এ তত্ত্বের বিস্তারিত খণ্ডন পাওয়া যাবে আমার গ্রন্থ দ্যা কুরআন'স নিউমারিক্যাল মিরাকলঃ হোক্স এন্ড হিরেসী তে।

৫

ওহী: আসমানী প্রত্যাদেশ

আরবি ভাষায় 'ওহী' শব্দটির অর্থ হলো দ্রুততার সাথে গোপনে অথবা শুধু গোপনে তথ্য আদান-প্রদান।[১] অতীতে আরবরা এ শব্দটিকে যেভাবে তথ্য আদান-প্রদানের বিভিন্ন পদ্ধতি বুঝাতে ব্যবহার করতো কুরআনও এ শব্দটিকে একই অর্থে ব্যবহার করেছে।

১. কুরআনে কখনো ওহী শব্দটিকে পশু-পাখীদের সহজাত অভ্যাস বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। এ অর্থে ব্যবহারের একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায় নিচের আয়াতে উল্লিখিত মৌমাছির ক্ষেত্রে:

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ

"তোমার রব মৌমাছিদেরকে এই মর্মে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন যে, তোমরা পাহাড়-পর্বত, গাছপালা ও তারা (মানুষ) যা কিছু নির্মাণ করে তাতে নিজেদের মৌচাক বানাও।"[২]

মৌমাছি তার মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র কোষে সঙ্গোপনে লিখিত ঐশী নির্দেশের কারণে সহজাত বুদ্ধি দিয়ে বিশেষ কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করে যুৎসই স্থানে তার মৌচাক নির্মাণ করে।

২. কুরআনে ওহী শব্দটি মানুষের মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া স্বভাবজাত প্রকৃতি বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, মূসা ﷺ এর মায়ের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে:

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ

"আমি মূসার মাকে প্রত্যাদেশ করলাম যে, তুমি তাকে স্তন্যদান করো।"[৩]

---

১ দেখুন লামহাতুন ফী "উলূমিল কুরআন, পৃঃ ৪৩ এ উদ্ধৃত ইবনু ফারিস ও রাগীব ইস্পাহানীর সংজ্ঞা।
২ সূরা আন নাহ্‌ল (১৬): ৬৮।
৩ সূরা আল কাসাস (২৮): ৭।

শিশুকে বুকের দুধ পান করানোর ব্যাপারে মায়ের সহজাত প্রকৃতি মূলত একটি তথ্যের ফল যা মানুষের অজানা এক উপায়ে প্রত্যেক নারীর জিনে সৃষ্টিগতভাবে দিয়ে দেয়া হয়েছে।

৩. একই আয়াতে আল্লাহ ওহী'র আরেকটি দিক উল্লেখ করেছেন; আর তা হলো সহজাত নয় এমন কাজ করার জন্য মানুষকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুপ্রেরণা দান করা। যেমন:

فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۚ

"তারপর যখন এর প্রাণনাশের আশংকা করবে তখন তাকে নদীতে ভাসিয়ে দেবে এবং কোনো ভয় ও দুঃখ করবে না।"

এটিকে অনেক সময় বলা হয় প্রজ্ঞা বা অন্তর্জ্ঞান। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি মনের মধ্যে কোনো ব্যাপারে এমন প্রবল অনুভূতি লাভ করে যে, কোনো বিশেষ কাজকে সে সঠিক মনে করে, যদিও এর পেছনে কোনো যৌক্তিক কারণ নেই।

৪. তবে, মনে উদয় হওয়া ধারণার উৎসের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ শয়তানও মানুষের অন্তরে বিভিন্ন কুমন্ত্রণা দিয়ে অনুপ্রেরণা যোগানোর ক্ষমতা রাখে। কুরআনে শয়তানের এই কুমন্ত্রণাকেও ওহী নামে অভিহিত করে। নিম্নের আয়াতটি এ ধরনের ব্যবহারের একটি উত্তম দৃষ্টান্ত:

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۚ

"আর শয়তান তাদের সাথীদেরকে কুমন্ত্রণা দেয়, যাতে তারা তোমাদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়।"[১]

যে ওহী'র মাধ্যমে শয়তানী চিন্তা-ভাবনা মানুষের মনে প্রবেশ করে, তার গোপনচারিতা ও অদৃশ্য উৎসের কারণে কুরআনে একে 'ওয়াসওয়াসা'ও বলা হয়েছে। একই কারণে একে বলা হয়েছে ওহী।

৫. মাঝেমধ্যে দ্রুত ও সূক্ষ্ম ইশারার মাধ্যমে যোগাযোগ বুঝাতে ওহী শব্দটি ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, নবী যাকারিয়্যা ﷺ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

---

১ সূরা আল আন'আম (৬): ১২১।

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۭ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ
مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿١١﴾

"তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে একটি নিদর্শন দান করো'। আল্লাহ বললেন, 'তোমার জন্য নিদর্শন হচ্ছে তুমি টানা তিন রাত মানুষের সাথে কথা বলবে না'। কাজেই সে মিহরাব থেকে বের হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের সামনে এসে এই মর্মে তাদেরকে ইশারা করল যে, তোমরা সকাল-সাঁঝে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।"[১]

অর্থাৎ, তিনি তাদেরকে বেশী করে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদাত করার আহ্বান জানান।

৬. যেভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফেরেশতাদের কাছে নির্দেশ প্রেরণ করেন সে প্রক্রিয়া বুঝাতে তিনি ওহী শব্দটি ব্যবহার করেন, যেমন:

اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۭ

"যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করছিলেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমরা ঈমানদারদেরকে অবিচল রাখো।"[২]

তবে কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য জায়গায় ফেরেশতাদের সাথে আল্লাহর যোগাযোগকে প্রত্যক্ষ সম্বোধন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত আয়াতটি কুরআন থেকে একটি উদাহরণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۭ

"স্মরণ করো যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা নিযুক্ত করতে চাই।"[৩]

হাদীস থেকেও এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ পেশ করা যায়। যেমন, ইবনু মাস'উদ ﷺ এর বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেন,

---

১ সূরা মারইয়াম (১৯): ১০-১১।
২ সূরা আল আনফাল (৮): ১২।
৩ সূরা আল বাকারা (২): ৩০।

اذا تكلم الله بالوحى سمع اهل السماء للسماء صلصلة كجر
السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذالك حتى ياتيهم
جبريل حتى اذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل
ما ذا قال ربك؟ فيقول الحق فيقولون الحق الحق

"মহান আল্লাহ যখন ওহীর বাণী উচ্চারণ করেন, তখন আসমানের অধিবাসীরা আসমানকে মসৃণ পাথরের উপর শেকলের ঝংকারের ন্যায় একটি আওয়াজে কাঁপতে শোনেন। তখন তারা ভয়ে অচেতন হয়ে যান, আর এ অবস্থা চলতে থাকে যতক্ষণ না জিবরাঈল আসেন এবং তাদের অন্তর থেকে ভয় দূরীভূত করা হয়। তখন তারা জিজ্ঞেস করে, 'হে জিবরাঈল, আপনার প্রভু কী বলেছেন?' তিনি বলেন, 'সত্য'। তারপর তারা বলেন, 'সত্য, সত্য'।"[১]

এ প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ফেরেশতাদের কাছে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সরাসরি আল্লাহর বক্তব্যের মাধ্যমে পৌঁছায়। উপরের দৃষ্টান্ত থেকে এটি স্পষ্ট যে, ওহী শব্দটি কেবল তা নাযিলের প্রক্রিয়াকেই বুঝায় না, বরং খোদ ওহীকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

৭. নবী ﷺ এর কাছে আল্লাহর নির্দেশ নাযিলের প্রক্রিয়া ও স্বয়ং নির্দেশ উভয়কেই কুরআনে ওহী নামে অভিহিত করা হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতে এ ধরনের ব্যবহারের একটি উত্তম উদাহরণ রয়েছে:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝٣ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝٤

"সে নিজের খেয়ালখুশী মতো কথা বলে না। যা তাঁর কাছে প্রত্যাদেশ করা হয় তা ওহী ছাড়া আর কিছুই নয়।"[২]

শারী'আহ্র পরিভাষায় ওহী বলা হয় সেই প্রক্রিয়াকে যার মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহর বাণী তাঁর নবীদের কাছে নাযিল করা হয়। আল্লাহর নবীর উপর অবতীর্ণ মূল বাণীকেও ওহী বলা হয়।

১ সুনানে আবু দাউদ, খণ্ড ৩, পৃঃ ১৩২৬, নং ৪৭২০, ইবনু খুযাইমাহ ও বায়হাকীও হাদিসটি সংকলন করেছেন। ইমাম আলবানী তাঁর সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ গ্রন্থে (খণ্ড ৩, পৃঃ ২৮২-৩, নং ১২৯৩) এটিকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। নাওয়াস ইবনু সামআন কর্তৃক বর্ণিত এ ধরনের একটি হাদীস ইমাম তাবারানীও সংকলন করেছেন।

২ সূরা আন নাজম (৫৩): ৩-৪।

ওহীর পদ্ধতি

নবীদের নিকট আল্লাহর কথা দু'ভাবে নাযিল হতে পারে। প্রত্যক্ষভাবে–যেমন, সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে কিংবা সরাসরি কথোপকথন দ্বারা।

পরোক্ষভাবে–যেমন, ওহীর ফেরেশতা জিবরাঈলের মাধ্যমে। আল্লাহ এসব পদ্ধতিকে কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ۚ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿٥١﴾

"কোনো মানুষের জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, আল্লাহ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন। তবে তা হতে পারে ওহীর মাধ্যমে, অথবা পর্দার আড়াল থেকে, কিংবা তিনি কোনো বার্তাবাহক (ফেরেশতা) পাঠান এবং সে তাঁর হুকুমে তিনি যা চান ওহী করে। তিনি সুমহান ও প্রজ্ঞাময়।[১]

প্রত্যক্ষ ওহী:

ওহীর একটি অংশ নবীদের উপর কোনো মাধ্যম ছাড়াই অবতীর্ণ হয়েছে। এ ধরনের ওহী হতে পারে স্বপ্নের মাধ্যমে কিংবা আলোর অন্তরালের নেপথ্য থেকে স্বয়ং আল্লাহর উচ্চারিত শব্দের আকারে।

(ক) **সত্য স্বপ্ন:** ঘুমন্ত অবস্থায় এমন স্পষ্ট স্বপ্নের মাধ্যমে নবীদের নিকট ওহী পৌঁছে দেয়া হয়েছে যা তাদের সামনে ভবিষ্যতের কোনো ঘটনার নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেছে। যেমন আয়েশা ﵂ বলেছেন, 'প্রথম দিকে নবী ﷺ এর নিকট ওহী নাযিল শুরু হয়েছিল ঘুমের মধ্যে উত্তম[২] স্বপ্নের মাধ্যমে। তাঁর স্বপ্ন তাঁর কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হতো।'[৩] এ ধরনের ওহী ছিল নবী ﷺ-কে জাগ্রত অবস্থার ওহীর প্রচণ্ড ভার বোঝার জন্য প্রস্তুত করার অত্যন্ত কার্যকর একটি পদ্ধতি।

---

১ সূরা আশ শূরা (৪২): ৫১।
২ এ হাদীসটির কিছু কিছু সংস্করণে 'সত্য' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।
৩ সহীহ বুখারী, খণ্ড ১, পৃঃ ২-৪, নং ৩, ও সহীহ মুসলিম খণ্ড ১, পৃঃ ৯৬-৮, নং ৩০১।

মাঝেমধ্যে স্বপ্নে নবীদেরকে কোনো সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করার দিকনির্দেশনা দেয়া হতো। যেমনটা ঘটেছে নবী ইবরাহীম ﷷ এর ক্ষেত্রে। কুরআনে রয়েছে যে, তিনি তাঁর পুত্র ইসমাঈলকে বলেছিলেন,

يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ

"হে পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখি তোমাকে আমি জবাই করছি; এখন তুমি বল, তুমি কী মনে করো?"

ইসমাঈলের জবাব কুরআনে নিম্নলিখিত ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে:

قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ

"সে বললো, 'হে আব্বাজান! আপনাকে যা হুক্‌ম দেয়া হচ্ছে তা করে ফেলুন, ইনশা আল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন'।"[১]

নবী ইবরাহীম ﷷ ও তাঁর পুত্র উভয়েই জানতেন যে, স্বপ্নটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ যা তাদেরকে পূর্ণ করতে হবে।

কুরআনের একমাত্র যে পূর্ণাঙ্গ সূরাটি স্বপ্নে নাযিল হয়েছিল বলে বর্ণিত আছে তা হলো সূরা 'আল কাউসার'। সাহাবী আনাস ইবনু মালিক ؓ বলেন, 'এক দিন আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের সাথে মসজিদে থাকা অবস্থায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন, তারপর তিনি মৃদু হাসি দিয়ে নিজের মাথা উঠালেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাসির কারণ কী?' তিনি জবাব দিলেন, 'এইমাত্র আমার নিকট একটি সূরা নাযিল হয়েছে।' তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন,

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝٣

"(হে নবী!) নিশ্চয় আমি তোমাকে কাওসার দান করেছি। কাজেই তুমি তোমার রবেরই জন্য সালাত আদায় করো ও কুরবানী করো। নিশ্চয় তোমার দুশমনই শেকড় কাটা।"।[২]

---

১ সূরা আস সা-ফ্ফাত (৩৭): ১০২।

২ সহীহ মুসলিম, খণ্ড ১, পৃঃ ২২০, নং ৭৯০।

উল্লেখ্য যে, সত্য স্বপ্ন কেবল নবীদের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়, অন্য কোনো মানুষের স্বপ্নও সত্য হতে পারে।[১] তবে, সাধারণ মানুষের স্বপ্ন কখনোই নবীদের স্বপ্নের মতো নয়। নবীদের প্রত্যেকটি স্বপ্নই সত্য স্বপ্ন; সেহেতু তাঁদের স্বপ্নসমূহ হিদায়াতের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস। পক্ষান্তরে, সাধারণ মানুষ কেবল তখনই তাদের স্বপ্নের সত্যতা জানতে পারে যখন তা বাস্তবে পরিণত হয়। সাধারণ মানুষের স্বপ্ন অনেক ক্ষেত্রে স্মৃতি, অলীক কল্পনা ও মনের মধ্যে শয়তানের ঢুকিয়ে দেয়া স্বপ্নের সাথে সত্য স্বপ্নের একটি মিশ্রিত রূপ হতে পারে। এ কারণে বাস্তবে প্রতিফলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি দাবী করতে পারে না যে, তার স্বপ্ন সত্য।

(খ) ঐশী বাণী: নবীদের সাথে আল্লাহর সরাসরি যোগাযোগের দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলো প্রত্যক্ষ কথোপকথনের মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহর কালাম নবীদের উপর অবতীর্ণ হয়। জাগ্রত অবস্থাতেই নবীদের উপর এভাবে ওহী নাযিল হতো, তবে আলোর একটি পর্দা আল্লাহ ও তাঁদের মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি করে আল্লাহর প্রত্যক্ষ দর্শন থেকে বিরত রাখতো।[২] আমরা যতদূর জানি, এ ধরনের যোগাযোগ কেবল দু'জন নবীর ক্ষেত্রেই সংঘটিত হয়েছে। একজন হলেন নবী মূসা ﷺ যার ব্যাপারে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ

"অতপর মূসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হলো তখন তার রব তার সাথে কথা বললেন।"[৩]

নবী মূসা ﷺ যে পদ্ধতিতে ওহী লাভ করতেন তার মধ্যে এ পদ্ধতিটিই ছিল প্রধানতম। আর এ কারণে তাঁর উপাধি ছিল 'কালীমুল্লাহ'। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন।[৪]

---

১ যার প্রমাণ নবী (সা.) এর নিম্নোক্ত বক্তব্যঃ "আমার পর আসমানী ওহী পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে, তবে সুসংবাদ ও সত্য স্বপ্ন বাদে।" সহীহ বুখারী, খণ্ড ৯, পৃঃ ৯৮, নং ১১৯।

২ সহীহ মুসলিম, খণ্ড ১, পৃঃ ১১৩, নং ৩৪১-২।

৩ সূরা আল আ'রাফ (৭): ১৪৩।

৪ দেখুন সহীহ মুসলিম, খণ্ড ১, পৃঃ ১২৭, নং ৩৭৭।

দ্বিতীয় যে নবী আল্লাহর কালাম সরাসরি শুনতে পেয়েছেন তিনি হলেন নবী মুহাম্মাদ ﷺ। তবে, এ ঘটনা তাঁর নবুওতী জীবনে মাত্র একবারই সংঘটিত হয়েছে; আর তা ছিল নবী ﷺ এর মি'রাজের সময়।[১]

পরোক্ষ ওহী

ওহীর ফেরেশতা জিবরাঈলের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা প্রধানত তাঁর নবীদের নিকট ওহী নাযিল করতেন। সর্বশেষ গ্রন্থ আল কুরআন প্রায় পুরোটাই এ পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে। এ ধরনের ওহী নবী ﷺ এর নিকট দু'ভাবে পৌঁছেছে: ঘন্টার প্রতিধ্বনি সৃষ্টিকারী শব্দের আকারে, কিংবা ফেরেশতার সরাসরি বক্তব্যের আকারে।

প্রথম ক্ষেত্রে ফেরেশতা অদৃশ্য অবস্থায় থাকতো আর নবী ﷺ-কে ওহী গ্রহণের জন্য উপযুক্ত একটি আধ্যাত্মিক অবস্থায় উন্নীত হওয়া লাগতো। এ পদ্ধতি ছিল নবী ﷺ এর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। এ সময় ফেরেশতার কণ্ঠে একটি বিশাল ঘণ্টাধ্বনির মতো শব্দ উচ্চারিত হতো। সাহাবী হারিছ ইবনু হিশাম নবী ﷺ এর নিকট কীভাবে ওহী আসে তা জানতে চাইলে নবী ﷺ জবাবে বলেন,

احيانا ياتيني مثل صلصلة الجرس و هو اشده على فيفصم عني و قد وعيت عنه ما قال

"কখনো কখনো তা এসেছে ঘন্টাধ্বনি সৃষ্টিকারী শব্দের আকারে—এটি হলো আমার জন্য সবচেয়ে কষ্টকর পদ্ধতি। তারপর ঘন্টাধ্বনি বন্ধ হয়ে যেতো এবং (ফেরেশতা) যা কিছু বলতো তখন আমি তা বুঝে নেই।"[২]

ওহী নাযিলের এ পদ্ধতির তীব্রতা সম্পর্কে আয়েশা ؓ বলেন, 'আমি প্রচণ্ড শীতের সময় তাঁর উপর ওহী নাযিল হতে দেখেছি; প্রচণ্ড শীত সত্ত্বেও ওহী নাযিল বন্ধ হওয়ার পর তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরতো।'[৩]

১ দেখুন সহীহ মুসলিম, খণ্ড ১, পৃঃ ১০০-৪, নং ৩০৯ ও ৩১৩।
২ সহীহ বুখারী, খণ্ড ১, পৃঃ ২, নং ২।
৩ প্রাগুক্ত।

প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয় পদ্ধতিটি ছিল নবী ﷺ এর জন্য অধিকতর সহনীয়। এ ক্ষেত্রে ফেরেশতা নবী ﷺ এর সামনে মানুষের রূপে হাজির হতেন এবং মানুষের মতো বলা কথার মাধ্যমে ওহী পৌঁছে দিতেন। নবী ﷺ এ পদ্ধতিকে হারিছ ইবনু হিশামের নিকট নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন,

و احيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فاعى ما يقول

"কখনো কখনো ফেরেশতা আমার সামনে মানুষের রূপে হাজির হয়ে আমার সাথে কথা বলে, আর সে যা বলে আমি তা আত্মস্থ করে নেই।"[১]

ওহীর প্রকারভেদ

নবী ﷺ এর উপর ওহী নাযিলের যেমন বিভিন্ন পদ্ধতি (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) ও প্রকৃতি (স্বপ্ন ও বক্তব্য) রয়েছে, তেমনি ওহীর প্রকারভেদেও রয়েছে ভিন্নতা। যেমন কুরআন, হাদীসে কুদ্সী ও নবী ﷺ এর অন্যান্য হাদীসসমূহ।

কুরআন আকারে যে ওহী এসেছে তার সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যায় যে, কুরআন হলো স্বয়ং আল্লাহর কালাম যা নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ গ্রন্থের বিন্যাস ও রচনাশৈলী সম্পূর্ণ অলৌকিক ও অনন্য এবং এ গ্রন্থের তিলাওয়াতই এক প্রকার ইবাদাত।[২]

হাদীসে কুদ্সী আকারে অবতীর্ণ ওহীর সরল সংজ্ঞা হলো, এ ওহী আল্লাহরই কালাম যা নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এগুলো হলো সেসব হাদীস যেখানে নবী ﷺ কোনো বক্তব্যকে স্বয়ং আল্লাহর কথা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যেমন, 'আল্লাহ বলেছেন ...' অথবা 'তোমাদের রব বলেছেন ...' অথবা কোনো সাহাবী যখন বলেন, 'নবী ﷺ তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন ...'।[৩]

নবী ﷺ এর হাদীসসমূহকে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ভাগে রয়েছে সেসব বক্তব্য যেগুলো নবী ﷺ তাঁর নিজস্ব বিচার-বিবেচনা

---

১ প্রাগুক্ত।
২ দেখুন শারহুল কাওকাবিল মুনীর, খণ্ড ২, পৃঃ ৭-৮।
৩ কাওয়ায়িদুত তাহদীস মিন ফুনূনি মুস্তালাহিল হাদীস, পৃঃ ৬৫।

থেকে বলেছেন। এ ধরনের বক্তব্যকে ওহী হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। তবে, আল্লাহর রাসূলের এ ধরনের বক্তব্যও পরোক্ষভাবে ওহীর সাথে সম্পৃক্ত, কারণ তাঁর কোনো বক্তব্য ভুল হলে তা ওহীর মাধ্যমে সংশোধন করে দেয়া হতো। আর যদি তাঁর বক্তব্য সঠিক হতো তাহলে কোনো ওহী নাযিল হতো না। আল্লাহর রাসূল ﷺ কোনো বক্তব্য দেওয়ার পর ওহী নাযিল না হওয়াটাই প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর সে কথার শুদ্ধতা নিশ্চিত হয়েছে।[১]

দ্বিতীয় প্রকারে রয়েছে নবী ﷺ এর সেসব হাদীস যার অর্থসমূহ এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, কিন্তু তা ব্যক্ত হয়েছে নবী ﷺ এর নিজের ভাব ও ভাষায়। নবী ﷺ এর হাদীসসমূহের কেবল এ অংশটিকেই সঠিক অর্থে ওহী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

কুরআনের ওহীর ব্যাপারে সংশয়

নবী ﷺ এর সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে কুরআনের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টির নানা ধরনের অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। সুতরাং, সেসব বানোয়াট সংশয় ও তার জবাব প্রসঙ্গে কিছু না বললে ওহীসংক্রান্ত আলোচনা একেবারেই অসমাপ্ত থেকে যাবে।

কুরআনকে ঐশী গ্রন্থ হিসেবে মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হয় সেগুলোর মধ্যে প্রধানতম অভিযোগ হলো নিচের দু'টি:

(১) কুরআন হলো মুহাম্মাদ ﷺ এর নিজস্ব রচনা। (২) অন্য কেউ মুহাম্মাদ ﷺ-কে এ কুরআন শিখিয়ে দিয়েছে।

কতিপয় সমালোচকের দাবী হলো, কুরআন নবী ﷺ নিজেই রচনা করেছেন এবং তিনি নিজেই এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এ অভিযোগ সত্য হলে এর অর্থ দাঁড়ায়, নবী ﷺ কুরআনকে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ওহী দাবী করেছেন– তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অর্থাৎ, নবী ﷺ বুঝে হোক বা না বুঝে হোক তাঁর অনুসারীদেরকে প্রতারিত করেছেন। তুলনামূলক কম আক্রমণাত্মক

১ দেখুন শারহুল কাওকাবিল মুনীর, খণ্ড ৪, পৃঃ ৪৭৩-৮০।

সমালোচকদের দাবী হলো, নবী ﷺ এর জীবনচরিত প্রমাণ করে যে, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সৎ; তবে ওহীর ব্যাপারটি ছিল মূলত কাল্পনিক ও তাঁর মতিভ্রম, যা সময়ে সময়ে তাঁকে পেয়ে বসতো। ঐতিহাসিকভাবে এ দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা। আর কুরআনের প্রাঞ্জল ভাষা, বর্ণনা ও চিরন্তন সত্য বক্তব্য কোনো পাগল ব্যক্তির অসংলগ্ন কথাবার্তার ফল হতে পারে না। অপেক্ষাকৃত কঠোর ও আক্রমণাত্মক সমালোচকদের দাবী, নবী ﷺ তাঁর অনুসারীদের উপর এবং পর্যায়ক্রমে সমগ্র আরবদের উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তাঁদের সাথে প্রতারণা করেছেন। কিন্তু এরা ভাবে না যে, ব্যক্তিগত যশ-খ্যাতি ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব যদি নবী ﷺ এর লক্ষ্য হতো, তাহলে কুরআনকে নিজের রচনা বলে দাবী করাই ছিল তাঁর জন্য অধিকতর ফলপ্রসূ। কারণ তাঁর মক্কার মুশরিক শত্রুরা অন্য সব সাহিত্যকর্মের উপর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল এবং একমাত্র আল্লাহর একত্ববাদের প্রচারণা বন্ধ করার শর্তে নবী ﷺ-কে মক্কার সিংহাসন গ্রহণ করার প্রস্তাব দিয়েছিল।

কুরআনকে আসমানী গ্রন্থ হিসেবে অস্বীকারকারী অন্যান্য সমালোচকরা বলতে চান যে, মানুষের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার ও তাদেরকে আরও বেশী অনুগত করার উদ্দেশ্যে নবী ﷺ কুরআনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বলে দাবী করেছেন। কিন্তু বিষয়টি এমন হলে তিনি তাঁর সকল বক্তব্যকেই তো আল্লাহর নামে চালিয়ে দিতে পারতেন । ব্যাপারটি আসলে মোটেই তা নয়; কেননা, নিজের পক্ষ থেকে দেওয়া বক্তব্য মুসলিমদের উপর তাঁর আনুগত্যের বাধ্যবাধকতাকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করেনি।

এসব সমালোচকদের এ ধরনের মন্তব্য করার কারণ হলো, তারা নবী ﷺ-কে সেসব লোকদের মতো মনে করে যারা ক্ষমতা, সম্মান ও পার্থিব প্রতিপত্তির জন্য নিজ অনুসারীদের সাথে প্রতিনিয়ত প্রতারণা করে যায়। নবী ﷺ এর জীবনচরিত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সংরক্ষিত আছে এবং তা সম্পূর্ণ উল্টোটাই প্রমাণ করে। তৎকালীন সমাজে জেঁকে বসা ব্যাপক প্রতারণা ও দুর্নীতি সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই যে, নবী ﷺ তাঁর সত্যবাদিতা ও বদান্যতার জন্য এতোটাই খ্যাতি লাভ করেছিলেন যে, তাঁর প্রতিপক্ষ কাফিরদের পক্ষ থেকেই তাঁকে 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। তিনি অত্যন্ত সহজ-

সরল জীবন যাপন করেছেন। আমরা দেখতে পাই যে, তিনি কোনো সম্পদ বা ঋণ না রেখে ইন্তেকাল করেছেন।

আরো উল্লেখ্য যে, কুরআনে এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে নবী ﷺ এর ভুলগুলোকে তাঁর প্রতিপালক মহান আল্লাহ প্রকাশ্যে সংশোধন করে দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বদর যুদ্ধের[১] বন্দীদের জন্য নবী ﷺ মুক্তিপণ গ্রহণ করায় নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়:

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾

"সারা দেশে শত্রুদেরকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত না করা পর্যন্ত কোনো নবীর পক্ষে নিজের কাছে বন্দীদের রাখা শোভনীয় নয়। তোমরা চাও দুনিয়ার স্বার্থ; অথচ আল্লাহ চান আখিরাত। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর সিদ্ধান্ত যদি আগেই না লেখা হয়ে যেতো, তাহলে তোমরা যা কিছু করেছো সে জন্য তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হতো।"[২]

আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতুম رضي الله عنه এর ঘটনা। তিনি কুরআন শিখতে নবী ﷺ এর কাছে এসেছিলেন; আর তখন তিনি একদল কুরাইশ নেতাকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। নবী ﷺ এর আচরণে তার প্রতি কিছুটা উপেক্ষা প্রকাশ পেলে এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করলেন:

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ ﴿٣﴾ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ﴿٤﴾ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ﴿٥﴾ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ﴿٦﴾ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ﴿٧﴾

"সে ভ্রূ কুঁচকালো ও মুখ ফিরিয়ে নিল, কারণ সেই অন্ধ লোকটি তাঁর কাছে এসেছে। তুমি কি জানো, হয়তো সে-ই শুধরে যেতো অথবা উপদেশের প্রতি মনোযোগী হতো এবং উপদেশ তার উপকারে আসতো? যে ব্যক্তি বেপরোয়া ভাব দেখায় তুমি

---

১ মক্কার লোকদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বড়সড় লড়াই। মদীনায় হিজরতের এক বছর পর এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
২ সূরা আল আনফাল (৮): ৬৭-৬৮।

তার প্রতিই মনোযোগ দিলে অথচ সে যদি শুধরে না যায় তাহলে তোমার উপর এর কি দায়িত্ব আছে ?"[১]

যদি ক্ষমতা ও সম্মান নবী ﷺ এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হতো, তাহলে এসব ছোটখাটো ভুল-ত্রুটি—যা তাঁর আশেপাশের লোকেরা ধরতেই পারতো না—প্রকাশ করে দেয়া নিশ্চয়ই তাঁর জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনেনি।

অন্যান্য সমালোচকরা দাবী করেছেন যে, কুরআনের জ্ঞানগর্ভ বিষয়সমূহ নবী ﷺ খ্রিস্টান ও ইহূদীদের কিতাবাদি থেকে শিখেছেন। এই মর্মে একটি বর্ণনা আছে—যার বিশুদ্ধতা নিয়ে আলিমদের মাঝে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে যে, নবী ﷺ বাল্যকালে তাঁর চাচা আবু তালিবের সাথে সিরিয়া ভ্রমণে গিয়েছিলেন এবং পথিমধ্যে বুহাইরা নামক এক খ্রিস্টান সন্ন্যাসীর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন...।[২] এ নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই যে, ওহী নাযিল শুরু হওয়ার পর নবী ﷺ-কে তাঁর স্ত্রী তাঁর চাচাত ভাই ওরাকাহ ইবনু নাওফালের নিকট নিয়ে গিয়েছিলেন—যিনি ছিলেন তাওরাত ও ইনজিলের জ্ঞানের জন্য সুপরিচিত। নবী ﷺ এর ব্যাপারে আরো জানা যায় যে, তিনি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পরই কেবল ইহূদী ও খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিলো।[৩] তবে সন্ন্যাসী বুহায়রার সাথে তাঁর এ সাক্ষাৎ ছিল অত্যন্ত স্বল্প সময়ের, আর এ বর্ণনায় শুধু এতোটুকুই জানা যায় যে, ঐ সন্ন্যাসী নবী ﷺ এর চাচা আবু তালিবকে তাঁর ভাতিজার আসন্ন নবুওত লাভ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আর ওরাকাহ ইবনু নাওফাল কেবল এতোটুকু নিশ্চিত করেছিলেন যে, নবী ﷺ এর উপর যা কিছু নাযিল হয়েছে তা সেই একই উৎস থেকে এসেছে, যেখান থেকে পূর্বের নবীদের উপর ওহী নাযিল হয়েছিল। নবী ﷺ কোনো ইহূদী খ্রিস্টান পণ্ডিতদের নিকট অধ্যয়ন করেছেন—এই মর্মে কোনো প্রমাণ নেই; আর ওরাকাহ তো এই ঘটনার অল্প

১ সূরা আবাসা (৮০): ১-৭।

২ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিযী। এর বর্ণনাকারীরা সাদূক হলেও মূল পাঠে বেশ কিছু ঐতিহাসিক অশুদ্ধতার দরুন ইমাম ইবনু কাসীর, যাহাবী ও ইবনু সাইয়িদিন নাস এ বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে ইমাম আলবানী সহীহ তিরমিযী গ্রন্থে (খণ্ড ৩, পৃঃ ১৯১, নং ২৮৬২) একে নির্ভরযোগ্য আখ্যায়িত করেছেন। দেখুন আর রাহীকুল মাখতুম, পৃঃ ৬০-১।

৩ দেখুন সহীহ বুখারী, খণ্ড ১, পৃঃ ২-৪, নং ৩, খণ্ড ৫, পৃঃ ১৮৯-১৯১, নং ২৭৫ ও খণ্ড ৫, পৃঃ ৪৬৯-৭০, নং ৬৬৩।

কিছুদিন পরই ইন্তেকাল করেছেন। মদীনাতে ইহূদী ও খ্রিস্টানরা নবী ﷺ এর সাথে তর্ক-বিতর্ক করতো ও বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতো; মদীনায় অবতীর্ণ অনেক আয়াতে সেসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে।[১] তাঁর নবুওতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য তারা তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতো, আর তিনি তাদেরকে কুরআনের মাধ্যমে জবাব দিতেন।

নবী ﷺ শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেছেন বলেও কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তবে অনেকে দাবী করেন যে, হাদ্দাদ নামক এক রোমীয় লোক তাঁর শিক্ষক ছিলো। কিন্তু এ ধরনের দাবী বাতুলতা বৈ কিছুই নয়। হাদ্দাদ যে কোনো জ্ঞানী লোক ছিলো না তা মক্কার লোকেরাও জানতো। তাছাড়া শেখানোর জন্য সময়-সুযোগও তার ছিল না। সে ছিলো একজন সামান্য লৌহকর্মকার; দিন-রাত সে এ কাজেই ব্যস্ত থাকতো। এটাও সবাই জানতো যে, সে ছিল একজন বিদেশী, যে কোনোমতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরবি বলতে পারতো।[২] কুরআন নিয়ে মানুষকে সংশয়ে ফেলতে নবী ﷺ এর সময়কার কাফিররাও আদা-জল খেয়ে নেমেছিলো। তাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের শেষ ছিলো না; কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। আল্লাহর রাসূলের কোনো গোপন শিক্ষক থাকলে, ঐ সময় সে নির্ঘাত ধরা পড়ে যেতো।

সম্প্রতি ইহূদী ও খ্রিস্টানদের এপোক্রিফাল[৩] গ্রন্থসমূহে কুরআনে উল্লিখিত অধিকাংশ ঐতিহাসিক ঘটনার উৎস অনুসন্ধান করা হয়েছে যা তাওরাত ও ইনজিলে নেই, কিংবা সেগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক।[৪] এটিকে এই মর্মে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, নবী ﷺ খ্রিস্টান ও ইহূদীদের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেছিলেন। তবে অখ্যাত যেসব বইয়ে কুরআনে উল্লিখিত ঘটনামূহের উৎস অনুসন্ধান করা হয়েছে সেগুলোর সংখ্যা অনেক। আর এগুলোর ভাষা হলো—এরামাইক, সিরিয়াক, হিব্রু ও গ্রীক।[৫] তাহলে যে

---

১ দেখুন সহীহ বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৬৩-৪, নং ৭৯, ও পৃঃ ২০৭, নং ২৪৫।

২ দেখুন তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ড ২, পৃঃ ২০৮, ১৬:১০৩ এর ভাষ্য।

৩ এপোক্রিফা হলো সেপ্টুয়াজিন্ট (ওল্ড টেস্টামেন্টের গ্রীক অনুবাদ) এর চৌদ্দটি গ্রন্থ যা ইহূদীবাদ ও প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদে প্রত্যাখ্যাত; এগারটি রয়েছে রোমান ক্যাথলিক বাইবেলে। ক্যাথলিক চার্চের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে লেখা খ্রিস্টানদের অন্যান্য প্রাচীন পাঠসমূহ (যেমন মিশরের নাগ হাম্মাদিতে প্রাপ্ত পাঠ) কেবল গত অর্ধশতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয়েছে।

৪ ইন্ট্রোডিউসিং ইসলাম, পৃঃ ৩০-১।

৫ দেখুন কনসাইজ এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, পৃঃ ২২৯, ও এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, খণ্ড ২২,

নবী ﷺ লিখতেও জানতেন না, পড়তেও পারতেন না; তাকে তো তাহলে বিদেশী ভাষা শেখা, মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র গ্রন্থ অনুসন্ধান ও সেগুলো গভীরভাবে অধ্যয়নের পেছনেই জীবন কাটিয়ে দিতে হতো। অতএব, একেবারে বর্তমান সময় পর্যন্ত কুরআনের ঐশী উৎসের ব্যাপারে যতো গবেষণাই হয়েছে তা সবই কেবল এ গ্রন্থের বিশুদ্ধতা ও সত্যতার বাড়তি সমর্থন প্রদান করেছে।

পৃঃ ৯। বিস্তারিত অভিযোগ পাওয়া যাবে রবার্ট মুরেই এর ইসলামিক ইনভেশন নামক গ্রন্থে যার অংশবিশেষের সারসংক্ষেপ পাওয়া যাবে ইন্টারনেটের এই ঠিকানায়ঃ http://members.aol.com/kingcome/cults/islam.htm। (মুরেই এর মুন গড (চন্দ্রদেবতা) তত্ত্বকে শাব্বির আলী বলিষ্ঠভাবে খণ্ডন করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি কীভাবে প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহকে প্রতারণার সাথে উদ্ধৃত করেছেন।

৬

কুরআন নাযিল

কুরআনে অবতীর্ণ স্বয়ং আল্লাহর বক্তব্য থেকেই বুঝা যায় যে, এর ওহীসমূহ দু'টি স্বতন্ত্র ধাপে নাযিল হয়েছে। কুরআনের ওহী অবতীর্ণ হওয়ার প্রক্রিয়া বর্ণনা করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহতে যেসব পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যকার আপাত সঙ্ঘাতসমূহকে দূরীভূত করতে হলে এ দু'পর্যায়ের ওহীকে অনুধাবন করা অত্যন্ত জরুরী।

আপাত সঙ্ঘাত বলতে বুঝাচ্ছি যে, একদিকে কুরআনের ব্যাপারে বলা হয় যে, এর পুরোটাই রমজান মাসে অথবা লাইলাতুল ক্বদরে নাযিল হয়েছে; আবার এ কথাও বলা হয় যে, এটি খণ্ড খণ্ড আকারে নবী ﷺ এর মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে নাযিল হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ের ওহী

ওহী নাযিলের প্রথম এ পর্যায়ে আল্লাহ কুরআনকে লাওহে মাহফুজ থেকে নিম্নতম আকাশে অবতীর্ণ করেছেন। এ ওহীতে কুরআনের সবটুকু একসাথে নিম্নতম আকাশের 'বাইতুল ইজ্জাহ' নামক স্থানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। লাইলাতুল কদরের বরকতময় রাতে তা অবতীর্ণ হয়; আর তা হলো রামাদান মাসের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত্রির একটি। ওহীর এই পর্যায়কে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করেছেন:

حٰمٓ ۝١ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝٢ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ۝٣

"হা-মীম। এই সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ। আমি এটিকে এক বরকতময় রাতে নাযিল করেছি; নিশ্চয় আমি সাবধানকারী।"[১]

---

১ সূরা আদ দুখান (৪৪): ১-৩।

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۝١

"নিশ্চয় আমি কুরআনকে লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি।"[১]

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ

"রামাদান মাস; এ মাসেই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে মানবজাতির পথনির্দেশিকা হিসেবে।"[২]

এসব আয়াতের উদ্দেশ্য হলো প্রথম পর্যায়ের ওহী। কারণ এটি সুবিদিত যে, নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর নিকট সমগ্র কুরআন রামাদানের এক রাতেই নাযিল হয়ে যায়নি।

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, কুরআন উর্ধ্বাকাশের যে স্থানে ছিল সেখান থেকে নিম্নতম আকাশের 'বাইতুল ইজ্জাহ' নামক স্থানে নিয়ে আসা হয়।[৩] একটি হাদীসের ভাষ্যমতে, এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে রামাদান মাসের কদরের রাত্রিতে।[৪] আল্লাহ চাইলে সমগ্র কুরআনকে নবী ﷺ এর নিকট একবারেই নাযিল করতে পারতেন। আগের নবীদের উপর অবতীর্ণ সকল কিতাব এভাবে একবারেই নাযিল হয়েছিল।[৫] তবে, সর্বশেষ গ্রন্থ আল কুরআনের ওহীকে

---

১ সূরা আল ক্বাদর (৯৭): ১।

২ সূরা আল বাকারাহ (২): ১৮৫।

৩ এ হাদীসটি হাকিম তার আল মুস্তাদরাক গ্রন্থে (খণ্ড ২, পৃঃ ৬৬৫-৬, নং ৪২১৬) সংগ্রহ করেছেন। যদিও ইবনু আব্বাস এ বক্তব্যটিকে নবী (সা.) এর সাথে সম্পৃক্ত করেননি, তারপরও বিষয়টির সম্পর্ক যেহেতু অদৃশ্য জগতের সাথে, সেহেতু নিছক বুদ্ধিবৃত্তির ভিত্তিতে এ ধরনের বক্তব্য প্রদান করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইসনাদের একজন বর্ণনাকারী আ'মাস নির্ভরযোগ্য, তবে তিনি একজন মুদাল্লিস – অর্থাৎ, তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ না তিনি এই মর্মে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিবেন যে, তিনি নিজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট থেকে হাদীসটি শুনেছেন। এখানে তিনি তা করেননি বিধায় ইসনাদটি দুর্বল।

৪ নাসাঈ আস সুনানুল কুবরা গ্রন্থে (খণ্ড ২, পৃঃ ৬৬৫-৬, নং ৪২১৬) ও তাবারানী আল মু'জামুলকাবীর গ্রন্থে এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন। তাবারানীর ইসনাদে একজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে। নাসাঈর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য, তবে তাদের একজন হলেন আ'মাস। হাদীসের এ পাঠেও তিনি স্পষ্টভাবে বলেননি যে, তিনি নিজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট থেকে তা শুনেছেন; এ কারণে উভয় ইসনাদই দুর্বল। তবে, নাসাঈ একই অধ্যায়ে প্রামাণ্য ইসনাদসহ আরো দু'টি বর্ণনা সংগ্রহ করেছেন, যেগুলো থেকে এ হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায়। উভয় হাদীসে উল্লেখ আছে যে, কুরআনকে লাইলাতুল ক্বাদরে নিম্নতম আকাশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, তবে সেগুলোতে 'বাইতুল ইজ্জাহ' এর উল্লেখ নেই।

৫ জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন, "আগের কিতাবসমূহ একবারে নাযিল হয়েছিল – এই মর্মে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্যসমূহ এতোটা সুবিদিত যে, একে ইজমা হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। তবে আমি বর্তমান সময়ের বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞকে এ নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করতে দেখেছি; তারা বলতে

মহান আল্লাহ দু'টি স্তরে ভাগ করেছেন। প্রথমে আকাশের মধ্যে ওহী নাযিল করার মাধ্যমে আকাশবাসীদের মধ্যে এ মর্মে একটি ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, ওহীর চূড়ান্ত কিতাব সর্বশেষ নবীর নিকট নাযিল করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের ওহী

তারপর নিম্নতম আকাশ থেকে জিবরাঈল ﷺ কুরআনের বিভিন্ন অংশ মুহাম্মাদ ﷺ এর নিকট নিয়ে এসেছেন। তাঁর নবুওত জীবনের তেইশ বছর যাবৎ ওহীর এ প্রক্রিয়াটি অব্যাহত ছিল। সূরা আল আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত দিয়ে এ ওহীর সূচনা হয়। মক্কার নিকটবর্তী হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর ওহী অবতীর্ণ শুরু হয়।[১] তবে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ যে সূরাটি নাযিল হয়, তা হলো সূরা আল ফাতিহা।[২] কুরআনের এ

চাচ্ছেন, এগুলো একবারে নাযিল হয়েছে মর্মে কোনো প্রমাণ নেই, বরং কুরআনের মতোই সেসব কিতাব দীর্ঘ সময় নিয়ে নাযিল হয়েছে। আমার মতে, প্রথম কথাটি সঠিক। এর স্বপক্ষে যেসব প্রমাণ রয়েছে সূরা আল ফুরক্বান এর ৩২ নং আয়াতটি তার অন্যতম [**"আর অবিশ্বাসীরা বলে, 'গোটা কুরআন তাঁর নিকট একবারে নাযিল হয়নি কেন?' এভাবে (নাযিল করা হয়েছে) যাতে আমি তোমার অন্তরকে এর দ্বারা শক্তিশালী করে দিতে পারি; আর একে তো আমি সঠিক ক্রমধারায় বিন্যস্ত করে দিয়েছি।"**]

ইবনু আবী হাতিম সাইদ ইবনু জুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন যিনি ইবনু আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন যে, ইহুদীরা জিজ্ঞেস করেছিল, 'হে মুহাম্মাদ, তাওরাত যেভাবে মূসার উপর নাযিল হয়েছিল সেভাবে সমগ্র কুরআন একসাথে নাযিল হয়নি কেন?' এর প্রেক্ষিতে (সূরা আল ফুরক্বানের) উক্ত আয়াত নাযিল হয়। অপর এক সনদের মাধ্যমে তিনি অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা সন্নিবিষ্ট করেছেন, পার্থক্য কেবল এতোটুকু যে, সেখানে প্রশ্নকারীরা ছিলেন মুশরিক। কাতাদাহ ও সুদ্দীর বরাতে তিনি একই ধরনের আরো কিছু বর্ণনা জড়ো করেছেন।

আপনি যদি বলেন যে, কুরআন এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে কিছু বলেনি এবং এসব বর্ণনা বিশুদ্ধ হলেও এসব বক্তব্য মূলত অবিশ্বাসীরা প্রদান করেছে, তার জবাবে আমি বলবো: বাস্তবতা হলো এই যে, আল্লাহ তাদের আপত্তিটি উল্লেখ করেছেন অথচ তাদের দাবীর ঐতিহাসিক সত্যতাকে চ্যালেঞ্জ করেননি, বরং এর পরিবর্তে (ধীরে ধীরে নাযিল হওয়ার) অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞাকে ব্যাখ্যা করেছেন। এটি এ বিষয়ের ইঙ্গিত বহন করে যে, বাস্তবতার নিরিখে তাদের বক্তব্য সঠিক। যদি আগের কিতাবগুলোও ধীরে ধীরে নাযিল হতো, তাহলে এ কথা বলেই তাদের যুক্তি খণ্ডন করে দেয়া যথেষ্ট ছিল যে, পূর্বের নবীদের উপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের ক্ষেত্রে এটি ছিল আল্লাহর চিরায়ত রীতি। "**এ রাসূলের কী হলো যে, সে খাবার খায় আবার বাজারেও ঘোরাফেরা করে?**" (২৫:৭) – আল্লাহ তাদের এ আপত্তির জবাব দিয়েছেন এভাবে, [**"আমি তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসূল প্রেরণ করিনি, যে খাবার খায়নি ও বাজারে ঘোরাফেরা করেনি।"**] (২৫:২০)" আল ইতক্বান ফী 'উলূমিল কুরআন, খণ্ড ১, পৃঃ ১২২।

১ আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন বুখারী (সহীহুল বুখারী, খণ্ড ১, পৃঃ ২-৪, নং ৩) ও মুসলিম (সহীহু মুসলিম, খণ্ড ১, পৃঃ ৯৬-৯৮, নং ৩০১)।

২ এটি বাইহাকী দালাইলুন নুবুওয়াহ গ্রন্থে এবং ওয়াহিদী আসবাবুন নুযূল গ্রন্থে সংগ্রহ করেছেন। সুয়ূতী বলেছেন, এর বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য তবে ইসনাদটি মুরসাল। দেখুন আল ইতক্বান, খণ্ড ১, পৃঃ ৭০-

অংশের ওহীই হলো নবুওতের চূড়ান্ত পর্যায়ের সূচনা। সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরাটি হলো সূরা আন নাসর।[১] দশম হিজরির শেষ দিকে বিদায় হজ্জের সময় নবী ﷺ মীনাতে অবস্থানকালে এ সূরাটি নাযিল হয়। ইবনু আব্বাস ﷺ এর মতে, সুদ সংক্রান্ত আলোচনার শেষে সূরা আল বাকারার ২৮১ নং আয়াতটি হলো সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত।[২]

দ্বিতীয় স্তরের ওহীকে আল্লাহ নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন:

وَقُرْءَانًا فَرَقْنَٰهُ لِتَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَٰهُ تَنزِيلًا ﴿١٠٦﴾

"আর কুরআনকে আমি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে দিয়েছি যাতে তুমি ধীরে ধীরে তা লোকদের সামনে পাঠ করে শোনাতে পারো; আর আমি একে নাযিল করেছি ধারাবাহিকভাবে।"[৩]

পর্যায়ক্রমিক ওহী নাযিলের তাৎপর্য

দ্বিতীয় স্তরের ওহী সবটুকু একবারে নাযিল না করে একটু একটু করে বিভিন্ন সময় নাযিল করার পেছনে এমন কিছু কারণ রয়েছে যেগুলো পূর্বেকার আসমানী গ্রন্থসমূহের ক্ষেত্রেও সংঘটিত হয়েছিল। এগুলোর মধ্য থেকে কিছু স্পষ্ট কারণ নিচে তুলে ধরা হলো:

১. নবী ﷺ এর অন্তরকে দৃঢ় ও অবিচল রাখা

নবী ﷺ মুশরিক ও ইহূদীদের পক্ষ থেকে নানারকম ঘৃণ্য শত্রুতার মুখোমুখি হয়েছিলেন। তারা তাঁকে মিথ্যুক ও প্রবঞ্চক আখ্যা দিয়ে তাঁর মনোবল

৭১।

১ এটি ইবনু আব্বাসের মত– যা ইমাম মুসলিম সংগ্রহ করেছেন সহীহু মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃঃ ১৫৫৪, নং ৭১৭৪-৫)। অন্যান্য সাহাবীর ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। দেখুন আল ইতক্বান, খণ্ড ১, পৃঃ ৭৭-৮১।

২ এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন বুখারী (সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৫১, নং ৬৭)। "এমন একটি দিনকে ভয় করো যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে; তারপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের ফল পুরোপুরি প্রদান করা হবে, তাদের কারো প্রতি যুলুম করা হবে না" – এ আয়াত ইসলামী আইনে বাড়তি কোনো কিছু যোগ করেনি; অতএব, এ আয়াত ও সূরা আল মায়িদাহ'র ৩ নং আয়াতে উল্লিখিত আল্লাহ তা'আলার বক্তব্যের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ নেই। বিদায় হজ্জের সময় নাযিলকৃত সে আয়াতে বলা হয়েছে, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম।"

৩ সূরা আল ইসরা (১৭): ১০৬।

ভেঙ্গে দেয়ার জন্য সম্ভাব্য সকল পন্থা অবলম্বন করেছিল। তাই তাঁর শত্রুদের উৎপীড়ন অসহনীয় হয়ে উঠলে আল্লাহ নবী ﷺ-কে সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যে কিছু আয়াত নাযিল করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾

"আর অবিশ্বাসীরা বলে, 'তাঁর নিকট গোটা কুরআন একবারে নাযিল হয়নি কেন?' এমনটি করার কারণ হলো, যেন এর দ্বারা আমি তোমার অন্তরকে দৃঢ় ও অবিচল করে দিতে পারি; আর আমি এ কিতাবের বিভিন্ন অংশকে সুশৃংখল ও পূর্বাপর সম্পর্কিত পদ্ধতিতে সুবিন্যস্ত করে দিয়েছি।"[১]

পূর্বের নবীদের বিভিন্ন পরীক্ষা ও পরিশেষে তাঁদের সফলতার বিভিন্ন ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনাও দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ:

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ۚ

"তোমার পূর্বের নবীদেরকেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার সাহায্য আসার আগ পর্যন্ত তাঁরা ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।"[২]

অনেক সময় আল্লাহ তাঁকে সাহায্য ও বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিতেন:

وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿٣﴾

"আর আল্লাহ তোমাকে একটি বিশাল বিজয় দিয়ে সাহায্য করবেন।"[৩]

কিংবা আল্লাহ তাঁকে তাঁর শত্রুদের অবশ্যম্ভাবী পরাজয় সম্পর্কে অবহিত করতেন:

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾

---

১ সূরা আল ফুরকান (২৫): ৩২।
২ সূরা আল আনআম (৬): ৩৪।
৩ সূরা আল ফাতহ (৪৮): ৩।

"কাফেরদেরকে বলে দাও, 'তোমরা অচিরেই পরাজয় বরণ করবে আর তোমাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে—যা আবাসস্থল হিসেবে খুবই নিকৃষ্ট'।"[১]

উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, নবুওতের দায়িত্ব পালনের বিভিন্ন পর্যায়ে নবী ﷺ-কে সান্ত্বনা প্রদান, দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির লক্ষ্যে আল্লাহ অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন—যাতে তিনি ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতে পারেন।

২. নবী ﷺ এর প্রতি দয়া পরবশ হওয়া

নবী ﷺ এর উপর ওহী নাযিলের প্রক্রিয়াটি তাঁর জন্য ছিল এমন কষ্টকর একটি বিষয় যা নবী ﷺ-কে দুর্বল করে দিত। আয়েশা ﵂ বর্ণনা করেন যে, একবার তীব্র শীতের দিনে তিনি নবী ﷺ এর উপর ওহী নাযিল হতে দেখেছেন। আবহাওয়া ঠান্ডা হওয়া সত্ত্বেও ওহী নাযিল সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরছিল।[২] এমনকি আল্লাহ নিজেও কুরআনকে অত্যন্ত ভারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন:

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾

"আমি অচিরেই তোমার নিকট কিছু ভারী কথা নাযিল করবো।"[৩]

আল্লাহর কথার মাহাত্ম্য, তাৎপর্য, ক্ষমতা ও প্রভাবের উপর গুরুত্বারোপের লক্ষ্যে আল্লাহ নিম্নোক্ত উপমাটি পেশ করেছেন:

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ

"আমি যদি এ কুরআনকে একটি পর্বতের উপর নাযিল করতাম তাহলে তুমি এটিকে আল্লাহর ভয়ে বিনয়ের সাথে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখতে।"[৪]

---

১ সূরা আলে ইমরান (৩): ১২।

২ এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম বুখারী (সহীহুল বুখারী, খণ্ড ১, পৃঃ ২, নং ২)।

৩ সূরা আল মুযযাম্মিল (৭৩): ৫।

৪ সূরা আল হাশর (৫৯): ২১।

অতএব আল্লাহর সর্বশেষ গ্রন্থ আল কুরআন একবারে নাযিল হলে তা সহ্য করা নবী ﷺ এর জন্য অনেক কষ্টকর হয়ে যেতো,তাঁকে সাঙ্ঘাতিক চাপের মধ্যে ফেলে দিতো। তাই এ ওহীকে সহনীয় মাত্রায় ভাগ করে ধীরে ধীরে নাযিল করা হয়েছে; যেন চাপটা নবী ﷺ এর উপর অল্প সময়ের জন্য পড়ে এবং তা কাটিয়ে উঠতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন না হয়। সুতরাং, সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থের শক্তি, মহিমা ও প্রভাবের দিকটি বিবেচনায় রাখলে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, খণ্ড খণ্ড আকারে ওহী নাযিলের এ পদ্ধতি ছিল স্বীয় আখেরী নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার একটি দয়ার্দ্র আচরণ।

৩. আইন প্রণয়নে ক্রমধারা অবলম্বন

কুরআনে যে পদ্ধতিতে ইসলামের মূলনীতিসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে তা হলো অল্প অল্প করে পর্যায়ক্রমিকভাবে উপস্থাপন। একেবারে শুরুতে কিংবা কোনো এক স্তরে সকল নীতিমালাগুলোকে একসাথে নাযিল করে দেওয়া হয়নি। কুরআনের প্রথম দিকের সূরাগুলোতে প্রধানত আলোচনা করা হয়েছে শিরক সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে; কেননা এটাই হলো সে সমস্যা যা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও তাঁর একত্ববাদের সামনে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[১] তাই আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এসব মিথ্যা দেবতার ধারণাকে দূরীভূত করা ছিলো অতীব প্রয়োজনীয়। তাই, প্রথম দিকের সূরাসমূহে পুনরুত্থান ও বিচার দিবসসহ তাওহীদ [২] ও ঈমানের [৩] অন্যান্য প্রধান স্তম্ভের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ঈমানের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠার বারো বছর পর নবী ﷺ এর মি'রাজের সময় সালাত ফরজ করা হয়েছে।[৪] এ পর্যায়ে এসেই কুরআনের আয়াতে ঈমানদারদের জন্য সালাতের আবশ্যকতার উপর গুরুত্বারোপ শুরু হয়। হিজরতের দু'বছর পর সাওম ও

---

১ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করা।

২ আল্লাহর একত্ব ও এ বিষয়ের বিশ্বাস যে, তিনিই উপাসনা লাভের একমাত্র যোগ্য সত্তা।

৩ বিশ্বাস।

৪ দেখুন সহীহু মুসলিম, খণ্ড ১, পৃঃ ১০০-৩, নং ৩০৯। ইবনু হিশাম এমন কিছু বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যা থেকে জানা যায় যে, নবী (সা.) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ মাক্কী জীবনের শুরু থেকেই সালাত আদায় করতেন, তবে তা তখনো পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ছিল না ;আর ইমাম শাফেয়ী বলেছেন যে, প্রথম দিকে রাতে সালাত আদায় বাধ্যতামূলক ছিল – সূরা মুযযাম্মিলের প্রাথমিক আয়াতসমূহে যার ইঙ্গিত রয়েছে, তবে একই সূরার সর্বশেষ আয়াত এ বাধ্যবাধকতাকে রহিত করে দিয়েছে। দেখুন ফাতহুল বারী, খণ্ড ১, পৃঃ ৫৫৪ ও আর রাহীকুল মাখতুম, পৃঃ ৭৮।

যাকাত ফরজ সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।[১] পরিশেষে হিজরতের ছয় বছর পর কুরআনে হাজ্জ ফরজ করা হয়।[২]

আয়েশা ﵂ বলেন যে, কুরআনের ওহীতে সর্বপ্রথম যে বিষয়টির আলোচনা করা হয়েছে তা ছিল জান্নাত ও জাহান্নাম সংক্রান্ত এবং এর পরই কেবল বৈধ ও অবৈধ বিষয়াবলীর আলোচনা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, "প্রথমেই যদি 'মদ্য পান করো না' কিংবা 'ব্যভিচার করো না'—ইত্যাদি বিধান অবতীর্ণ করা হতো তাহলে তারা হয়তো বলতো, আমরা কখনো এগুলো ছাড়বো না।"[৩]

কুরআন যদি পুরোটা একসঙ্গো নাযিল হতো, তাহলে সহনীয় মাত্রায় আস্তে আস্তে যেভাবে আইন-কানুনসমূহ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে—তা সম্ভব হতো না। প্রথম প্রজন্মের যে মুসলিমদেরকে পরবর্তীতে পৃথিবী জুড়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল, তাদেরকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে তোলার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিটি ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর। আর ইসলামের মৌলিক নীতিমালাসমূহের সুস্পষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিহার্য। কারণ, পরবর্তী প্রজন্মের সকল মুসলিমদেরকেই ইসলামী বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে তাদের ব্যাখ্যা ও অনুশীলন পদ্ধতির উপরই নির্ভর করতে হয়েছে।

৪. কুরআন সংরক্ষণের সুব্যবস্থা

নবী ﷺ এর অধিকাংশ সাহাবী পড়তে ও লিখতে অক্ষম হওয়ায় মুখস্থকরণ প্রক্রিয়াই হয়ে দাঁড়ায় কুরআন সংরক্ষণের প্রধান পদ্ধতি। অতএব, কুরআন যদি পুরোটা একসাথে নাযিল হতো, তাহলে সুদীর্ঘ পরিসরের হওয়ার কারণে তাঁরা গোটা কুরআন মুখস্থ করতে সক্ষম হতেন না। এমনকি একসঙ্গো নাযিল হলে, যে ক'জন লিখতে পারতেন তাঁরাও সেসময় লিখন সামগ্রীর

---

১ মাক্কী আয়াতগুলোতেও (উদাহরণস্বরূপ, ৩০:৩৮-৯, ২৭: ১-৩, ৩১: ৪, ৪১: ৬-৭) যাকাতের উল্লেখ আছে, তবে সেসময় মুসলিমরা রাষ্ট্রহীন অবস্থায় থাকায় যাকাত প্রদানের দায়িত্ব ব্যক্তির উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। প্রত্যেক প্রকার সম্পদের উপর কী পরিমাণ যাকাত প্রদান করতে হবে সে বিষয়ে ঐ সময় কোনো শর্ত বা বিধি-নিষেধ ছিল না। দেখুন ফিক্বহুয যাকাত, খণ্ড ১, পৃঃ ৫২-৬১। আরো দেখুন যাদুল মা'আদ, খণ্ড ২, পৃঃ ৩০।

২ দেখুন নাইলুল আওতার, খণ্ড ৪, পৃঃ ৩৩৭-৮।

৩ সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৪৮৩-৪, নং ৫১৫।

দুষ্প্রাপ্যতার ফলে সবটুকু লিপিবদ্ধ করতে পারতেন না। তাই পর্যায়ক্রমিক ধারায়, অল্প অল্প করে কুরআন নাযিল হওয়ার ফলে সাহাবীদের পক্ষে গোটা কুরআন মুখস্থ করা ও অন্যদেরকে তা শিক্ষা দেওয়া ছিলো সহজতর।

উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন, "একবারে কুরআনের পাঁচটি আয়াত শেখো, কারণ জিবরাঈলও নবী ﷺ এর নিকট একসঙ্গে কুরআনের পাঁচটি আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হতেন।"[১] অল্প অল্প করে নাযিলের ফলে ওহী লেখকদের জন্যও নবী ﷺ এর জীবদ্দশায় কুরআনের সবটুকু লিপিবদ্ধ করা সহজ হয়ে যায়।

ইসলামের শিক্ষাসমূহের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য কুরআন সংরক্ষণ ছিল খুবই জরুরী। কারণ পূর্বের আসমানী গ্রন্থসমূহ বিকৃত করে ফেলার কারণেই সেগুলোর অনুসারীরা পরবর্তীতে বিপথগামী হয়েছে।

ধীরে ধীরে কুরআন নাযিলের কারণে সাহাবায়ে কেরামগণ আয়াতের মর্মার্থ গভীরভাবে উপলব্ধি করার এক বিশাল সুযোগ লাভ করেন। কোনো আয়াত নাযিল হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁরা নবী ﷺ এর কাছ থেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য প্রশ্ন করতেন; একাধিক সম্ভাব্য ব্যাখ্যার কোনটি সঠিক তা নবী ﷺ এর মাধ্যমে যাচাই করার সুযোগ লাভ করেন। এ প্রক্রিয়ায় সাহাবায়ে কেরামগণ সত্যিকার অর্থে কুরআনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হন। এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কারণ, কুরআনের নীতিমালাগুলোকে তাঁরা যেভাবে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করেছেন, তা পরবর্তী সকল প্রজন্মের মুসলমানদের জন্য চির অনুসরণীয় পথনির্দেশিকায় পরিণত হয়েছে। সমগ্র কুরআন একসাথে নাযিল হলে কুরআনের এমন গভীর জ্ঞান অর্জন করতে তারা সক্ষম হতেন না।

৫. সমসাময়িক সমস্যাদির মোকাবেলা

প্রায়শ কুরআনের আয়াত নাযিল হতো সুনির্দিষ্টভাবে সেসব সমস্যা সমাধানের জন্য যা নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীদেরকে সে সময় মোকাবেলা করতে হতো। মাঝেমধ্যে লোকজন নবী ﷺ-কে এমন অনেক প্রশ্ন করতো যে ব্যাপারে

১ এ হাদীসটি বাইহাকী শুআবুল ঈমান গ্রন্থে সংগ্রহ করেছেন এবং সুয়ূতী আল ইতকান গ্রন্থে (খণ্ড ১, পৃঃ ১২৪-৫) উদ্ধৃত করেছেন। তবে সুয়ূতী উল্লেখ করেছেন যে, এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, মাঝেমধ্যে একবারে দশটি আয়াত, আবার কখনো কখনো আয়াতের একটি অংশবিশেষও নাযিল হয়েছিল।

তাঁর জানা নেই; ফলে আল্লাহ সেসবের উত্তর নাযিল করতেন। যেমন, ইহূদীরা পরীক্ষা করার জন্য নবী ﷺ-কে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পরিপ্রেক্ষিতে সে ঘটনা সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا۟ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾

"তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, আমি অচিরেই তার একটি বিবরণ তোমাদেরকে পাঠ করে শোনাবো।"[১]

স্বয়ং নবী ﷺ কোনো ভুল করে ফেললে তা সংশোধন করে দেয়ার উদ্দেশ্যে অনেক সময় ওহী নাযিল হতো। সূরা আত তাওবায় এ সংক্রান্ত একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে—যেখানে মহান আল্লাহ নবী ﷺ-কে বলেছেন:

عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَتَعْلَمَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٤٣﴾

"আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন।[২] কে সত্য কথা বলছে আর কে মিথ্যাবাদী—তা তোমার সামনে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়ার পূর্বে তুমি তাদেরকে (ঘরে থাকার) অনুমতি দিয়েছো কেন?"[৩]

বিশিষ্ট তাফসীর বিশারদ মুজাহিদ বলেন, "এ আয়াত নাযিল হয়েছে সেসব লোকের উদ্দেশে যারা অন্যদেরকে এ মর্মে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল—তোমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ এর নিকট আবেদন করো, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেন। তিনি অনুমতি দিলেও তোমরা ঘরে বসে থাকো, না দিলেও (যে কোনো বাহানায়) ঘরে থাকো।"

ইমাম ইবনু কাসীর বলেছেন, "মহান আল্লাহ বলছেন, তাদের কাউকে পেছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া তোমার উচিত হয়নি। কারণ, অনুমতি না দিলে তুমি জেনে নিতে পারতে কারা তোমার প্রতি আনুগত্যের দাবিতে

১ সূরা আল কাহ্ফ (১৮): ৮৩। দেখুন তাফসীরু ইবনি কাসীর, খণ্ড ৩, পৃঃ ১০৬।

২ মুহাম্মাদ আসাদ লিখেছেন, "সকল মুফাস্সির একমত যে, প্রার্থনার ভঙ্গিতে ব্যবহৃত হলেও এ শব্দগুচ্ছের সমার্থবোধক বাক্য হলো– 'আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দেন' কিংবা 'ক্ষমা করে দিয়েছেন'।" (দ্যা ম্যাসেজ অব দ্যা কুরআন, পৃঃ ২৬৬)।

৩ সূরা আত তাওবাহ (৯): ৪৩।

সত্যবাদী, আর কারা মিথ্যাবাদী। কারণ, পেছনে থেকে যাওয়ার ব্যাপারে তারা ছিল অনড়।"[১]

তৎকালীন মুসলিমদের নানা ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব সংশোধনের উদ্দেশ্যেও কুরআনের বিভিন্ন আয়াত নাযিল হয়েছে। এ ধরনের ওহীর একটি দৃষ্টান্ত হলো হুনাইন যুদ্ধের ঘটনা। এ যুদ্ধের সময় অনেক মুসলিমরা ভেবেছিলো যে, তাদের সংখ্যা যেহেতু শত্রুবাহিনীর সংখ্যার চেয়ে বহুগুণে বেশী, তাই তাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। সে যুদ্ধে শত্রুবাহিনী আকস্মিক হামলা করে অনেকটা পরাজিত করে তাদেরকে পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য করে। তবে, প্রথম পর্যায়ে আল্লাহ তাদেরকে এ শিক্ষা দেওয়ার পর শত্রুবাহিনীর উপর ঠিকই বিজয় দান করেন। তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন:

وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ

"আর হুনাইনের দিন—যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে চমকে দিয়েছিল, অথচ তা তোমাদের কোনো উপকারে আসেনি এবং পৃথিবীর বিশালত্ব সত্ত্বেও তা তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে আসলো, অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে।" [২]

কুরআন নাযিলের সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার ব্যাপারে কুরআনে আলোচনা এসেছে। কারণ, এ উপায়ে ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট কুরআন অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়। ভুল হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সংশোধন করে দেওয়া হলে তা অপ্রাসঙ্গিক উপদেশের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর হয়। সমগ্র কুরআন একসাথে নাযিল হলে এসব সমস্যার প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে সমাধান দেওয়া সম্ভব হতো না।

৬. কুরআনের উৎস সম্পর্কে একটি ইঙ্গিত

তেইশ বছর ধরে খণ্ড খণ্ড আকারে কুরআন নাযিল হওয়ার ঘটনা একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, এটি মহান আল্লাহর বাণী; নবী মুহাম্মাদ ﷺ

---

১ দেখুন তাফসীরু ইবনি কাসীর, খণ্ড ২, পৃঃ ৩৭৫।

২ সূরা আত তাওবাহ (৯): ২৫।

কিংবা সৃষ্টিজগতের অন্য কারও রচনা নয়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি বক্তব্যের মধ্যে যে সঙ্গাতি ও সাযুজ্য রয়েছে তা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এ গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এর একশ' চৌদ্দটি সূরার প্রতিটিতেই যেন গেঁথে আছে। সূরাসমূহকে দেখলে মনে হবে যেন এগুলো একটি একক মালার অনেকগুলো অবিচ্ছেদ্য মুক্তার মতো পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। বিষয়বস্তু ও বাক্যকাঠামোর বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এক অনন্য রীতি অনুসরণ করে কুরআনের অন্তমিল ও ছন্দ এর প্রত্যেকটি আয়াতে অপ্রতিরোধ্য গতিতে প্রবাহিত হয়েছে। শুরু থেকেই সমগ্র কুরআন বিদ্যমান না থাকলে এ ধরনের সঙ্গাতি বজায় রাখা কি সম্ভব? কুরআনের একেক অংশ যেখানে বিভিন্ন পর্যায়ে সংঘটিত ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করে, সেখানে এমন সঙ্গাতি বজায় রাখা কি কোনোক্রমেই সম্ভব? এ কুরআন কীভাবে এমন এক ব্যক্তির রচনা হতে পারে যিনি নিজে একেবারেই লিখতে ও পড়তে জানতেন না। তাছাড়া দিনে দিনে শ্রেষ্ঠতম লেখকদের রচনাশৈলীতেও নানারকম অসঙ্গাতি কিংবা পরিবর্তন আসে; অথচ কুরআন দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে বিভিন্ন পরিচ্ছেদ আকারে নাযিল হওয়া সত্ত্বেও এর রচনাশৈলীতে সামান্যতম কোনো তারতম্য সৃষ্টি হয়নি। এ বিষয়টিও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ বহন করে যে, এর উৎস এ পৃথিবীর কোথাও নয়। এর উৎস অবশ্যই বিশ্বজাহানের মহান প্রভু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। কুরআনে আল্লাহ এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

"তারা কি কুরআন নিয়ে ভেবে দেখে না? যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে (রচিত) হতো, তাহলে তারা এতে অনেক অসঙ্গাতি বা পরস্পরবিরোধী মতামত দেখতে পেতো!"[১]

নবী ﷺ এর নিকট কোনো নতুন ওহী আসা মাত্রই তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে তা ইতিপূর্বে অবতীর্ণ আয়াতের আগে কিংবা পরে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিতেন। ভবিষ্যতে তাঁকে কোন ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে

---

১ সূরা আন নিসা (৪): ৮২।

কিংবা তিনি কতদিন বেঁচে থাকবেন—এসব ব্যাপারে নবী ﷺ এর কোনো ধারণাই ছিল না। তাঁর জীবনে বিচিত্র রকমের ঘটনা ঘটেছে; যার কারণে তাঁর মানসিক অবস্থা ও বাচন-ভঙ্গীর পরিবর্তন ছিলো খুবই স্বাভাবিক। অথচ কুরআনে এসবের কোনো ছাপ পড়েনি। সব শেষে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যেতে পারে যে, কুরআন কিছুতেই মুহাম্মাদ ﷺ এর রচনা নয়; আর তা স্বয়ং কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত।

পর্যায়ক্রমিক ওহীর শিক্ষাগত সুবিধা

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কী প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হবে তা নির্ভর করে দু'টি বিষয়ের উপর:

(১) শিক্ষার্থীদের মানসিক স্তর বিবেচনায় রাখা,

(২) এমন উপায়ে তাদের উন্নতি সাধন করা যা তাদের চিন্তাধারাকে সঠিক দিকে ধাবিত করে।

পর্যায়ক্রমিক কুরআন নাযিলের প্রক্রিয়ায় এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির উভয়টিকেই সযত্ন বিবেচনায় রাখা হয়েছে। আইন প্রণয়নে ক্রমধারা অবলম্বনের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলিম সমাজের বিকাশ লাভের স্তরকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির শুদ্ধিকরণ ও বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত আয়াত সঠিক সময়ে নাযিল করার মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক দিকে পরিচালিত করা হয়েছে।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাহলে পূর্বের আসমানী গ্রন্থসমূহ একসাথে নাযিল হয়েছিলো কেন? পূর্বেকার গ্রন্থাবলীর ভূমিকা ও নুবুওয়্যাতের ইতিহাসের মধ্যেই এ প্রশ্নের জবাব নিহিত রয়েছে। এটা সকলেরই জানা যে, পূর্বেকার গ্রন্থাবলী নাযিল হয়েছিল একটা নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট জাতি কিংবা গোত্রের জন্য। সেসব গ্রন্থের মূলনীতিসমূহ কোনো সময় কিংবা ঘটনাকেন্দ্রিক ছিল না, আর সে কারণে পুরোটা একসাথে নাযিল করা সম্ভব হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, পূর্বেকার গ্রন্থসমূহ নিজ গুণে কোনো অলৌকিক বিষয় ছিল না; পক্ষান্তরে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর ক্ষেত্রে কুরআন

হলো সর্বপ্রধান মু'জিযা। খণ্ডে খণ্ডে নাযিল হওয়ার বিষয়টির সাথে এর রচনাশৈলীর সঙ্গতিকে মিলিয়ে দেখলেও এ গ্রন্থের ঐশী উৎসের প্রমাণ পাওয়া যাবে। তাছাড়া পূর্বেকার কোনো নবী শেষ নবী ছিলেন না, তাদের প্রত্যেকের আগে ও পরেও নবী এসেছেন। তাই প্রত্যেক নবী ও তাঁর গ্রন্থ সামগ্রিক ওহীর একটি অংশবিশেষের প্রতিনিধিত্ব করে মাত্র। তাঁদের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নে ক্রমধারা অবলম্বন করা হয়েছে প্রত্যেক নবীকে কিছু কিছু নতুন ওহী প্রদান করার মাধ্যমে। নবী মুহাম্মাদ ﷺ হলেন সর্বশেষ নবী। তাঁর উপর অবতীর্ণ গ্রন্থে পূর্বের সকল গ্রন্থের মৌলিক বাণী বিদ্যমান রয়েছে। সে কারণে পৃথিবীর সর্বত্র এ চূড়ান্ত বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য তাঁর অনুসারীদেরকে যথোচিত প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল। এ কারণে একই গ্রন্থের মধ্যেই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি ক্রমধারা বজায় রাখা ছিলো অত্যন্ত জরুরী।

৭

কুরআন সঙ্কলন

নবী ﷺ এর যুগ: ৬০৯-৬৩২ 'ঈসায়ী

নবী ﷺ এর নিকট তাঁর নবুওত জীবনের তেইশ বছর ধরে খণ্ড খণ্ড আকারে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। যখনই কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে কিংবা যখনই নবী ﷺ ও তাঁর অনুসারীদেরকে আল্লাহ বিশেষ কোনো উপদেশ দিতে চেয়েছেন—তখনই তিনি জিবরাঈল عليه السلام-কে কুরআনের একটি অংশ দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। জিবরাঈল عليه السلام এসে তা নবী ﷺ-কে পাঠ করে শোনাতেন। এ প্রক্রিয়ায় পূর্বেকার আসমানী গ্রন্থসমূহের মতো গোটা কুরআন একবারে নাযিল হয়নি; বরং তা দীর্ঘ সময় ধরে খণ্ড খণ্ড আকারে নাযিল হয়েছে।

কুরআন সংরক্ষণ

নবী ﷺ এর নিকট জিবরাঈল عليه السلام যখন সর্বপ্রথম কুরআনের একটি অংশ পাঠ করে শোনালেন, তখন তিনি তাঁকে শব্দে শব্দে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীতে জিবরাঈলের মাধ্যমে তাঁকে এমনটি না করে মনোযোগ সহকারে কুরআন শ্রবণ করার নির্দেশ দেন; এবং আল্লাহ তাঁকে অনায়াসে সবকিছু মনে রাখার শক্তি প্রদান করলেন। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ
قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾

" তুমি তাড়াহুড়ো করে কুরআন মুখস্থ করার জন্য তোমার জিহ্বা নাড়িও না। তা সংরক্ষণ ও পাঠ করে শুনিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তো আমারই। অতএব, আমি যখন তা পাঠ করি, তুমি (শান্ত মনে) এর পাঠকে অনুসরণ করো।"[১]

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নবী ﷺ এর নিকট যা কিছু নাযিল হয়েছে তিনি তা সবই মনে রেখেছেন। কারণ তিনি পড়তেও পারতেন না, লিখতেও পারতেন না।

নবী ﷺ তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে কুরআনের সবটুকু তাঁর সাহাবিদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি কুরআনকে যেভাবে শিখেছেন তাঁরা যেন হুবহু সেভাবেই মুখস্থ ও লিপিবদ্ধ করে রাখে, তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি বেশ কয়েকটি স্বতন্ত্র পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন:

১. সালাতের জামা'আতে নবী ﷺ কুরআনের বিভিন্ন অংশ সশব্দে তিলাওয়াত করতেন। এর মাধ্যমে তাঁর অনুসারীরা প্রতিদিন কুরআনের বিভিন্ন অংশ শ্রবণ করতেন।[২]

২. ইসলামে নবদীক্ষিত ব্যক্তিকে কুরআনের বিভিন্ন অংশ শেখানো হতো, যাতে তারা তা নিজেরাও সালাতে পাঠ করতে পারেন। এভাবে মুসলিমরা সবসময়ই কুরআনের বিভিন্ন অংশ শিখতে কিংবা শেখাতে থাকেন।

৩. নবী ﷺ বলেছেন যে, "সে-ই সর্বোত্তম ব্যক্তি—যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে তা শেখায়।" এ বাণী তাদেরকে কুরআন শিখতে ও শেখাতে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করে।

৪. লেখাপড়া জানা সাহাবীদের মধ্য থেকে নবী ﷺ একটি চৌকশ টিম গঠন করেছিলেন। কুরআনের কোনো অংশ নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে তিনি তা লিখে ফেলার নির্দেশ দিতেন। কোন আয়াতের পর কোন আয়াত, কোন সূরার পর কোন সূরা লিপিবদ্ধ করতে হবে—তা নবী ﷺ তাঁদেরকে বলে দিতেন। বারা ইবনু আযিব رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে, যখন "ঘরে বসে থাকা ঈমানদাররা আল্লাহর পথে জিহাদরতদের সমতুল্য নয়" – শীর্ষক আয়াত

---

১ সূরা আল কিয়ামাহ (৭৫): ১৬-১৮।

২ উম্মু হিশাম বিনতু হারিসাহ বর্ণনা করেছেন যে, শুক্রবারে খুতবার সময় নবী (সা.) এর তিলাওয়াত শুনে শুনেই তিনি সূরা কাহ্ফ মুখস্থ করে ফেলেছেন। (সহীহু মুসলিম, খণ্ড ২, পৃঃ ৪১২, নং ১৮৯৩-৪)

নাযিল হলো, তখন নবী ﷺ বললেন, "অমুক এবং অমুককে ডাকো।" তিনি একটি কালির পাত্র ও কাষ্ঠ ফলক কিংবা কোনো পশুর কাঁধের একটি হাড় নিয়ে আসলেন। নবী ﷺ বললেন, "লিখে রাখো—ঘরে বসে থাকা ঈমানদাররা আল্লাহর পথে জিহাদরতদের সমতুল্য নয়।"[১]

সে সময় আরবে কোনো কাগজ সহজলভ্য না থাকায়, লেখার মতো যা কিছু পাওয়া যেতো তার উপরই কুরআন লেখা হতো। সাহাবীরা কুরআনের আয়াত খেজুর পাতা, মসৃণ পাথর, গাছের ছাল, কাঠ, জন্তুর শুকনো চামড়া ও ভেড়া কিংবা উটের কাঁধের চওড়া হাড়ে লিখে রাখতেন। এভাবে নবী ﷺ এর জীবদ্দশায়ই গোটা কুরআন মুসলিমদের দ্বারা মুখস্থ করে নেওয়ার পাশাপাশি লিখিত আকারেও তা সংরক্ষিত হয়ে গিয়েছিল। সাহাবীদের একেকজন যেহেতু একেক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, সেহেতু তাঁদের অল্প কয়েকজনই সরাসরি নবী ﷺ এর মুখ থেকে পুরো কুরআন শুনতে পেরেছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই কারও মুখস্থ ও স্মৃতিশক্তি ছিল অন্যদের তুলনায় ভালো। তাই তাঁদের সকলেই নবী ﷺ এর জীবদ্দশায় পুরো কুরআন মুখস্থ করতে সক্ষম না হলেও অনেক সাহাবীই কুরআনের বিভিন্ন স্থান থেকে ব্যপক অংশ মুখস্ত করেছিলেন।

৬৩২ 'ঈসায়ী সনে নবী ﷺ এর ইন্তেকালের সময় সমগ্র কুরআন একটি একক গ্রন্থ আকারে সংকলিত না হলেও তা বিভিন্ন ধরনের লিখন সামগ্রীতে লিপিবদ্ধ করে নবী ﷺ এর সাহাবীদের হেফাজতে রেখে দেয়া হয়েছিল। এসব লিখন সামগ্রীর একেকটিতে কুরআনের একেক অংশ লিপিবদ্ধ ছিলো। নবী ﷺ এর মৃত্যুর কয়েক মাস আগ পর্যন্ত কুরআনের আয়াত নাযিল অব্যাহত থাকায় সব আয়াত একত্রিত করে একটি গ্রন্থ প্রস্তুত করার তুলনায় সেগুলো মুখস্থ ও লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামগণ ছিলেন অধিক সচেষ্ট। ফলশ্রুতিতে নবী ﷺ এর জীবদ্দশায় কুরআনকে একটি একক গ্রন্থের রূপ দেয়া হয়নি।

১ সূরা আন নিসা (৪): ৯৫। এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম বুখারী।

আবু বকর ﷺ এর শাসনামল: ১১-১৩ হিঃ/৬৩২-৬৩৪ ‘ঈসায়ী

নবী ﷺ এর ইন্তেকালের পর আরব উপদ্বীপে ইসলামের মোকাবেলায় তিনটি দলের উত্থান ঘটে:

১. প্রথম দলটি ছিলো যাকাত অস্বীকারকারীদের। তারা নবী ﷺ এর ইন্তেকালের পর অন্য কারো নিকট যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তাদের মধ্যে এ বুঝ ছিল না যে, সালাত, সাওম ও হজ্জের মতো যাকাতও ইসলামের একটি স্তম্ভ। তারা যাকাতকে মনে করেছিল এক প্রকার জোরপূর্বক করের মতো— যা বিজিতরা বিজেতাদেরকে প্রদান করে থাকে। তাই নবী ﷺ এর ইন্তেকালে তারা ধরে নেয় যে, তাদেরকে আর এ ধরনের কর দিতে হবে না। আবু বকর ﷺ এর উপর মুসলিম রাষ্ট্রের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার পর এ দলটি যাকাত দিতে অস্বীকার করে এবং মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তারা যাকাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার দাবী জানায়; অন্যথায় আক্রমণ করে ইসলামের কেন্দ্রসমূহ ধ্বংস করে দেয়ার হুমকি দেয়। [১]

২. প্রথম দলের সাথে যুক্ত হয় সেসব লোক যারা পরাজয় এড়াতে কেবল বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণের ভান করেছিল; বিজয়ী দলের সাথে থেকে সুবিধা লাভই ছিলো তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ দলটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অন্তর থেকে মোটেই বিশ্বাস স্থাপন করেনি। সুযোগ বুঝে এবার তারা ইসলামকে ধ্বংস করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। যাকাত অস্বীকারকারী সেনাবাহিনীর সংখ্যাধিক্য দেখেও এসব মুনাফিকদের অনেকে তাদের সাথে যোগ দেয়।

৩. তৃতীয় দলটি গড়ে ওঠে কিছু ভণ্ড নবী দাবীদার ও তাদের অনুসারীদের নিয়ে। নজদের ইয়ামামা অঞ্চলে বনু হানীফাহ গোত্রের মুসাইলামাহ নামক এক আরব নুবুওয়্যাতের দাবী করে বসে। একই সাথে আরবের দক্ষিণাংশে আন্‌স গোত্রের আসওয়াদ নামক আরেক ব্যক্তি নুবুওয়্যাতের দাবী করে নাজরান ও ইয়েমেন দখল করে নেয়। উত্তর আরবে বনু তামীম গোত্রের সাযাহ নামক এক মহিলাও নুবুওয়্যাতের দাবী করে মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে

১ দেখুন আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ৬, পৃঃ ৩৮০।

সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে।[১] এসব ভণ্ড নবীর সকলেই লোকদেরকে ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দেয়ার আহ্বান জানায়। তাদের দাবী—আল্লাহ তাদের নিকট নতুন ধর্মবিধান নাযিল করেছেন, যেখানে নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর মাধ্যমে আল্লাহ যেসব জিনিস নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন সেগুলোর অধিকাংশ বিষয়ের বৈধতা দেয়া হয়েছে।

আরব উপদ্বীপের সর্বত্র ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সত্যিকার মুসলিমরা খলিফা আবু বকরের নেতৃত্বে এ তিন দলের সাথে লড়াই করতে বাধ্য হন।

প্রথম লিপিবদ্ধ কুরআন

ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এসব যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে 'রিদ্দাহ'র যুদ্ধ' বা ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। এসব যুদ্ধে এমন অসংখ্য সাহাবী নিহত হন যারা ছিলেন কুরআনের হাফিজ।[২] যেসব মুসলিমের বুকে কুরআন সংরক্ষিত ছিল তারা ভালো করেই জানতেন যে, যারা ইসলামের বিজয়ের জন্য লড়াই করে আল্লাহ তাদের জন্য কী পুরস্কার বরাদ্দ রেখেছেন! সে কারণে তারা সবসময় সকল যুদ্ধের সম্মুখভাগে অংশগ্রহণ করতেন।

'উমার ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, কুরআনের লিখিত কপি সংরক্ষণ করা এখন অতি জরুরী; এখনই সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে কুরআন পৌছে দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে। তিনি খলিফা আবু বকরের নিকট হাজির হয়ে সমগ্র কুরআনকে একটি একক গ্রন্থের আকারে লিপিবদ্ধ করার পরামর্শ দেন। প্রথমে আবু বকর رضي الله عنه তা করতে অস্বীকৃতি জানান; কারণ নবী ﷺ তাকে এমন কিছু করার কোনো নির্দেশ দান করেননি। তিনি দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু (বিদ'আত) যোগ করার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে ভয় পাচ্ছিলেন। কারণ নবী ﷺ তাদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে

১ দেখুন আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ৬, পৃঃ ৩৭৬-৯, ৩৯১-৩।
২ দেখুন সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৪৭৭, নং ৫০৯।

দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে, তাঁদের পূর্বে খ্রিস্টানরা নবী 'ঈসা ﷺ এর আনীত দ্বীনকে তাঁর অন্তর্ধানের পর পরিবর্তন করার মাধ্যমে বিপথগামী হয়েছিল। সে কারণে নবী মুহাম্মাদ ﷺ দ্বীনকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছেন, আবু বকর ﷺ ছিলেন তার মধ্যে কোনো রকম পরিবর্তন সাধনের ঘোর বিরোধী। তবে পুরো পরিস্থিতি সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে তিনি অনুধাবন করেন যে, 'উমারের পরামর্শ সঠিক এবং তা প্রকৃত অর্থে দ্বীনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধনের সমার্থক নয়। কুরআন নাযিল হওয়ার সময় তা সংরক্ষণ করার সুবিধার্থে নবী ﷺ তাদের কয়েকজনকে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও সূরা লিখে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিক্ষিপ্তভাবে লিখিত অংশগুলোকে একত্রিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ আকারে সঙ্কলন করা হলে তা হবে নবী ﷺ এরই শুরু করে যাওয়া কাজের পূর্ণতা দান করা মাত্র।

খলিফা আবু বকর ﷺ যাইদ ইবনু সাবিত ﷺ-কে সমগ্র কুরআনের বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকে একত্রিত করে একটি একক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব প্রদান করেন। আবু বকরের মতো একই কারণ দেখিয়ে যাইদ ইবনু সাবিতও প্রথম দিকে এ কাজ করতে অস্বীকৃতি জানান; তবে কিছুদিন পর তিনি নিজেও উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, কুরআন সঙ্কলনের এ কাজটি এখন একটি সময়োপযোগী কাজ।[১] নিম্নোক্ত কারণসমূহকে সামনে রেখে এ কাজের জন্য যাইদকে বাছাই করা হয়:

১. তিনি ছিলেন সর্বোত্তম কুরআন পাঠকদের অন্যতম।[২]

২. তিনি ছিলেন সেই অল্প কয়েকজন ব্যক্তির একজন যারা নবী ﷺ এর জীবদ্দশায় সমগ্র কুরআন মুখস্থ করেছিলেন।[৩]

৩. তিনি ছিলেন সেসব সাহাবীর অন্যতম যাদেরকে নবী ﷺ কুরআন লিখে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৪]

---

১ দেখুন সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৪৭৭-৮, নং ৫০৯।
২ দেখুন আল ইতকান, খণ্ড ১, পৃঃ ১৯৯।
৩ সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৪৮৮, নং ৫২৫।
৪ সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৯৪-৯৫, নং ১১৬-৭।

৪. নবী ﷺ জীবনের সর্বশেষ রামাদান মাসে সমগ্র কুরআন তিলাওয়াত করেছিলেন। আর যাইদ ছিলেন সেই অল্প কয়েকজন ব্যক্তির অন্যতম যারা সেই বরকতময় তিলাওয়াতের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।[১]

যত ধরনের সামগ্রীর উপর কুরআনের আয়াত লিখে রাখা হয়েছিলো তার সবগুলো সংগ্রহ করার মাধ্যমে যাইদ কুরআন সঙ্কলনের এ প্রক্রিয়া শুরু করেন। তারপর তিনি সেসব লোককেও তাঁর পাশে জড়ো করেন যারা সমগ্র কুরআন কিংবা তার বৃহদংশ মুখস্থ করেছিলেন। তারপর তিনি লিখিত বাক্যসমূহকে তাদের মুখস্থ করা আয়াতের সাথে মিলিয়ে দেখেন। সকলে একমত হলে তিনি তা চামড়ার উপরে লিখে ফেলতেন।[২] এই প্রক্রিয়ায় প্রথম খলিফার শাসনামলে সমগ্র কুরআন লিখিত হয়ে যায়। কাজটি সম্পন্ন করে যাইদ রাঃ তা খলিফা আবু বকরের নিকট হস্তান্তর করেন। আর আবু বকর রাঃ নিজের ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত তা নিজের সংরক্ষণে রেখে দিয়েছিলেন।

ইন্তেকালের পূর্বে আবু বকর রাঃ কুরআনের লিখিত কপিটি 'উমার রাঃ এর নিকট হস্তান্তর করেন, যাকে তিনি তার পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। এর দশ বছর পর আবু লু'লু' নামক আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত 'উমার রাঃ কুরআনের ঐ কপিটি নিজের কাছে সংরক্ষণ করে রাখেন।[৩] অতঃপর কুরআনের সে কপিটি তার মেয়ে হাফসার নিকট হস্তান্তর করা হয়, যিনি ছিলেন নবী ﷺ এর অন্যতম স্ত্রী। হাফসা রাঃ সেটি তার মদীনার ঘরে সংরক্ষণ করে রাখেন; তবে যারা তা থেকে কপি করতে কিংবা মুখস্থকৃত অংশের বিশুদ্ধতা যাচাই করতে চাইতো তিনি তাদেরকে তা করতে দিতেন।[৪]

---

১ জালালুদ্দীন সুয়ূতী এই মর্মে বাগাবীর শারহুস সুন্নাহ গ্রন্থে উল্লিখিত একটি বক্তব্যের উদ্ধৃতির পাশাপাশি ইবনু সীরিনের একটি মত উল্লেখ করেছেন যা থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইবনু আবী শাইবাহ তাঁর কিতাবুল মাছাহিফ গ্রন্থে এটি সংগ্রহ করেছেন। দেখুন আল ইতকান, খণ্ড ১, পৃঃ ১৪২।

২ দেখুন সহীহু সুনানিত তিরমিযী, খণ্ড ৩, পৃঃ ৫৯, নং ২৪৭৯।

৩ দেখুন আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ৭, পৃঃ ১৬৬।

৪ সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৬৩-৪, নং ২০১।

কুরআন লিপিবদ্ধ করার দ্বিতীয় পর্যায়

মুসলিম প্রদেশসমূহে কতিপয় আরব এ মর্মে অহঙ্কার বোধ করতে লাগলো যে, তাদের গোত্রীয় ভাষা অন্যদের ভাষার তুলনায় শ্রেষ্ঠ। আবার নবদীক্ষিত মুসলিমরা কুরআন পাঠ করতে গিয়ে কোনো রকম ভুলত্রুটি করে ফেললে, তাদের পাঠ আসলে ভুল না কি তা সাত ধরনের পঠনরীতির একটি—যা নবী ﷺ শিখিয়েছিলেন—এ মর্মে সিদ্ধান্ত দেয়াও মাঝেমধ্যে কঠিন হয়ে পড়তো। এসব কারণে আরবের বাইরের মুসলিম প্রদেশসমূহে এসব সমস্যা বিভিন্ন রকম সংশয়ের একটি উৎসে পরিণত হয়। হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান ؓ ইরাকে অবস্থানকালে এ সংশয় দেখতে পেয়ে এ মর্মে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন যে, এ অবস্থা চলতে থাকলে তা মুসলিম জাতিকে বিভক্তির দিকে আর কুরআনকে রদবদলের দিকে ঠেলে দিতে পারে। রাজধানীতে ফিরে এসে তিনি খলিফা উসমান ؓ-কে পুরো পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। খলিফা সামগ্রিক পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং সমস্যাটির একটি স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করার লক্ষ্যে প্রধান সাহাবীদের একটি অধিবেশন ডাকেন। তারা খলিফা আবু বকরের শাসনামলে সঙ্কলিত কুরআন থেকে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে কয়েকটি অনুলিপি প্রস্তুত করে জনগণকে কেবল সে অনুযায়ী তিলাওয়াতের মধ্যে সীমিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উসমান ؓ হাফসা ؓ-কে কুরআনের মূল কপিটি দিতে বলেন এবং যাইদ ইবনু সাবিতকে চারজন কুরআন বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত একটি পর্ষদের প্রধান নিযুক্ত করেন; এ পর্ষদের দায়িত্ব ছিল কুরআনের রাষ্ট্রীয় অনুলিপি প্রস্তুত করা।[১]

অনুলিপি প্রস্তুত করার কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর মূল কপিটি আবার হাফসার নিকট ফেরত পাঠানো হয়। মোট সাতটি অনুলিপি প্রস্তুত করা হয়। তন্মধ্যে মক্কা, সিরিয়া, বসরা, কুফাহ, ইয়েমেন ও বাহরাইনে একটি করে অনুলিপি পাঠানো হয়; আর একটি অনুলিপি রেখে দেয়া হয় রাজধানী মদীনায়।[২] দৃশ্যত,

১ দেখুন সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৪৭৮-৯, নং ৫১০ ও সহীহু সুনানিত তিরমিযী, খণ্ড ৩, পৃঃ ৫৯-৬০, নং ২৪৮০।

২ আল ইতকান, খণ্ড ১, পৃঃ ১৭২।

পর্ষদের ভিন্ন ভিন্ন সদস্য ভিন্ন ভিন্ন অনুলিপি প্রস্তুত করেছেন।[১] খলিফা উসমান ﷺ প্রতিটি প্রদেশে কুরআনের প্রত্যেকটি অনুলিপির সাথে একজন করে সরকারী পর্যায়ের কুরআন তিলাওয়াত প্রশিক্ষকও প্রেরণ করেন; যেন কুরআন পাঠ করতে গিয়ে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তিনি তা হাতে-কলমে সমাধান করে দিতে পারেন।[২] তিনি কুরআনের অন্যান্য অনুলিপি ধ্বংস করে ফেলার নির্দেশও জারী করেন; কারণ কিছু লোক ইতোমধ্যে তাদের ব্যক্তিগত কপিসমূহে টীকা সংযোজন করে ফেলেছিল এবং তাদের কিছু কপি ছিল অসম্পূর্ণ।[৩] পরবর্তী সকল নতুন অনুলিপি প্রস্তুত করা হয় 'মুসহাফে উসমানী' নামক এই সরকারী কপিটি থেকে। এভাবে যে কোনো ধরনের বিলুপ্তি কিংবা রদবদলের হাত থেকে কুরআনকে সংরক্ষণ করা হয়। উসমান ﷺ নতুন খলিফা মনোনীত হওয়ার দু' বছর পর ৬৪৬ 'ঈসায়ী সনে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

মূল মুসহাফসমূহ এখন কোথায়?

মদীনার মুসহাফটি মসজিদে নববীতে রাখা হয়েছিল। ৬৫৪ হিজরীতে সংঘটিত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধনকারী একটি অগ্নিকাণ্ডের বিবরণসমূহে কুরআনের এ মুসহাফটির উল্লেখ রয়েছে। মুসহাফটি অবশ্য অগ্নিকাণ্ড থেকে সুরক্ষিত থাকে। কিছু কিছু বর্ণনায় দেখা যায় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুর্কীরা কুরআনের এ কপিটিকে ইস্তাম্বুলে স্থানান্তর করে; কিন্তু বর্তমানে এটি বিলুপ্ত।[৪]

সিরিয়ার মুসহাফটি রাখা হয়েছিল দামেশকের জামে মসজিদে। ইবনু কাসীর (মৃত্যু ৭৭৪ হিঃ) ঐ কপিটি দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। একই কথা লিখেছেন ইবনু বতুতাহ (মৃত্যু ৭৭৯ হিঃ) ও ইবনু জাযারী (মৃত্যু ৮৩৩ হিঃ)। এটি তালাবদ্ধ থাকতো; তবে জুমু'আর সালাতের পর জনসাধারণের অবলোকনের জন্য বের করে আনা হতো। ১৮৯২ 'ঈসায়ী/১৩১০ হিজরীতে সংঘটিত একটি অগ্নিকাণ্ডে মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, আর এর সাথে সাথে

১ মা আল মাসাহিফ, পৃঃ ৯৯।
২ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৭-৮।
৩ সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৪৭৮-৯, নং ৫১০।
৪ মা আল মাসাহিফ, পৃঃ ১১৩।

মুসহাফটিও বিলুপ্ত হয়ে যায়। অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অল্প কিছুদিন পূর্বে তা থেকে প্রস্তুতকৃত একটি হস্তলিখিত অনুলিপিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইস্তাম্বুলে স্থানান্তর করা হয়।[১]

মিশরের দারুল কুতুবিস সুলতানিয়্যাতে হরিণের চামড়ায় লেখা একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি রয়েছে। কুফী লিপিতে লেখা এ পাণ্ডুলিপিতে কোনো নুক্তা কিংবা স্বরচিহ্ন নেই। পূর্বে এটি মসজিদে আমর ইবনুল আস নামক কায়রোর সর্বপ্রাচীন মসজিদে রাখা হয়েছিল। এক ইরাকী ব্যক্তি এ পাণ্ডুলিপিটি ৩৪৭ হিজরীতে কায়রো নিয়ে যায়। তার দাবী, এটি সেই কুরআন যা 'উসমান ﵁ নিহত হওয়ার সময় তিলাওয়াত করছিলেন। ইতিহাসবিদ মাকরিযী ৩৭৮ হিজরীতে এ তথ্যটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সে সময়ও এ দাবীর ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছিল। উক্ত পাণ্ডুলিপির কয়েকটি পৃষ্ঠায় রক্তের দাগ রয়েছে; কিন্তু কুরআনের অনেক প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে এ উদ্দেশ্যে রক্তের দাগ লাগানো হয়েছিল, যেন সেগুলোকে উসমান ﵁ এর মুসহাফ সাব্যস্ত করা যায়।[২]

তাসখন্দে একটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে, যা উসমান ﵁ কর্তৃক নিযুক্ত পর্ষদের অনুলিপিসমূহের একটি হওয়ার সর্বাধিক দাবী রাখে। মধ্য যুগের শেষের দিকে মধ্য এশিয়ার এক শাসক তা ক্রয় করেন। তবে রুশ বাহিনী দেশটি দখল করার পর সেটি তাদের দখলে চলে যায়। তারা এটিকে সেন্ট পিটার্সবার্গে নিয়ে যায়, কিন্তু বলশেভিক বিপ্লবের পর ১৯২৩ সালে তা আবার সমরকন্দে ফিরিয়ে আনা হয়। ১৯৪০ এর দশকে এটিকে তাসখন্দে স্থানান্তর করা হয়; এবং আজও তা সেখানে রয়েছে।[৩] সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ মুসলিম বিশেষজ্ঞদেরকে এই পাণ্ডুলিপি থেকে আলোকচিত্র নেয়ার অনুমতি দিয়েছিল। ফিলাডেলফিয়ার হায়দ্রাবাদ হাউজ এর একটি কপি প্রকাশ করেছে যেখানে আলোকচিত্রের পাশাপাশি নুক্তা ও স্বরচিহ্নসহ আধুনিক আরবি পাঠও সংযুক্ত করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞগণ বাইবেলের পাণ্ডুলিপিসমূহের ক্ষেত্রে যেসব নীতি প্রয়োগ করে সেসব কপির মধ্যে অসংখ্য অসঙ্গতি ও রদবদলের তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন, কুরআনের এসব পাণ্ডুলিপিসমূহের ক্ষেত্রেও একই নীতিমালা

---

১ মা আল মাসাহিফ, পৃঃ ১১৩।

২ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৪।

৩ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৭।

প্রয়োগ করা হয়েছে; কিন্তু কোনো রকম রদবদলের তথ্য আজও পর্যন্ত কেউ বের করতে পারেনি। ওয়াশিংটনের লাইব্রেরি অব কংগ্রেস, আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনস্থ চেস্টার বিটি মিউজিয়াম ও লন্ডন মিউজিয়ামে রক্ষিত ইসলামী ইতিহাসের সকল যুগের প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলোকে তাসখন্দ, তুরস্ক ও মিশরের যাদুঘরে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিসমূহের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। এসব গবেষণার ফলাফল থেকে এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যে, মূল পাণ্ডুলিপিতে যে পাঠ রয়েছে তা থেকে বর্তমান কুরআনে কোনোই রদবদল করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ: জার্মানির মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের "Institute fur Koranforschung" কুরআনের ৪২,০০০ সম্পূর্ণ কিংবা অসম্পূর্ণ কপি সংগ্রহ করে তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করে দেখেছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর গবেষণার পর তারা জানিয়েছেন যে, এসব কপির মধ্যে কোনো প্রকার অসঙ্গতি নেই; তবে মাঝেমধ্যে লিপিকারদের কিছু ভুল রয়েছে, যা সহজেই শনাক্ত করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন বোমার আঘাতে ইনস্টিটিউটটি ধ্বংস হয়ে যায়।[১]

কুরআন মুখস্থকরণ

যেসব সাহাবী পুরো কুরআন মুখস্থ করে নবী ﷺ-কে তাঁর ইন্তেকালের আগে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন তাদের সংখ্যা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম বুখারী এ মর্মে আনাস ইবনু মালিকের একটি বক্তব্য সঙ্কলন করেছেন যে, মাত্র চারজন সাহাবী নবী ﷺ এর জীবদ্দশায় সমগ্র কুরআন মুখস্থ করেছিলেন; আর তারা হলেন—আবুদ দারদা, মুআয ইবনু জাবাল, যাইদ ইবনু সাবিত ও আবু যাইদ رضي الله عنهم।[২] এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ একমত যে, আনাসের বক্তব্যের মধ্যে সংখ্যার ব্যাপারে আপাতদৃশ্য যে স্বল্পতা রয়েছে, তা বুঝানো হয়তো তার উদ্দেশ্য ছিল না, কিংবা তার উদ্দেশ্য এরূপ হলেও তার বক্তব্যটি সঠিক নয়। সম্ভবত আনসারদের দু'টি গোত্রের মধ্যে গোত্রের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে কোনো এক হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপচারিতায় তিনি এ কথাটি বলেছেন। অন্যথায় আনাস رضي الله عنه যেসব ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন

১ মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ, পৃঃ ১৭৯।
২ সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৪৮৮-৯, নং ৫২৬।

তারা সবাই তার নিজ গোত্র 'খাজরাজ'-এর অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, 'আওস' গোত্রের কেউই সমগ্র কুরআন মুখস্থ করেননি।[১] এ বক্তব্যের দু'টি পাঠ রয়েছে। অন্য পাঠটিতে শুধু এতোটুকু বলা হয়েছে যে, চারজন ব্যক্তি সমগ্র কুরআন মুখস্থ করেছিলেন; সেখানে বলা হয়নি যে, শুধু তারাই মুখস্থ করেছিলেন; আর সেই পাঠে আবু দারদার স্থানে উবাই ইবনু কা'বের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

বুখারী কর্তৃক সংগৃহীত অপর এক বর্ণনায় নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে ইবনু মাস'উদ, আবু হুযাইফার আযাদকৃত গোলাম সালিম, মুআয ও উবাই ﷺ এর কাছ থেকে কুরআন শেখার নির্দেশনা দান করেছেন।[৩] অন্যান্য প্রামাণ্য বর্ণনায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আবু বকর ও আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আসও সমগ্র কুরআন মুখস্থ করেছিলেন।[৪] শুধু বুখারী কর্তৃক সংগৃহীত দু'টি হাদীস থেকেই জানা যায় যে, সমগ্র কুরআন মুখস্থকারীর সংখ্যা এর চেয়ে বেশী। বি'রে মাউনা'র ঘটনায় সত্তর জন সাহাবীকে (যাদের সবাই ছিলেন কুরআন প্রশিক্ষক) অতর্কিতে আক্রমণ করে হত্যা করা হয়।[৫] 'কুররা' শব্দটি 'কারী' শব্দের বহুবচন যা এমন ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় যিনি কুরআন মুখস্থ করেছেন এবং কুরআন পাঠে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন। যদিও কুরআনের অর্থের জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জনকারীদের জন্যও সাহাবীরা দৃশ্যত এ পরিভাষাটিই ব্যবহার করেছেন। নবী ﷺ এর ইন্তেকালের মাত্র দু' বছর পর ইয়ামামার যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন, যারা সমগ্র কুরআন মুখস্থ করেছিলেন; তাদের অধিকাংশই ছিলেন আনসার।[৬] তারা নবী ﷺ এর

---

১ দেখুন ফাতহুল বারী, খণ্ড ৮, পৃঃ ৬৬৮-৯।

২ সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৪৮৮, নং ৫২৫।

৩ সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৪৮৬-৭, নং ৫২১।

৪ নবী (সা.) অসুস্থতার কারণে নামাজের ইমামতি করতে অক্ষম হওয়ার প্রেক্ষিতে আবু বকর (রা.) কে ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন। এ বর্ণনা থেকে ইবনু হাজারের অনুসিদ্ধান্ত হলো, আবু বকর ছিলেন একজন হাফেজ, কারণ নবী (সা.) ইতোপূর্বে বলেছিলেন যে, সালাতে যিনি ইমামতি করবেন তাকে অবশ্যই কুরআনের জ্ঞানে সর্বাধিক ব্যুৎপত্তির অধিকারী হতে হবে। দেখুন সহীহুল বুখারী, খণ্ড ১, পৃঃ ৩৬৪-৫, নং ৬৪৬ ও সহীহু মুসলিম, খণ্ড ১, পৃঃ ৩২৬, নং ১৪১৭-২০। নবী (সা.) আব্দুল্লাহকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন যাতে সে সাত দিনের কম সময়ে সমগ্র কুরআন তিলাওয়াত শেষ না করে। দেখুন সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৫১৬-৭, নং ৫৭২।

৫ সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৫, পৃঃ ২৮৭-৮৮, নং ৪১৬।

৬ সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৪৭৭-৮, নং ৫০৯।

ইন্তেকালের পূর্বে সমগ্র কুরআন মুখস্থ না করলেও এর উল্লেখযোগ্য অংশই মুখস্থ করে ফেলেছিলেন।

ইমাম বুখারী কর্তৃক সংগৃহীত আনাস ﷺ এর বক্তব্য থেকে কেউ কেউ যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, নবী ﷺ এর জীবদ্দশায় কুরআন মুখস্থকারী সাহাবীর সংখ্যা এতোটাই কম ছিল যে, তা থেকে এ দাবীর সমর্থন পাওয়া যায় না যে, কুরআন আমাদের নিকট মুতাওয়াতির বর্ণনায় পৌঁছেছে।[১] আনাসের বক্তব্যের স্বাভাবিক অর্থকে মেনে নিলেও উপরোক্ত অনুসিদ্ধান্তের সমর্থনে এর ব্যবহার খুব একটা শক্তিশালী ভিত্তি নয়। কারণ নবী ﷺ এর জীবদ্দশায় সমগ্র কুরআন মুখস্থকারীদের সংখ্যা অল্প হলেও কুরআনের উল্লেখযোগ্য অংশ মুখস্থ করে নিয়েছিলেন এমন সাহাবীর সংখ্যা অনেক। তাঁর জীবদ্দশায় দেখা গিয়েছিল যে, কুরআনের যে কোনো নির্বাচিত অংশের জন্যও অসংখ্য মুখস্থকারী ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর অনেকেই কুরআন মুখস্থকরণের কাজ সম্পন্ন করেছেন। বস্তুত, মুসলমানদের পরবর্তী প্রত্যেকটি প্রজন্মে সমগ্র কুরআন মুখস্থকারীর সংখ্যা অনেক বেড়ে চলেছে। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে আক্ষরিক অর্থেই লক্ষ লক্ষ মুসলিম রয়েছেন যারা পুরো কুরআন মুখস্থ করে রেখেছেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্মীয় কিংবা অন্য বিষয়ে এমন কোনো গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না, যাকে এতো বিপুল সংখ্যক লোক মুখস্থ করে রেখেছে। খ্রিস্টানদের নিউ টেস্টামেন্টের তুলনায় কুরআন প্রায় চার-পাঁচ গুণ বড়; তারপরও আজ পর্যন্ত এমন একজন ব্যক্তির কথাও জানা যায়নি যিনি পুরো নিউ টেস্টামেন্ট মুখস্থ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীর সমস্ত গ্রন্থ কোনো কারণে ধ্বংস হয়ে গেলেও একমাত্র যে গ্রন্থটি কোনো ভুল-ত্রুটি ছাড়াই অক্ষরে অক্ষরে পুনরায় লিখে নেওয়া সম্ভব– তা হলো মহিমান্বিত 'কুরআন'।

প্রথম সারির একজন প্রাচ্যবিদ কেনেথ ক্র্যাগ কুরআনের পাঠ মুখস্থকরণ ও সংরক্ষণ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন, "কুরআন পাঠের এ বিস্ময়কর ঘটনার মানে হলো, এর মূল পাঠ নিরবচ্ছিন্নভাবে বহু শতাব্দী ধরে বয়ে

১ তাওয়াতুর বলতে এমন বর্ণনাপদ্ধতিকে বুঝায় যেখানে বর্ণনাকারীর সংখ্যা এতো বেশী থাকে যে, তাদের পক্ষে একত্রিত হয়ে একটি মিথ্যা কথা রচনা করা কিংবা কোনো ভুলের উপর ঐকমত্য প্রকাশ করা অসম্ভব।

চলেছে। তাই এটিকে অতিপ্রাচীন কিংবা সুদূর অতীতের কোনো ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ নেই।"[১] প্রাচ্যবাদী আরেক বিশেষজ্ঞ উইলিয়াম গ্রাহাম লিখেছেন, "ইসলামী ইতিহাসের চৌদ্দ শ' বছর ধরে কোটি কোটি মুসলমান এই মহাগ্রন্থ শিখেছে, পাঠ করেছে এবং মুখস্থকরণ ও মৌখিক পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। লিপিবদ্ধ কুরআন আল্লাহর বক্তব্যের প্রামাণ্য পাঠের সাথে এমনভাবে মিলে যায়—ইতিহাসে যার কোনো নযীর নেই। তবে কুরআনের প্রামাণিকতা পূর্ণরূপে ও যথাযথভাবে অনুধাবন করা ঠিক তখনই সম্ভব হতে পারে যখন তা বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা হবে।"[২] জন বারটন নামক আরেক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, "তরুণদেরকে দিয়ে নিজেদের মুরুব্বীদের মৌখিক জ্ঞান মুখস্থ করিয়ে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের নিকট কুরআন পৌঁছে দেয়ার এ পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে লিপিবদ্ধ বিবরণের উপর পুরোপুরি নির্ভর করার ভয়ানক বিপদ থেকে শুরু থেকেই সুরক্ষা পাওয়া গেছে।" কুরআন সঙ্কলনের উপর কয়েক খণ্ডে সমাপ্ত একটি গ্রন্থের শেষে বারটন বলেছেন যে, "আজ কুরআনের যে পাঠ পাওয়া যাচ্ছে তা হলো ঐ পাঠ যা আমাদের নিকট ঠিক সেভাবেই পৌঁছেছে যেভাবে স্বয়ং নবী ﷺ এটিকে বিন্যস্ত করে অনুমোদন দিয়েছিলেন। আমাদের হাতে এখন যা আছে তা মূলত মুহাম্মাদ ﷺ এরই মুসহাফ।"[৩] [৪]

কুরআন সংরক্ষণের তাৎপর্য

আল্লাহ কুরআনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি স্বয়ং তাঁর চূড়ান্ত বাণীকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করবেন। তিনি বলেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝٩

"নিশ্চয় আমিই এ স্মারক (কুরআন) নাযিল করেছি, আর আমিই একে সুরক্ষা দিবো।"[৫]

---

১ দ্যা মাইন্ড অব দ্যা কুরআন, পৃঃ ২৬।

২ বিয়ন্ড দ্যা রিটেন ওয়ার্ড, পৃঃ ৮০।

৩ আরবি এ পরিভাষাটি কুরআনের পাঠ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

৪ দ্যা কালেকশন অব দ্যা কুরআন, পৃঃ ২৩৯-৪০।

৫ সূরা আল হিজ্‌র (১৫): ৯।

এর ফলে, মৌখিক ও লিখিত—উভয় পদ্ধতিতেই কুরআন এমনভাবে সুরক্ষিত রয়েছে যা ইতিহাসে অন্য কোনো ধর্মীয় গ্রন্থের ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

আল্লাহ কেন কুরআনকে সুরক্ষিত রাখলেন এবং তার আগের আসমানী ওহীগুলোকে পরিবর্তিত, বিকৃত বা বিলুপ্ত হতে দিলেন? এ প্রশ্নের জবাব নিহিত রয়েছে নীচের তিনটি পয়েন্টে:

১. আগেকার নবীগণ ও তাঁদের গ্রন্থাবলীকে পাঠানো হয়েছিল ইতিহাসের কোনো বিশেষ যুগের বিশেষ জাতির জন্য। একবার সেই বিশেষ যুগটি শেষ হয়ে গেলে নতুন আরেকজন নবীকে নতুন গ্রন্থ দিয়ে পাঠানো হতো; পূর্বের গ্রন্থের জায়গা দখল করে নিতো নতুন গ্রন্থ। সুতরাং সেসব গ্রন্থ আল্লাহ কর্তৃক সুরক্ষিত থাকার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আগেকার গ্রন্থসমূহকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া হয়েছিল সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের উপর; এটি ছিল তাদের জন্য একটি পরীক্ষা। ফলশ্রুতিতে, সেসব জাতি যখন বিপথগামী হয়ে যায়, তখন নিষিদ্ধ বস্তুকে বৈধ করার লক্ষ্যে তারা তাদের নবীদের আনীত গ্রন্থসমূহে পরিবর্তন সাধন শুরু করে। এভাবে আগেকার সমস্ত ওহীগ্রন্থ হয় রদবদলের শিকার হয়েছে, নতুবা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

২. আল্লাহর প্রেরিত নবীদের মধ্যে মুহাম্মাদ ﷺ হলেন সর্বশেষ নবী; তাঁকে কোনো বিশেষ জাতি কিংবা যুগের জন্য পাঠানো হয়নি। বরং পৃথিবীর ধ্বংস অবধি যত মানুষ পৃথিবীতে আগমন করবে, তিনি তাদের সবার জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ কুরআনে বলেন,

وَمَآ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيۡرًا وَّنَذِيۡرًا وَّلٰـكِنَّ اَكۡثَرَ النَّاسِ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۲۸﴾

"আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বুঝে না।"[১]

এ কারণে তাঁর কুরআনের জন্য যে কোনো ধরনের রদবদল কিংবা বিলুপ্তির হাত থেকে সুরক্ষিত থাকা জরুরী ছিল, যাতে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত মানবজাতির সকল প্রজন্ম তা থেকে সহজে দিকনির্দেশনা লাভ করতে পারে।

---

১ সূরা সাবা (৩৪): ২৮।

৩. মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত একজন সত্য নবী—এ কথা প্রমাণের জন্য মুহাম্মাদ ﷺ-কে প্রধান যে মু'জিযা দেয়া হয়েছিল তা হলো আল কুরআন। তাই, মুহাম্মাদ ﷺ যে সত্যিই আল্লাহর সর্বশেষ নবী—পরবর্তী প্রজন্মের নিকট তা প্রমাণ করার জন্য কুরআনকে সুরক্ষিত রাখা অনিবার্য হয়ে পড়ে। নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর পরে আগত ভণ্ড নবীদের সকলেই ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ নিয়ে এসেছিলো, যেগুলোকে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বলে দাবী করেছে; কিন্তু সেগুলোর কোনোটিরই এমন অলৌকিক ক্ষমতা ছিল না যে, তা হাজার হাজার মানুষ মুখস্থ করে রাখবে; তাছাড়া সেগুলোতে বিদ্যমান বক্তব্যের মানও কুরআনের বাণীর মানের সাথে তুলনীয়ও নয়।

কুরআন সুরক্ষিত থাকার তাৎপর্য হলো এই যে, এর ফলে ইসলাম তার আদি বিশুদ্ধতা বজায় রেখেছে। সময়ের বিবর্তনে মানুষ যা কিছু বিস্মৃত হোক কিংবা সংযোজন করুক—তাতে কিছুই আসে যায় না; কারণ মানবজাতি ইসলামের উৎসসমূহের দিকে সবসময়ই ফিরে যেতে সক্ষম হবে। ইসলামের সকল মৌলিক নীতিমালা কুরআনে বিদ্যমান। ফলে, কুরআন সংরক্ষণের অর্থ হলো কোনোরূপ বিকৃতি ছাড়াই চূড়ান্তভাবে ইসলামের সংরক্ষণ। আর 'ঈসা ﷺ এর ইনজিলের বিকৃতি ও বিলুপ্তির অর্থ হলো, ইসলাম গ্রহণ না করে খ্রিস্টানরা কখনো নবী 'ঈসা ﷺ এর সঠিক শিক্ষার দিকে ফিরে যেতে পারবে না।[১] একইভাবে বেবিলনীয়রা যখন জেরুজালেমে সুলাইমান ﷺ এর প্রার্থনাগৃহটি ধ্বংস করে দেয়, তখন মূল তাওরাতও বিলুপ্ত হয়ে যায়।[২] তাই ইহূদীরাও ইসলামের অনুসরণ ব্যতিরেকে মূসা ﷺ এর সঠিক শিক্ষার দিকে ফিরে যেতে পারবে না।

কেবল ইসলামের মধ্যেই নবীদের শিক্ষাসমূহ অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। তাই আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম।"[৩]

---

১ দেখুন দ্যা ফাইভ গস্পেলস, পৃঃ ২-১৬।

২ দেখুন দ্যা নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, খণ্ড ৪, পৃঃ ৭৫৭।

৩ সূরা আলে ইমরান (৩): ১৯।

৮

কুরআনের মূল পাঠ

আয়াত ও সূরার বিন্যাস

কুরআনের বাক্যকে বলা হয় 'আয়াত'– যার আক্ষরিক অর্থ হলো নিদর্শন বা প্রতীক; যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে চেনা যায়[১]। আর অধ্যায়কে বলা হয় 'সূরাহ'–যার আক্ষরিক অর্থ হলো বেষ্টনী বা দেয়াল।[২] বেশ কিছু সংখ্যক হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ নিজেই প্রত্যেক সূরায় আয়াতের বিন্যাস ঠিক করে দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ: 'উসমান ইবনু আবিল আস বলেন, "একদা আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ এর সাথে বসা ছিলাম, তিনি বড় বড় চোখ নিয়ে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন; তারপর তিনি দৃষ্টি অবনত করে বললেন,

اتانی جبریل علیه السلام فامرنی ان اضع هذه الاية بهذا الموضع من هذه السورة

"আমার নিকট জিবরাঈল এসে এ আয়াতকে এ সূরার এ স্থানে স্থাপন করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ ন্যায় বিচার, দয়া ও নিকটাত্মীয়দের প্রতি দানশীলতার নির্দেশ দেন।"[৩]

---

১ এরাবিক – ইংলিশ লেক্সিকন, খণ্ড ১, পৃঃ ১৩৫।

২ প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃঃ ১৪৬৫।

৩ সূরা আন নাহল (১৬): ৯০। এ বর্ণনাটি সংগ্রহ করেছেন আহমদ (নং ১৭২৪০)। ইসনাদে রয়েছেন লাইছ ইবনু আবী সুলাইম ইবনু যুনাইন। তাঁর প্রসঙ্গে ইবনু হাজার বলেছেন, "তিনি ছাদুক (সত্যবাদী) ছিলেন, তবে বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর অনেক কিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলতেন; তাঁর হাদীসসমূহের সত্য-

অনেক সময় নবী ﷺ বিভিন্ন সূরার সুনির্দিষ্ট আয়াতের কথাও উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ: আবু দারদা ؓ বর্ণনা করেছেন যে নবী ﷺ বলেছেন,

من حفظ عشر ايات من اول سورة الكهف عصم من الدجال

"যে ব্যক্তি সূরা আল কাহ্ফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জাল থেকে সুরক্ষিত থাকবে।"[১]

'উমার ইবনুল খাত্তাব ؓ-ও এক বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি পিতা-মাতাহীন কিংবা নিঃসন্তান ব্যক্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত একটি সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি এ বিষয়ে নবী ﷺ-কে এতো বেশী জিজ্ঞেস করতে থাকলেন যে, এক পর্যায়ে তিনি বিরক্ত হয়ে তার বুকে খোঁচা দিয়ে বললেন,

الا تكفيك اية الصيف التى فى اخر سورة النساء

"সূরা নিসার শেষের যে আয়াতটি গ্রীষ্মকালে নাযিল হয়েছে, তা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়?"[২]

আয়াতের বিন্যাস নির্ধারিত না থাকলে, যেসব হাদীসে বিশেষ আয়াতের বিশেষ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে, তা অর্থহীন হয়ে পড়তো। এমন অসংখ্য বিশুদ্ধ বর্ণনাও রয়েছে, যেখানে নবী ﷺ সালাত ও জুমু'আ'র খুতবায় আয়াতসমূহের ক্রমধারা বজায় রেখে বিভিন্ন সূরা তিলাওয়াত করেছেন।

মিথ্যাকে আলাদা করা যায় না, তাই তাঁরা তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন।" তবে তাঁর বর্ণনাসমূহ অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত হলে ইমাম মুসলিম তাঁর উপর নির্ভর করেছেন। (দেখুন তাকরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৪৬৪, নং ৫৬৮৫)। আরেকটি হাদীসে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন যে, 'উসমান (রা.) ইবনু আব্বাসকে বলেছিলেন, "দীর্ঘ সময় নিয়ে নবী (সা.) উপর বিভিন্ন সূরা নাযিল হয়েছে। যখনই তাঁর নিকট কোনোকিছু নাযিল হতো, তখনই তিনি তাঁর একজন ওহী লিখককে ডেকে বলতেন, 'এটিকে অমুক সূরার অমুক অংশের পরে লিপিবদ্ধ করো'।" (মুসনাদে আহমদ, নং ৩৭৬ ও ৪৬৮)। এ হাদীসটি আবু দাউদ ও তিরমিযীও বর্ণনা করেছেন। এর সাতটি ইসনাদ রয়েছে, প্রত্যেকটিতে রয়েছে ইয়াযীদ আল ফারীসি – ইবনু হাজার যাকে মাকবুল (সমর্থনমূলক বর্ণনা সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য) শ্রেণীভুক্ত করেছেন। (দেখুন তাকরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৬০৬, নং ৭৭৯৬)। বাদবাকী বর্ণনাকারীগণ অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য। এর ফলে হাদীসটি নিজে থেকে দুর্বল, তবে অন্য বর্ণনার (যেমন 'উসমান ইবনু আবিল আস এর হাদীস) সমর্থনের প্রেক্ষিতে তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১ এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম মুসলিম (সহীহু মুসলিম, খণ্ড ২, পৃঃ ৩৮৬-৭, নং ১৭৬৬) ও ইমাম আবু দাউদ (সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ৩, পৃঃ ১২০৩, নং ৪৩০৯)।

২ সহীহু মুসলিম, খণ্ড ৩, পৃঃ ৮৫৪, নং ৩৯৩৭।

দ্বিতীয়বার কুরআনের অনুলিপি তৈরী করার সময় খলিফা 'উসমান ﷺ ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি সূরার প্রত্যেকটি আয়াত পরীক্ষা করে নিশ্চিত করেছেন যে, তা যথাস্থানে রয়েছে; এমনকি রহিতকৃত আয়াতসমূহও। ইবনুয যুবায়ের বর্ণনা করেছেন যে তিনি খলিফা 'উসমানকে বলেছিলেন, "আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়"[১] শীর্ষক আয়াতটি তো অন্য আরেকটি আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে, সুতরাং আপনি এটিকে লিখাচ্ছেন কেন [অথবা আপনি এটিকে এভাবে লিখিত থাকতে দিচ্ছেন কেন]?" তিনি জবাব দিলেন, "ভাতিজা! আমি কোনো কিছুই তার আদি স্থান থেকে সরাবো না।"[২]

একইভাবে সূরাসমূহের বিন্যাসও স্বয়ং নবী ﷺ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যদিও এমন একটি কথাও বর্ণিত আছে যে, আলী ইবনু আবী তালিব কুরআনের এমন একটি পাঠ সঙ্কলন করেছিলেন যেখানে সূরাসমূহকে নাযিলের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সাজানো হয়েছিল। অর্থাৎ, এর শুরু হয়েছিল এভাবে: প্রথমে সূরা আল আলাক, তারপর আল মুদ্দাস্‌সির ও তারপর নূন। এ কথাও বর্ণিত আছে যে, ইবনু মাস'উদের নিকট এমন একটি পাঠ ছিল যার শুরু হয়েছে সূরা আল বাকারাহ দিয়ে, তারপর নিসা এবং তারপর আলে ইমরান। উবাইয়ের নিকট যে পাঠ ছিল তার সূচনা আবার হয়েছে সূরা আল ফাতিহা দিয়ে, তারপর আল বাকারা, তারপর আন নিসা এবং তারপর আলে ইমরান।[৩] তবে নবী ﷺ এর এসব বিখ্যাত সাহাবীর কেউই খলিফা 'উসমান ﷺ-ও সাহাবীদের কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত বিন্যাসের ব্যাপারে কোনো রকম আপত্তি উত্থাপন করেননি। বস্তুত, তারা এবং অন্যান্য সাহাবীগণ সংশয় এড়াতে তাদের কপিসমূহ পুড়িয়ে ফেলেছিলেন।[৪] সূরাসমূহের বিন্যাস নির্ধারিত না থাকলে এসবের কোনো কিছুই সংঘটিত হতো না।

---

১ সূরা আল বাকারাহ (২): ২৪০।

২ সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৪০, নং ৫৩।

৩ দেখুন আল ইতকান, খণ্ড ১, পৃঃ ১৮১-৩, এবং মা'আল মাছাহিফ, পৃঃ ৮১-৭।

৪ দেখুন আল ইতকান, খণ্ড ১, পৃঃ ১৭০-১। সুয়ূতী একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যেটিকে তিনি প্রামাণ্য শ্রেণীভুক্ত করেছেন। ইবনু আবী দাউদ তাঁর কিতাবুল মাছাহিফ গ্রন্থে ঐ বর্ণনাটি সংগ্রহ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, উসমান (রা.) এর মৃত্যুর পর 'মুছহাফ দাহকারী' হিসেবে তাকে যে উপাধি দেয়া হয়েছিল আলী (রা.) তার প্রতিবাদ করেন; তাঁর ব্যাখ্যা ছিল এই যে, খ্যাতনামা সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে এবং তাঁদের সম্মতি নিয়েই 'উসমান এ কাজ করেছেন।

এ কথাও উল্লেখ্য যে, নবী ﷺ এর জীবদ্দশায় শেষ বছর বাদে প্রত্যেক রমজানে জিবরাঈল ﷺ একবার করে কুরআনকে পুনঃনিরীক্ষণ করে দিতেন; এ নিরীক্ষণে তিনি নবী ﷺ এর নিকট দু'বার কুরআন পাঠ করে শোনাতেন।[১] এ ধরনের নিরীক্ষণ ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বিন্যাস থাকা অত্যন্ত জরুরী ছিল। বিশেষত এ বিষয়টিও বিবেচ্য যে, কতিপয় সাহাবী জিবরাঈলের নিকট নবী ﷺ এর তিলাওয়াত শুনেছিলেন। 'উসমা

'উসমানী লিপি

নবী ﷺ এর নিকট থেকে এ মর্মে কোনো বিবরণ নেই যে, খলিফা 'উসমানের শাসনামলে যে লিপি অনুসরণ করে কুরআন লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল–তা সুনির্দিষ্ট ছিল। বানান সংক্রান্ত কোনো মতবিরোধ দেখা দিলে খলিফা 'উসমান লেখকদেরকে কুরাইশী উপভাষার বানান অনুসরণ করার নির্দেশ দিতেন। এ কারণে 'তাবুত' শব্দের বানান নিয়ে যাইদ ইবনু সাবিত অন্য তিন কুরাইশী লেখকের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে تابوة লিখতে চাইলে 'উসমান ﷺ বলেন, "تابوت লিখ, কারণ কুরআন নাযিল হয়েছে কুরাইশী উপভাষায়।"[২]

তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, সময়ের পরিক্রমায় লিখনরীতির বিবর্তনের ফলে যেসব পরিবর্তন সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তা থেকে কুরআনকে সুরক্ষিত রাখতে হলে আদি বানানরীতি বজায় রাখাই শ্রেয়। লিখনরীতিও একেক দেশে একেক রকমের, যা অনুসরণ করতে গেলে কুরআনের মূল পাঠে অনৈক্য ও অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে। এ কারণে, ইমাম মালিককে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁর সময়ের লিখনরীতি অনুসারে কুরআন লিখা যায় কি না–তখন তিনি বললেন, "না, তা বরং আদি লিখন পদ্ধতি অনুসারেই লিখতে হবে।"[৩]

---

১ সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৪৮৬, নং ৫১৯।

২ তিরমিযী কর্তৃক সংগৃহীত এ হাদীসটিকে নাসিরুদ্দীন আলবানী তাঁর সহীহু সুনানিত তিরমিযী গ্রন্থে (খণ্ড ৩, পৃঃ ৬০, নং ২৪৮০)প্রামাণ্য আখ্যায়িত করেছেন।

৩ আশহাব বর্ণিত এ উক্তিটি আবু আমর দানী তাঁর আল মুকনী গ্রন্থে সংগ্রহ করেছেন। সুয়ূতীর আল ইতকান গ্রন্থে (খণ্ড ৪, পৃঃ ১৪৬) উদ্ধৃত।

কাযী বাকিল্লানী (মৃত্যু ১০১৩ ‘ঈসায়ী/৪০৩ হিঃ) ও ইবনু খালদুনের (মৃত্যু ১৪০৫ ‘ঈসায়ী/৮০৮ হিঃ) ন্যায় অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, প্রমিত আরবি বানানরীতি (যা ‘উসমানী লিপি থেকে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির) অনুসারে কুরআন লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। বাকিল্লানীর যুক্তি হলো, একটি সুনির্দিষ্ট লিখনরীতি অনুসারে কুরআন লিখার উপর কেউ জোর দিতে চাইলে তাকে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এ মর্মে প্রমাণ দেখাতে হবে; অথচ কুরআন ও সুন্নাহতে এ মর্মে কোনো প্রমাণ নেই। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, কতিপয় প্রখ্যাত সাহাবীর নিকট বেশ কিছু মুসহাফ ছিল, যা ‘উসমানী মুসহাফের লিখনরীতি থেকে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির।[১] ইবনু খালদুনের (মৃত্যু ১৪০৫ ‘ঈসায়ী/৮০৮ হিঃ) যুক্তি হলো, সাহাবীরা এমন এক সময়ে ‘উসমানী মুসহাফ লিপিবদ্ধ করেছেন যখন প্রমিত আরবি লিখনরীতি সুনির্দিষ্ট করা হয়নি; তাই পরবর্তীতে গৃহীত নীতির সাথে তাঁদের লিখনরীতির বিরোধ দেখা দিলে, তা আঁকড়ে ধরে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। ইজ্জ ইবনু আব্দিস সালামের (মৃত্যু ১২৮২ ‘ঈসায়ী/৬৬০ হিঃ) সিদ্ধান্ত হলো এই যে, অজ্ঞ ব্যক্তিরা যাতে তিলাওয়াত করতে গিয়ে অর্থ বিগড়ে যাওয়ার মতো ভুলের মধ্যে না পড়ে যায়—তা নিশ্চিত করার জন্য সাধারণ মানুষ যে মুসহাফ তিলাওয়াত করে, তা অবশ্যই প্রমিত আরবি বানানরীতি অনুসারে হতে হবে। এ ধরনের পরিবর্তনকে যারা বৈধ মনে করেন তাদের বক্তব্য হলো, ‘উসমানী মুসহাফ নামে সাধারণ লোক যে মুসহাফ তিলাওয়াত করে তার লিখনরীতি আসল ‘উসমানী মুসহাফ থেকে অনেক ভিন্ন প্রকৃতির। এসব পরিবর্তনের উদ্দেশ্য একটাই– আর তা হলো সাধারণ মুসলমানদের জন্য সহজে ও বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতের ব্যবস্থা করে দেয়া।[২] ‘উসমানী মুসহাফের প্রবক্তাদের মতে, সাহাবীরা উক্ত মুসহাফটিকে এমন ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যেখানে সর্বোচ্চ সংখ্যক বিভিন্ন রকম তিলাওয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে; অন্যদিকে আধুনিক প্রমিত আরবি বানানরীতি অনুসারে তা লিপিবদ্ধ করা হলে কতিপয় বিভিন্ন রকম তিলাওয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

---

১ লামহাত ফী ‘উলূমিল কুরআন, ১৩৩-৪।
২ লামহাত ফী ‘‘উলূমিল কুরআন, ১৩৫।

স্বরচিহ্নজ্ঞাপক যের, যবর ও পেশ এবং দৃশ্যত একই ধরনের অক্ষরসমূহকে (যেমন সীন ও শীন, সোয়াদ ও দোয়াদ ইত্যাদি) পৃথক করার জন্য যেসব নুক্তা ব্যবহৃত হয়, সেসব ছাড়াই 'উসমানী যুগে কুরআনী পাঠসমূহ লিখিত হয়েছিল। আয়াতসমূহে কোনো নম্বর দেয়া ছিল না; এমনকি কোনোরূপ যতিচিহ্নও ব্যবহৃত হয়নি।

সে সময়ের শিক্ষিত সকল আরব মুসলিমেরই আরবি ভাষা বুঝার একটা সহজাত ক্ষমতা ছিল, যার ফলে তারা এ পদ্ধতিতে লিখিত পাঠসমূহকে অনায়াসে পড়তে পারতো। তবে অনারবরা যখন ইসলাম গ্রহণ করে আরবি শিখতে শুরু করলো, তখনই আরবি ভাষার সাথে পরিচয় না থাকার কারণে কুরআন তিলাওয়াতে ভুল দেখা দিতে শুরু করে। ইরাক প্রদেশে এ অবস্থা সবচেয়ে বেশী দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। বস্তুত বর্ণিত আছে যে, একবার ব্যাকরণবিদ আবুল আসওয়াদ দুয়াইলী কিছু লোককে নিম্নোক্ত আয়াতের 'রাসূলুহু'র স্থলে 'রাসূলিহি' পড়তে শোনেন:

أَنَّ اللَّهَ بَرِيٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۙ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুশরিকদের ব্যাপারে (দায়িত্ব)মুক্ত।"[১]

পেশের জায়গায় যের পড়ার এ ছোট্ট পরিবর্তনের (স্বরচিহ্ন না দেয়া হলে লিখিত পাঠে যা সনাক্ত করার মতোও নয়) ফলে আয়াতের অর্থ হয়ে গেল 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুশরিক ও তাঁর রাসূলের ব্যাপারে (দায়িত্ব)মুক্ত।' বসরার গভর্নর যিয়াদ ইতোপূর্বে দুয়াইলীকে এমন কিছু চিহ্ন উদ্ভাবনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন, যার সাহায্যে সাধারণ মানুষ আরো সহজে কুরআন পাঠ করতে পারে। একটি অনৈসলামী বিদআত চালু হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় দুয়াইলী গভর্নরের অনুরোধে সাড়া দিতে দেরী করেন। তবে কুরআন পাঠের এ ভুলটি তাকে এতোটাই নাড়া দেয় যে, এ ঘটনার অল্প কিছুদিন পর তিনি আরবি পাঠের স্বর নির্দেশক কিছু প্রাথমিক চিহ্ন উদ্ভাবন করেন।[২] যবর (হ্রস্ব স্বর 'আ') চিহ্নিত করা হয় অক্ষরের উপরে একটি বিন্দুর মাধ্যমে, যেরের (হ্রস্ব

---

১ সূরা আত তাওবাহ (৯): ৩।
২ মানাহিলুল ইরফান, খণ্ড ১, পৃঃ ৪০১।

স্বর 'ই') জন্য ব্যবহার করা হয় অক্ষরের নীচে একটি বিন্দু, আর পেশের (হ্রস্ব স্বর 'উ') জন্য দেয়া হয় অক্ষরের শেষভাগে একটি বিন্দু। সাকিনের (হসন্ত) জন্য ব্যবহার করা হয় দু'টি বিন্দু। ঐ যুগের পাঠের একটি নমুনা নিচে তুলে ধরা হলো:

যেসব অক্ষর দেখতে একই রকম, সেগুলোকে পরস্পর থেকে পৃথক করার জন্য পরবর্তীতে বিন্দু যোগ করা হয় এবং সে স্বরচিহ্নের সাথে সংশ্লিষ্টতা আছে এমন অক্ষর থেকে স্বরচিহ্নের বিকাশ সাধিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ: আলিফ থেকে বিকশিত হয় যবর এবং তা অক্ষরের উপরে একটি সরল রেখার রূপ নেয়; যের বিকশিত হয় ইয়া থেকে এবং তা অক্ষরের নীচে একটি সরল রেখার রূপ লাভ করে; আর পেশের বিকাশ ঘটে ওয়াও থেকে এবং তা অক্ষরের শেষভাগে ছোট্ট ওয়াও এর আকৃতি ধারণ করে।

পাঠের অঙ্গসজ্জা

হিজরী তৃতীয় শতকে ('ঈসায়ী নবম শতক) হস্তলিপিবিশারদগণ কুরআনকে সুসজ্জিত করার ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। এর ফলে বেশ কয়েকটি ফুলবিশিষ্ট লিপি ও রকমারি চিহ্নের বিকাশ ঘটে। এ সময়েই প্রথম বারের মতো দ্বিত্ব উচ্চারণের (তাশদীদ) জন্য ' ّ ' চিহ্নের ব্যবহার শুরু হয়।

এরপর হস্তলিপিবিশারদগণ প্রত্যেক সূরার শুরুতে সূরার নাম ও তার আয়াত সংখ্যা লেখার প্রথা চালু করেন। মূলত নবী ﷺ মাত্র কয়েকটি সূরাকে নাম ধরে উল্লেখ করেছেন এবং সাহাবীরাই সূরাসমূহকে প্রারম্ভিক শব্দগুচ্ছের আদলে নামকরণ করেছেন (উদাহরণস্বরূপ: সূরা আরাআইতা এখন সূরা মা'উন নামে পরিচিত); সেহেতু একই সূরার একাধিক নাম একটি স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়। আয়াতের শুরু ও শেষ নির্দেশক চিহ্ন, পারা (কুরআনের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ) কিংবা রুকু অনুযায়ী কুরআনের বিভাজন চিহ্ন এবং বিভিন্ন প্রকার যতিচিহ্নও এ যুগে চালু করা হয়।[১]

১ দেখুন আল ইতকান, খণ্ড ৪, পৃঃ ১৬১-৬২।

মূলপাঠে বাড়তি কোনোকিছু ঢুকে যাওয়ার আশঙ্কায় সমসাময়িক বিশেষজ্ঞগণ ছিলেন এসব সংযোজনের বিরোধী। সাহাবী ইবনু মাস‘উদের নিম্নোক্ত বক্তব্যটি ছিল তাদের বিরোধিতার অন্যতম ভিত্তি হলো—‘বাড়তি কোনো কিছু সংযোজন করা থেকে কুরআনকে মুক্ত রাখো, আর এর সাথে অন্য কোনো কিছুকে মিশ্রিত করো না।’[১] তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞগণ স্বরচিহ্নজ্ঞাপক বিন্দু ও সাদৃশ্যপূর্ণ অক্ষরসমূহকে পৃথককারী নুক্তা ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন না, কারণ বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ও কুরআনের পাঠকে বিকৃতির হাত থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এগুলোর ব্যবহার বাস্তবে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। সাহাবীদের পরবর্তী প্রজন্মের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হাসান বসরী, ইবনু সীরিন ও রাবীয়াহ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে তারা বলেছিলেন, নুক্তা ও তাশকীলের (স্বরচিহ্ন) ব্যবহার গ্রহণযোগ্য।[২] সময়ের পরিক্রমায় হস্তলিপিবিশারদদের সংযোজন ও সৌন্দর্য বর্ধন এতোটাই সাধারণ হয়ে গেল যে, লোকজন ভুলেই গিয়েছে যে, একসময় বিশেষজ্ঞগণ এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। বিশেষজ্ঞদের একসময়ের বিরোধিতাকে যে গ্রাহ্য করা হয়নি—বর্তমানকালের কুরআনের পাঠ এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে; তবে এ ধরনের সংযোজন ও সৌন্দর্য বর্ধনের ফলে কুরআনের মূল পাঠে বাড়তি কোনোকিছু ঢুকে পড়ার ঘটনা সংঘটিত হয়নি মোটেই। এর প্রধান কারণ হলো, মুসলিমদের মধ্যে কুরআনের মূলপাঠকে আদি বিশুদ্ধতা সহকারে মুখস্থ করে রাখার রীতি অব্যাহতভাবেই চালু রয়েছে।

১ মুসান্নাফ আব্দির রায্যাক, খণ্ড ৪, পৃঃ ৩২২-৩, নং ৭৯৪৪।

২ মুসান্নাফ আব্দির রায্যাক, খণ্ড ৪, পৃঃ ৩২৩-৪, নং ৭৯৪৮। পরবর্তীতে ইবনু সীরিন দৃশ্যত তাঁর মত পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন, কারণ আব্দুর রায্যাক এও বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এ ধরনের ব্যবহারবিধিকে অনুমোদনযোগ্য মনে করতেন না।

৯

আঞ্চলিক আরবি ও কুরআন

আরবি ভাষা সমগ্র আরব উপদ্বীপের সাধারণ ভাষা হলেও বিভিন্ন গোত্রের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও ইতিহাস থেকে জন্ম নিয়েছে আরবি ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই বস্তু বুঝাতে একেক গোত্র একেক শব্দ ব্যবহার করেছে। উদাহরণস্বরূপ: কতিপয় গোত্র সিংহকে বলে 'আসাদ', আবার অন্যান্য গোত্র সিংহ বুঝাতে ব্যবহার করে 'লাইস', 'হামযাহ', 'হাফস', কিংবা 'গাদানফার'। অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বরবর্ণের পার্থক্যের কারণে কতিপয় অক্ষরের উচ্চারণ পদ্ধতিতে দেখা দিয়েছে ভিন্নতা। তবে কালের পরিক্রমায় কুরাইশ গোত্রের আঞ্চলিক রূপটি সর্বাধিক গুরুত্বের অধিকারী হয়ে ওঠে। এর নেপথ্যে ছিল মূলত নিম্নলিখিত কারণসমূহ:

১. কা'বা ঘরসহ মক্কা ও আশেপাশের এলাকাটি ছিল কুরাইশদের গোত্রীয় ভূ-খণ্ডের অংশ। প্রত্যেক গোত্র তার নিজ নিজ গোত্রের প্রতিনিধিত্বকারী মূর্তিগুলোকে কা'বা ঘরের ভেতরে এবং এর বাইরেও চতুর্দিকে স্থাপন করেছিল। এর ফলে কা'বাকে আরবের সকল গোত্রের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র মনে করা হতো; আর বছর জুড়ে লেগে থাকতো মক্কাকেন্দ্রিক তীর্থযাত্রা।

২. হজ্জের মাসে সকল গোত্রের লোকেরা হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য মক্কাতে আসতো। নবী ইবরাহীম ﷺ ও তাঁর পুত্রগণ যখন সর্বপ্রথম কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন, তখন থেকেই এ প্রথার সূচনা; আর এটি তাঁদের আরব বংশধরদের মধ্যে একটি প্রথা আকারেই চলে আসছিল। তবে মূল আনুষ্ঠানিকতার সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছিল কুসংস্কার ও মূর্তিপূজা সম্পর্কিত অসংখ্য বানোয়াট আনুষ্ঠানিকতা। কুরাইশরা সকল হাজী ও তাদের বাহন জন্তুদেরকে পানি সরবরাহ করার (সিকায়াহ) দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিল। বিনা পয়সায় তারা এ সেবা প্রদান করতো; এটি ছিল তাদের মহত্ত্ব

ও বদান্যতার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। এভাবে কুরাইশ গোত্রটি সমগ্র আরবে একটি উচ্চ প্রশংসিত স্থান দখল করে নিতে সক্ষম হয়।

৩. মক্কার অবস্থান ছিল তৎকালীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান প্রধান রুটসমূহের সংযোগস্থলে। উত্তরে সিরিয়া ও পারস্য, আর দক্ষিণে ইয়েমেন ও আফ্রিকা। ফলশ্রুতিতে, কুরাইশ বণিক শ্রেণী আরবদের মধ্যে সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে; আর এর ফলে আরবের বিভিন্ন গোত্র কুরাইশ গোত্রকে ব্যাপক সম্মান দেখাতে থাকে।

সাব‘আহ আহরুফ (সাত ধরনের তিলাওয়াত)

আরবি ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপের মধ্যে যেসব পার্থক্য রয়েছে সেগুলোকে সামনে রেখে আল্লাহ কুরআনকে সাতটি ভিন্ন ভিন্ন পাঠে নাযিল করেছেন। তাতে নিম্নোক্ত সাতটি গোত্রের আঞ্চলিক ভাষার সাথে মিল রাখা হয়েছে:

কুরাইশ, হুযাইল, সাকীফ, হাওয়াযিন, কিনানাহ, তামীম ও ইয়েমেন।[১]

এসব ভিন্ন ভিন্ন তিলাওয়াতের মানে এই নয় যে, কুরআন মূলত কয়েক ধরনের। কারণ জিবরাঈল ﷺ তো সবসময় সেই একই কুরআন থেকে আয়াত নিয়ে এসেছেন—যা মহাকাশের একটি সুরক্ষিত ফলকে (আল লাওহুল মাহফুজ) সংরক্ষিত রয়েছে। তবে আনীত ওহীকে সাতটি প্রধান গোত্রের আঞ্চলিক ভাষায় পাঠ করে শুনিয়ে দেওয়ার জন্য জিবরাঈলকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। একই শব্দ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় কতভাবে উচ্চারিত হতে পারে—ভিন্ন ভিন্ন তিলাওয়াতের মাধ্যমে মূলত এ বিষয়টিই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তবে এগুলোর অর্থ থাকতো অভিন্ন। নবী ﷺ তাঁর অধিকাংশ সাহাবীকে ভিন্ন ভিন্ন তিলাওয়াতের ব্যাপারে অবহিত করতেন যাতে পাঠের ভিন্নতা তাদের মধ্যে কোনো বিবাদ কিংবা বিভাজনের সৃষ্টি না করে। ইবনু আব্বাস رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে নিম্নোক্ত কথা বলতে শুনেছেন:

---

১ যারা সাত ধরনের কিরাআতের এ ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে যে, আসলে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো কোনো আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে। দেখুন আল ইতকান, খণ্ড ১, পৃঃ ১৩৫-৬।

اقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم ازل استزيده و يزيدني حتى انتهى الى سبعة احرف

"জিবরাঈল আমাকে (কুরআন) একভাবে পাঠ করে শুনিয়েছে, অতঃপর এটিকে পুনরাবৃত্তি করার পর আমি তাঁকে আরো কয়েকভাবে পাঠ করে শোনাতে বললাম, তিনি তাই করলেন; এভাবে তিনি সাত পদ্ধতিতে পাঠ করে শোনালেন।"[১]

তবে সকল সাহাবী সব রকম তিলাওয়াতের ব্যাপারে অবহিত ছিলেন না। এর ফলে তাঁদের মধ্যে ছোটখাট মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে, যা নবী ﷺ নিজেই সমাধান করে দিয়েছেন। এ ধরনের ঘটনাবলীর একটি দৃষ্টান্ত হলো নিম্নোক্ত ঘটনা যা নবী ﷺ এর একজন ঘনিষ্ঠ সাহাবী বর্ণনা করেছেন। ''উমার ইবনুল খাত্তাব বলেছেন, "একবার আল্লাহর রাসূলের জীবদ্দশায় আমি হিশাম ইবনু হাকিমকে সালাতে সূরা আল ফুরক্বান তিলাওয়াত করতে শুনলাম; আমি লক্ষ্য করলাম যে, নবী ﷺ আমাকে যেভাবে শিখিয়েছিলেন–সে তা থেকে ভিন্নভাবে তিলাওয়াত করল। সালাতের মধ্যেই আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হচ্ছিলাম, কিন্তু সালাত সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত আমি আমার রাগকে সংযত রাখি। সালাত সম্পন্ন হলে আমি তার ঘাড়ের নিকট জুব্বার উপরিভাগে খপ করে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, "আমি তোমাকে যে সূরা তিলাওয়াত করতে শুনলাম–তা তোমাকে কে শিখিয়েছে?" সে জবাব দিল, "আল্লাহর রাসূল ﷺ শিখিয়েছেন!" আমি বললাম, "তুমি মিথ্যা কথা বলছো; কারণ তুমি যেভাবে তিলাওয়াত করেছো, তা থেকে ভিন্নভাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে তা শিখিয়েছেন!" তারপর আমি তাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর নিকট টেনে নিয়ে গিয়ে বললাম, "আমি এ ব্যক্তিকে এমনভাবে সূরা ফুরক্বান তিলাওয়াত করতে শুনেছি–যা আপনি আমাকে যেভাবে শিখিয়েছেন তা থেকে ভিন্ন রকমের।" অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, "উমার! তুমি তাকে ছেড়ে দাও। আর হিশাম! তুমি যা পড়েছো তা পাঠ করে শোনাও।" আমি হিশামকে একটু আগে যেভাবে পাঠ করতে শুনেছিলাম, সে সেভাবেই পাঠ করলো। তারপর আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, "এ সূরা তো এভাবে

১ এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম বুখারী (সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৪৮১, নং ৫১৩) ও ইমাম মুসলিম (সহীহু মুসলিম, খণ্ড ২, পৃঃ ৩৯০, নং ১৭৮৫)।

নাযিল হয়েছে।” এরপর তিনি বললেন, “উমার! এবার তুমি পাঠ করে শোনাও।” অতঃপর আমি যখন তাঁকে ঠিক সেভাবেই পাঠ করে শোনালাম যেভাবে তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন, তখন তিনি বললেন,

هكذا انزلت ان القران انزل على سبعة احرف فاقرووا منه ما تيسر

“এ সূরা তো এভাবে নাযিল হয়েছে। (আসলে) কুরআন তো নাযিল হয়েছে সাত পদ্ধতিতে; তোমাদের জন্য যেটি সহজতর–তোমরা সেভাবেই তিলাওয়াত করো।”[১]

এ ঘটনার ভিত্তিতে ইবনু আব্দিল বার যুক্তি দেখিয়েছেন যে, সাত ধরনের তিলাওয়াতকে সাতটি আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে ব্যাখ্যা করার বিষয়টি ত্রুটিপূর্ণ; কারণ ‘উমার ও হিশাম–উভয়ই ছিলেন কুরাইশ গোত্রভুক্ত। তার মতে সাত ধরনের তিলাওয়াত মানে সমার্থবোধক বিভিন্ন শব্দ; দৃষ্টান্তস্বরূপ, হালুম্মা, তা‘আলি ও আকবিল–এ সবগুলোর অর্থ হলো ‘আসো’। তার উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনু হাজার লিখেছেন যে, এ দু’টি ব্যাখ্যা পরস্পরের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। ব্যাপারটি এমন হতে পারে যে, এই সাত ধরনের তিলাওয়াতের মধ্যে সমার্থবোধক বিভিন্ন শব্দের পাশাপাশি আরবের সাতটি গোত্রের আঞ্চলিক ভাষাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইবনু কুতাইবাহ অবশ্য সাত ধরনের তিলাওয়াতের ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

১. অক্ষর ও অর্থ অপরিবর্তিত রেখে স্বরের ভিন্নতা; উদাহরণস্বরূপ: সূরা আল বাকারার ২৮২ নং আয়াতে ‘লা ইউদা-ররা’ এবং ‘লা ইউদা-ররু’:

وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيدٌ ۚ

“লেখক কিংবা সাক্ষী–কাউকেই ক্ষতিগ্রস্ত করা উচিত নয়।”

২. ক্রিয়াপদের ভিন্নতা; উদাহরণস্বরূপ, সূরা সাবা’র ১৯ নং আয়াতে ‘বা‘আদা’ ও ‘বা-‘ইদ’:

---

১ এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম বুখারী (সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৪৮২, নং ৫১৪) ও ইমাম মুসলিম (সহীহু মুসলিম, খণ্ড ২, পৃঃ ৩৮৯-৯০, নং ১৭৮২)। উবাই ইবনু কা‘ব, আব্দুর রহমান ইবনু আওফ ও আবু হুরায়রার বরাতেও একই ধরনের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত ইবনুল জাযারী এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহকে সংগ্রহ করে দেখেছেন যে, ১৯জন সাহাবী এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ দিক থেকে এটিকে অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির হাদীস হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

فَقَالُوا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا

"তারা বলল, 'হে আমাদের প্রভু, আমাদের ভ্রমণের মাঝখানের মঞ্জিলগুলোকে আরো দূরবর্তী করে দাও'।"

এ উদাহরণে ভিন্নতা দেখা দিয়েছে দু'ভাবে: অতীতকাল ও আদেশসূচক ক্রিয়াপদের মধ্যে এবং ক্রিয়ামূলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় রূপের মধ্যে (অর্থাৎ, বাবে নাসারা ও বাবে মুফাআলা'র মধ্যে)।

৩. যেসব অক্ষর দেখতে একই রকম সেগুলোর নুক্তার ভিন্নতা; উদাহরণস্বরূপ, সূরা আল বাকারা'র ২৫৯ নং আয়াতে 'নুনশিযুহা' শব্দটিকে 'রা' এবং 'যা' – দু' অক্ষর দিয়েই পড়া যায় (অর্থাৎ, নুনশিযুহা কে নুনিশিরুহা পড়ার সুযোগ রয়েছে):

وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا

"আর (গাধাটির) হাড্ডিগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো, আমি কীভাবে সেগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করি।"

'নুনশিরুহা' তিলাওয়াত করলে তার অর্থ দাঁড়ায়, "আমি এগুলোকে জীবিত করে তুলি।"

৪. মুখগহ্বর কিংবা কণ্ঠনালীর আশেপাশের স্থান থেকেই উচ্চারিত হয়–এমন এক অক্ষরের জায়গায় অন্য অক্ষর প্রতিস্থাপনের ভিন্নতা; উদাহরণস্বরূপ: 'আইন ও হা–উভয় অক্ষরই কণ্ঠনালীর মাঝখান থেকে উচ্চারিত হয়। সূরা আল ওয়াক্বিয়া'র ২৯ নং আয়াতে 'ত্বালহিন' (কলাগাছ কিংবা একপ্রকার একাশিয়া গাছ) শব্দটিকে 'তাল'ঈন' (তালগাছ)ও পড়ার সুযোগ রয়েছে।

৫. কোনো শব্দগুচ্ছের শব্দসমূহের স্থান পরিবর্তনের ভিন্নতা; উদাহরণস্বরূপ, সূরা আল ক্বাফ এর ১৯ নং আয়াত:

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ

"আর মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যি সত্যিই আসবে।"

আবু বকরের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি উক্ত আয়াতকে এভাবে পড়েছেন:

وجاءت سكرة الحق بالموت

"আর মৃত্যুর সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার (নির্ধারিত) শাস্তিও আসবে।"

৬. অক্ষর বা শব্দ সংযোজন কিংবা বিয়োজন ঘটানোর ভিন্নতা; উদাহরণস্বরূপ, সূরা আল লাইলের ১-৩ নং আয়াতে:

وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣﴾

"রাতের শপথ যখন তা আচ্ছাদিত করে নেয়, আর দিনের শপথ যখন তা আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আর তাঁর শপথ যিনি নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করেছেন।"

ইবনু মাস'ঊদ ও আবুদ দারদা'র তিলাওয়াতে ৩ নং আয়াতের প্রথম তিনটি শব্দ বাদ পড়েছে, অর্থাৎ 'ওয়া মা খালাক্বা' (আর [তাঁর শপথ] যিনি সৃষ্টি করেছেন)।

মুসহাফে 'উসমানীতে যেভাবে লিপিবদ্ধ আছে, কিছু কিছু তিলাওয়াতে তার মধ্যে কয়েকটি শব্দের সংযোজন ঘটানো হয়েছে। ইমাম বুখারী এই মর্মে ইবনু আব্বাসের একটি বক্তব্য সংগ্রহ করেছেন। তা হলো, যখন

وانذر عشيرتك الاقربين و رهطك منهم المخلصين

"তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে এবং (বিশেষত) তাদের মধ্যে যারা আন্তরিক–তাদেরকে সতর্ক করে দাও।"

–শীর্ষক আয়াতটি যখন নাযিল হলো, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ গিয়ে সাফা পাহাড়ে উঠে চিৎকার করে বলেন..."[১] ইবনু আব্বাস যে আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা হলো সূরা আশ শুআরা'র ২১৪ নং আয়াত। তবে তার কেবল প্রথমার্ধই ("তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দাও")

১ সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৪৬৭, নং ৪৯৫। দ্রষ্টব্যঃ আরবিতে কুরআনের আয়াতের যে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে অনুবাদক তার দ্বিতীয়ার্ধের অনুবাদ করেননি।

মুসহাফে 'উসমানীতে বিদ্যমান। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেছেন, এটি হলো প্রকৃতপক্ষে নাসখ এর একটি দৃষ্টান্ত।[১]

৭. সমার্থবোধক শব্দ প্রতিস্থাপনের ভিন্নতা; এ প্রকারের উদ্ধৃতি দিয়েছেন ইবনু আব্দিল বার। সূরা আল কারিয়া'র ৫ নং আয়াতে ইবনু মাস'উদের তিলাওয়াতে এর একটি দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে। كالعهن المنفوش পড়ার পরিবর্তে তিনি كالصوف المنفوش পড়েছেন। উভয় শব্দের অর্থ হলো 'রং-বেরঙের ধূনা পশমের মতো'।[২]

ইবনুল জাযারী ও আবুল ফজল রাজীর ন্যায় অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্নমুখী তিলাওয়াত প্রসঙ্গে তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা তুলে ধরেছেন। রাজী লিখেছেন, ভাষার ভিন্নতা নিম্নোক্ত সাতটি অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ:

১. এক বচন, দ্বিবচন ও বহুবচন এবং পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে বিশেষ্যের ভিন্নতা;

২. অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎকাল ও আদেশ সূচক ক্রিয়ার ভিন্নতা;

৩. ই'রাবের (শব্দের শেষের স্বরধ্বনি—যা বাক্যের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের ভূমিকা নির্দেশ করে) ভিন্নতা;

৪. অক্ষর সংযোজন ও বিয়োজন;

৫. শব্দের বিন্যাস পরিবর্তন;

৬. এক শব্দের মাধ্যমে আরেক শব্দের প্রতিস্থাপন; এবং

৭. উচ্চারণের ভিন্নতা, যেমন: ইমালাহ, ফাত্‌হ, তারকীক, তাফ্‌খীম, ইদ্‌গাম ও ইয্‌হার।[৩]

ইবনু হাজার দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের দেয়া এসব রকমারি ব্যাখ্যার অনেকগুলো দিক মূলত একই রকম।[৪]

---

১ দেখুন দ্বাদশ অধ্যায়।

২ ইবনু হাজার কর্তৃক ফাতহুল বারী গ্রন্থে (খণ্ড ৮, পৃঃ ৬৪৫) উদ্ধৃত।

৩ ইবনু হাজার কর্তৃক ফাতহুল বারী গ্রন্থে (খণ্ড ৮, পৃঃ ৬৪৬) উদ্ধৃত। ইমাম যারকানী তাঁর মানাহিলুল ইরফান গ্রন্থে (খণ্ড ১, পৃঃ ১৪৮) উক্ত মত সমর্থন করেছেন।

৪ ফাতহুল বারী, খণ্ড ৮, পৃঃ ৬৪৫।

সাত ধরনের কিরাআতের তাৎপর্য

আরবি ভাষার সাতটি ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক রূপে কুরআন নাযিল হওয়ার ফলে বিভিন্ন গোত্রের জন্য কুরআন তিলাওয়াত ও মুখস্থ করা সহজ হয়ে গিয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ: কেউ কেউ 'আলাইহিম'কে পড়তেন 'আলাইহুমু'; এমনিভাবে 'ছিরাত' (পথ, সেতু) শব্দকে কেউ 'সিরাত' আবার কেউ 'যিরাত'; এবং কেউ কেউ 'মু'মিন' (বিশ্বাসী) শব্দটিকে 'মুমিন' পড়তেন। এর ফলে নবী ﷺ এর জীবদ্দশায় তাঁর অসংখ্য সাহাবী কুরআনের একটি বিশাল অংশ মুখস্থ করে ফেলতে সক্ষম হন। যেহেতু আরবের অধিকাংশ লোক পড়তে ও লিখতে অক্ষম ছিলেন এবং কুরআনের বেশীরভাগ অংশ নবী ﷺ এর জীবদ্দশায় মুখস্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়েছিল, সেহেতু মুখস্থকরণে সহায়ক হতে পারে–এমন প্রত্যেকটি বিষয় ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ভিত্তিতে বলা যায় যে, সাত পদ্ধতিতে কুরআন নাযিলের বিষয়টি কুরআনের বাস্তব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আরো উল্লেখ্য যে, কুরআনের যেসব অংশ নবী ﷺ এর জীবদ্দশায় লেখা হয়েছিল নবী ﷺ এর ইন্তেকালের পর কুরআন সঙ্কলনের সময় সেগুলোর বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের একমাত্র উপায় ছিল – কুরআনের যা কিছু মুখস্থ করা হয়েছিল–তার সাথে মিলিয়ে দেখা। এ কারণে যত বেশী সংখ্যক লোকের পক্ষে কুরআন মুখস্থ করা সম্ভব হয়েছিল, কুরআন সঙ্কলন ও মিলিয়ে দেখার ক্ষেত্রে ততোটাই বিশুদ্ধতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। মুখস্থকরণ প্রক্রিয়া সহজ করে দেওয়ার ফলে পরবর্তীতে নির্ভুলভাবে কুরআন সঙ্কলনের ক্ষেত্রে তা একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

কুরআনের বহু জায়গায় আল্লাহ তা'আলা সমকালীন আরবদেরকে কুরআনের সবচেয়ে ছোট্ট সূরাটির অনুরূপ একটি সূরা রচনার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। কুরআনের রচনাশৈলীর অননুকরণীয়তা ছিল একটি অলৌকিক বিষয় যা থেকে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, কুরআন অবশ্যই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। সাতটি প্রধান প্রধান গোত্রের কেউই নিজেদের আঞ্চলিক ভাষায়ও কুরআনের সমতুল্য কোনো কিছু রচনা করতে সমর্থ না হওয়ায় এর অলৌকিকত্বের বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে; কারণ তখন কেউ এ দাবী

করতে পারেনি যে, তার নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষায় না হওয়ার কারণে তার পক্ষে তা অনুকরণ করা এমন কঠিন হয়ে পড়েছে।

কুরাইশদের আঞ্চলিক ভাষা

খলিফা 'উসমানের শাসনামলের মাঝামাঝি সময়ে আশেপাশের প্রদেশগুলোতে কুরআন পাঠ সংক্রান্ত কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার আগ পর্যন্ত সাত পদ্ধতিতে কুরআন তিলাওয়াত অব্যাহত থাকে। কিছু কিছু আরব গোত্র তাদের গোত্রীয় পাঠের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে অহঙ্কার করতে শুরু করে; ধীরে ধীরে তার প্রতিযোগীও তৈরী হতে থাকে। একই সময়ে কিছু নওমুসলিম অজ্ঞতার কারণে সাত পদ্ধতির কিরাআতের একটিকে আরেকটির সাথে মিশিয়ে একাকার করে দিতে শুরু করে। খলিফা 'উসমান কুরাইশী আঞ্চলিক ভাষা অনুযায়ী কুরআনের সরকারী অনুলিপি প্রস্তুত করে ইসলামের প্রধান প্রধান কেন্দ্রসমূহে কুরআন প্রশিক্ষকসহ সেসব অনুলিপি প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। সাহাবীদের সকলেই এ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে থাকা অন্য সব কপি ধ্বংস করে ফেলেন। সরকারী অনুলিপি বিতরণ করার পর অন্য সকল আঞ্চলিক পাঠ বাতিল হয়ে যায় এবং কুরআন কেবল একটি মাত্র আঞ্চলিক ভাষাতেই পঠিত হতে থাকে। বর্তমান পৃথিবীর সর্বত্র যে কুরআন বিদ্যমান–তা কেবল কুরাইশদের আঞ্চলিক ভাষা অনুযায়ী লিখিত ও পঠিত।[১] অন্য ছয়টি কিরাআত আর বেঁচে নেই–এর মানে এই নয় যে, কুরআনের কোনো অংশ হারিয়ে গিয়েছে। নবী ﷺ সাহাবীদেরকে তাঁদের সুবিধামতো সাতটি কিরাআতের যে কোনো একটি অনুযায়ী তিলাওয়াত করার অনুমতি দিয়েছিলেন, কারণ সেগুলোর অর্থ ছিল একই, শব্দের ভিন্নতাও ছিল প্রতিশব্দ পর্যায়ের; আর তাঁরাই সর্বসম্মতভাবে অবশিষ্ট ছয়টি কিরাআতকে সংরক্ষণ না

---

১ এটি একদল বিশেষজ্ঞের মত। অন্যদের মতে, আঞ্চলিক ভাষাসমূহের কিছু কিছু দিক বিভিন্নমুখী কিরাআতের মধ্যে সংরক্ষিত হয়েছে; তবে এ ক্ষেত্রে কেবল সেসব দিককেই সংরক্ষণ করা হয়েছে যা 'উসমানী মুসহাফের সাথে সামঞ্জস্য বিধানযোগ্য। তারা বলেন, সাহাবায়ে কেরামগণ এমনভাবে 'উসমানী মুসহাফ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, তাতে 'উসমানী মুসহাফের সাথে সামঞ্জস্য বিধানযোগ্য সর্বোচ্চ সংখ্যক তিলাওয়াতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুয়ূতী, ইবনু হাজার ও ইবনুল জাযারী – এদের সকলেই দ্বিতীয় মতটিকে সমর্থন দিয়ে বলেছেন যে, এটি অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মত। দেখুন আল ইতকান, খণ্ড ১, পৃঃ ১৪২, ও মা আল মাছাহিফ, পৃঃ ৩৪।

করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যদি এর দ্বারা কুরআনের ক্ষুদ্রতম কোনো অংশ কোনোভাবে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকতো, তাহলে সর্বসম্মতভাবে এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কিছুতেই সম্ভব হতো না। সুতরাং কুরাইশদের আঞ্চলিক ভাষায় যে কুরআন বর্তমান পৃথিবীতে সংরক্ষিত রয়েছে–তা সন্দেহাতীতভাবে সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত ওহীর একটি যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ সঙ্কলন।

কিরাআত (পাঠ বা আবৃত্তি)

অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিরাআত বলতে কুরআন পাঠের উচ্চারণ পদ্ধতিকে বুঝানো হয়। এসব পদ্ধতি সাত ধরনের কিরাআত থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। খলিফা 'উসমানের শাসনামলে সাত ধরনের কিরাআতকে কমিয়ে একটিতে সীমাবদ্ধ করা হয় এবং তিনি শুধু কুরাইশী আঞ্চলিক ভাষায় কুরআনের অনুলিপি তৈরী করে তৎকালীন ইসলামী কেন্দ্রসমূহে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এর ফলে পৃথিবীতে এখন যে কুরআন বিদ্যমান তা কেবল কুরাইশী আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত; আর বিভিন্ন ধরনের কিরাআত মূলত এরই উপর ভিত্তিশীল। কুরআন তিলাওয়াতে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন–এমন কয়েকজন প্রখ্যাত সাহাবীর মাধ্যমে বিভিন্নমুখী তিলাওয়াতসমূহের সনদ নবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এসব সাহাবী নবী ﷺ-কে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন কিংবা তাঁর উপস্থিতিতে পাঠ করে তাঁর অনুমোদন লাভ করেছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন–উবাই ইবনু কা'ব, আলী ইবনু আবী তালিব, যাইদ ইবনু সাবিত, ইবনু মাস'ঊদ, আবুদ দারদা ও আবু মূসা আশআরী رضي الله عنه প্রমুখ। অনেক সাহাবী এসব বিশেষজ্ঞের নিকট থেকে কুরআন শিক্ষা লাভ করেছেন। সাহাবীদের মধ্যে কুরআনের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইবনু আব্বাস উবাই ও যাইদ رضي الله عنهما–উভয়ের নিকট থেকে কুরআন তিলাওয়াত শিখেছেন।[১]

পরবর্তী প্রজন্মের মুসলিমদের (তাবিঊন) মধ্যে অসংখ্য বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব ঘটেছিল যারা সাহাবীদের নিকট থেকে বিভিন্নমুখী তিলাওয়াত আয়ত্ত করে অন্যদেরকে শিখিয়েছিলেন। মদীনা, মক্কা, কুফা, বসরাহ ও শামে কুরআন

---

১ আল ইতক্বান, খণ্ড ১, পৃঃ ২০৪।

তিলাওয়াতের অনেক কেন্দ্র গড়ে ওঠে, যার ফলে কুরআন তিলাওয়াত জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে বিকাশ লাভ করে।[১] 'ঈসায়ী অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী বিপুল সংখ্যক বিশেষজ্ঞ বিদ্যমান ছিলেন–যাদের সবাই ছিলেন কুরআন তিলাওয়াত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তাদের অধিকাংশের তিলাওয়াত পদ্ধতি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনা পরম্পরার মাধ্যমে নবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। বর্ণনা পরম্পরার প্রতিটি স্তরে সেসব পদ্ধতিকে মুতাওয়াতির হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে; আর এসব বর্ণনাকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মনে করা হয়। যেসব বর্ণনা পদ্ধতিতে বর্ণনাকারীর সংখ্যা অল্প, কিংবা কোনো স্তরে মাত্র একজন–সেগুলোকে বলা হয় 'শায'। তবে, পরবর্তী যুগের কতিপয় বিশেষজ্ঞ পূর্ববর্তী যুগের বেশ কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞকে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও বিশুদ্ধ তিলাওয়াতকারী হিসেবে আখ্যায়িত করার প্রথা চালু করেন।

'ঈসায়ী দশম শতকের (হিজরী ষষ্ঠ শতক) মাঝামাঝি সময়ে সর্বোত্তম তিলাওয়াতকারীদের সংখ্যা সাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার একটি জনপ্রিয় রীতি গড়ে ওঠে; কারণ এ সংখ্যাটি আরবি ভাষার যেসব আঞ্চলিক রূপে কুরআন নাযিল হয়েছিল সে সংখ্যার সাথে কাকতালীয়ভাবে মিলে যায়। একইভাবে, এ যুগে ইসলামী আইনের মাযহাব সংখ্যা কমিয়ে চারটিতে নিয়ে আসা হয়। এর পূর্বে এমন একটা সময় ছিল যখন ইসলামী আইনের মাযহাব সংখ্যা ছিল আরো অনেক বেশী। সর্বপ্রথম যিনি বিশুদ্ধ তিলাওয়াতকারীর সংখ্যা সীমিত করে দিয়েছিলেন, তিনি হলেন ইরাকী বিশেষজ্ঞ আবু বকর ইবনু মুজাহিদ (মৃত্যু ৯৩৬ 'ঈসায়ী)। তার পর যারা কিরাআত বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন তারা সবাই তার প্রথার অনুসরণ করেছেন।[২] তবে সংখ্যার এ সীমিতকরণ কুরআন তিলাওয়াত বিষয়ে প্রাচীন বিশেষজ্ঞদের সংখ্যার সঠিক চিত্র তুলে ধরে না। আরো অনেক কুরআন তিলাওয়াত বিশেষজ্ঞ ছিলেন যারা মানের দিক দিয়ে উক্ত সাতজনের সমপর্যায়ের, এমনকি অনেকে ছিলেন তাদের চেয়েও শ্রেয়। বিশেষজ্ঞদের এ শ্রেণীবিন্যাসের মাধ্যমে মূলত এ বিষয়ের শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে যে, কোন কোন কারীর তিলাওয়াত পদ্ধতি

---

১ প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃঃ ২০৪-৫।

২ আল ইতকান, খণ্ড ১, পৃঃ ২২৪।

বিশুদ্ধ। এ কারণে, সাতজন বিশেষজ্ঞ দ্বারা মূলত বিভিন্ন প্রজন্মের সেসব প্রাথমিক বিশেষজ্ঞকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাদের তিলাওয়াত পদ্ধতির বর্ণনা পরম্পরার প্রতিটি পর্যায়ে সর্বাধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী রয়েছে। তবে আরো অনেক প্রাচীন বিশেষজ্ঞ রয়েছেন যাদের তিলাওয়াত পদ্ধতি উপরোক্ত সাতজনের তিলাওয়াত পদ্ধতির ন্যায় মুতাওয়াতির পর্যায়ের বিশুদ্ধতা সহকারে সংরক্ষিত হয়েছে। যেসব বিশেষজ্ঞের কুরআন তিলাওয়াত পদ্ধতি সর্বোত্তমভাবে সংরক্ষিত হয়েছে তাদের দশজনের একটি তালিকা নিম্নরূপ:

১. আবু আমর ইবনুল আলা (মৃত্যু ৭৭১ 'ঈসায়ী/১৫৪ হিঃ), বসরা।

২. ইবনু কাসীর (মৃত্যু ৭৩৮ 'ঈসায়ী/১১৯ হিঃ)। তিনি মক্কার সাহাবীদের ছাত্র ছিলেন।

৩. নাফি (মৃত্যু ৭৮৬ 'ঈসায়ী/১৬৯ হিঃ)। তার আদি নিবাস ছিল ইস্পাহান। ওয়ারসের বর্ণনা অনুযায়ী তার তিলাওয়াত ছিল মদীনা কেন্দ্রিক।

৪. ইবনু আমির (মৃত্যু ৭৩৭ 'ঈসায়ী/১১৮ হিঃ)। তিনি ওলীদ ইবনু আব্দিল মালিকের শাসনামলে দামেশকের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ওলীদ ও অন্যান্য উমাইয়া খলিফাগণ দামেশককে নিজেদের রাজধানী বানিয়েছিলেন।

৫. আসিম (মৃত্যু ৭৪৬ 'ঈসায়ী/১২৮ হিঃ)। তিনি ছিলেন কুফার অধিবাসী। বর্তমানে যে তিলাওয়াত সর্বাধিক প্রচলিত, তিনি তার বর্ণনাকারী। হাফসের বর্ণনানুযায়ী, তার বর্ণনা আফ্রিকা বাদে বর্তমান মুসলিম বিশ্বে সর্বাধিক পঠিত।

৬. হামযাহ (মৃত্যু ৭৭৩ 'ঈসায়ী/১৫৬ হিঃ)। তিনি ছিলেন কুফার অধিবাসী।

৭. কিসা-ঈ (মৃত্যু ৮০৫ 'ঈসায়ী/১৮৯ হিঃ)। কুফার এ বর্ণনাকারী ছিলেন একজন প্রথম সারির ব্যাকরণবিদ। আরবি ব্যাকরণের নিয়ম-নীতি প্রণয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

৮. আবু জা'ফর (মৃত্যু ৭৫০ 'ঈসায়ী/১৩২ হিঃ), মদীনা।

৯. ইয়া'কুব (মৃত্যু ৮২০ 'ঈসায়ী/২০৪ হিঃ), বসরা।

১০. খালাফ (মৃত্যু ৮৪৪ 'ঈসায়ী/২২৯ হিঃ), বাগদাদ।

নবী ﷺ এর সুন্নাহ্‌র বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের জন্য হাদীস বিশেষজ্ঞগণ যখন বিভিন্ন শর্ত আরোপ করেছিলেন, ঠিক একই সময়ে কুরআন তিলাওয়াত বিশেষজ্ঞগণও বিদ্যমান তিলাওয়াতসমূহকে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করার সুবিধার্থে বিভিন্ন শর্ত আরোপ করেছিলেন। কোনো তিলাওয়াতকে বিশুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করতে হলে সেটিকে অবশ্যই তিনটি শর্ত পূরণ করতে হতো। এসব শর্তের কোনো একটিও অনুপস্থিত থাকলে উক্ত তিলাওয়াতকে শায (অস্বাভাবিক) শ্রেণীভুক্ত করা হতো। প্রথম শর্তটি ছিল, উক্ত তিলাওয়াতটির একটি প্রামাণ্য বর্ণনা পরম্পরা থাকতে হবে; অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের পরম্পরা নিরবচ্ছিন্ন হতে হবে; বর্ণনাকারীদের ন্যায়পরায়ণ হিসেবে পরিচিতি থাকতে হবে এবং তাদের উত্তম স্মৃতিশক্তির বিষয়টি জ্ঞাত হতে হবে। সাথে এ শর্তও ছিল যে, বর্ণনা পরম্পরায় সাহাবীদের নীচের প্রত্যেকটি স্তরে বিপুল সংখ্যক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে উক্ত তিলাওয়াতটি বর্ণিত হতে হবে যেটি মূলত তাওয়াতুরের শর্ত। যেসব বর্ণনায় বর্ণনা পরম্পরা সুরক্ষিত আছে কিন্তু তাওয়াতুরের শর্ত নেই, সেগুলোকে সাহাবীদের ব্যাখ্যা (তাফসীর) হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু কুরআন তিলাওয়াতের পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে যেসব তিলাওয়াতের বর্ণনা পরম্পরা সুরক্ষিত নেই, সেগুলোকে অগ্রহণযোগ্য শ্রেণীভুক্ত করে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

দ্বিতীয় শর্তটি ছিল, তিলাওয়াতের ভিন্নতাসমূহকে আরবি ব্যাকরণের পরিচিত গঠনশৈলীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। অস্বাভাবিক গঠনশৈলীসমূহকে প্রাক-ইসলামী যুগের গদ্য কিংবা পদ্যে ব্যবহৃত গঠনশৈলীর সাথে তুলনামূলকভাবে যাচাই করা হয়েছে।

তৃতীয় শর্তানুযায়ী, তিলাওয়াতটিকে কুরআনের সেসমস্ত কপির যে কোনো একটি লিপির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে, যা খলিফা ‘উসমানের শাসনামলে বিতরণ করা হয়েছিল। এ কারণে, নুক্তার (বিন্দু) স্থান পরিবর্তন থেকে উদ্ভূত পার্থক্যসমূহকে (যেমন তা‘লামুন ও ইয়া‘লামুন) গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়; তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই অন্যান্য শর্তাবলী পূরণ হতে হবে। অস্বাভাবিক অবস্থার পক্ষে কোনো সমর্থন না পাওয়া গেলে সেই গঠনশৈলীকে শায শ্রেণীভুক্ত করা হবে।[১] এই শ্রেণীবিন্যাসের মানে এই ছিল না যে, উক্ত

১ আল ইতকান, খণ্ড ১, পৃঃ ২১৪।

তিলাওয়াতের সবক'টি দিককেই শায মনে করা হতো; বস্তুত গৃহীত দশটি পদ্ধতির কোনোটিই শায গঠনশৈলী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। এ ধরনের শায বর্ণনাসমূহ প্রামাণ্য বর্ণনাসমূহের ব্যাখ্যা হিসেবেও কাজ করেছে, কারণ এগুলো ছিল স্পষ্টতই সাহাবীদের বক্তব্য।

তাজওয়ীদ (যথাযথ পদ্ধতিতে কুরআন তিলাওয়াত)

নুবুওয়্যাতের শুরু থেকেই কুরআন তিলাওয়াতের উপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করা হতে থাকে। খোদ 'কুরআন' নামটির অর্থ হলো পড়া বা আবৃত্তি করা; আর কুরআনের প্রথম নাযিলকৃত আয়াতটি ছিল:

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ﴿۱﴾

"পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"[১]

স্বয়ং নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে যত বেশী পরিমাণে সম্ভব কুরআন তিলাওয়াতের আহ্বান জানিয়েছেন। ইবনু মাস'ঊদ رضي الله عنه বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন,

من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنة و الحسنة بعشر امثالها

"যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি অক্ষর তিলাওয়াত করবে, সে একটি কল্যাণ লাভ করবে; আর প্রত্যেকটি কল্যাণ দশগুণ পর্যন্ত বর্ধিত হয়ে থাকে।"[২]

আবু উমামাহ বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন,

اقرؤوا القران فانه ياتى يوم القيامة شفيعا لاصحابه

"কুরআন তিলাওয়াত করো, কারণ কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকদের জন্য সুপারিশকারী হিসেবে আবির্ভূত হবে।"[৩]

---

১ সূরা আল আলাক (৯৬): ১।

২ তিরমিযী কর্তৃক সংগৃহীত এ হাদীসটিকে নাসিরুদ্দীন আলবানী তাঁর সহীহু সুনানিত তিরমিযী (খণ্ড ৩, পৃঃ ৯, নং ২৩২৭) গ্রন্থে প্রামাণ্য আখ্যায়িত করেছেন। দেখুন টীকা নং ৯৪।

৩ এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম মুসলিম (সহীহু মুসলিম, খণ্ড ২, পৃঃ ৩৮৫, নং ১৭৫৭)।

বস্তুত আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে প্রতি মাসে সমগ্র কুরআন একবার পাঠ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর বর্ণনা করেছেন যে, যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে প্রতি মাসে সমগ্র কুরআন একবার পাঠ করতে বললেন; তখন তিনি বললেন, "আমার তো প্রতি মাসে সমগ্র কুরআন একাধিকবার পাঠ করার সামর্থ্য রয়েছে।" তখন নবী ﷺ তাঁকে দশ দিনে একবার সমগ্র কুরআন তিলাওয়াত করতে বললেন, তারপরও তিনি এই বলে পিড়াপিড়ি করতে লাগলেন যে, তার তো আরো বেশী পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করার সামর্থ্য রয়েছে। তখন নবী ﷺ তাকে সাত দিনের কম সময়ে সমগ্র কুরআন তিলাওয়াত না করার নির্দেশ দিলেন।[১] কুরআনের যেটুকু অংশ আমরা মুখস্থ করেছি তা যেন ভুলে না যাই–সে বিষয়েও নবী ﷺ আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

تعاهدوا هذا القران فو الذى نفس محمد بيده هو اشد تفلتا من الابل فى عقلها

"নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করো। কারণ যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! যে রশি দিয়ে উটকে বেঁধে রাখা হয় তা খুলে দিলে উট যত দ্রুততার সাথে বেরিয়ে যায়; তার চেয়েও দ্রুত গতিতে তোমাদের মুখস্থকৃত আয়াত তোমরা ভুলে যাবে।"[২]

ফলশ্রুতিতে মুহাম্মাদ ﷺ এর নুবুওয়্যাতের প্রথম দিনগুলো থেকে শুরু করে এর পূর্ণতা লাভ করা পর্যন্ত কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কুরআন যেভাবে নাযিল হয়েছে হুবহু সেভাবেই যেন তিলাওয়াত করা হয়–এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ যত্ন নেয়া হয়েছে। যেসব বিশেষজ্ঞ কুরআন তিলাওয়াত বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন–তারা প্রামাণ্য তিলাওয়াতসমূহের ভিত্তিতে তিলাওয়াতের নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। বস্তুত এসব নীতিমালা আরবি ধ্বনিতত্ত্বের ন্যায় মৌলিক বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করেছে, যেখানে আরবি বর্ণমালার অক্ষর, স্বতন্ত্র শব্দ ও বাক্য উচ্চারণ করার সঠিক পদ্ধতির রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। বিশুদ্ধভাবে

---

১ এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম বুখারী (সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৫১৬-৭, নং ৫৭২) ও ইমাম মুসলিম (সহীহু মুসলিম, খণ্ড ২, পৃঃ ৫৬৩, নং ২৫৮৮)।

২ এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম বুখারী (সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৫০৫-৬, নং ৫৫২) ও ইমাম মুসলিম (সহীহু মুসলিম, খণ্ড ১, পৃঃ ৩৭৯, নং ১৭২৫)।

কুরআন তিলাওয়াত করার এই তাগিদ থেকে জ্ঞানের যে শাখাটি বিকশিত হয়েছে, তার নাম 'তাজওয়ীদ' শাস্ত্র। তাজওয়ীদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, নবী ﷺ এর যুগের আরবরা যে প্রমিত আরবি উচ্চারণ করতো তদনুরূপ বিশুদ্ধ ও স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জণবর্ণ, শব্দ ও বাক্যকে উচ্চারণ করার নাম হলো 'তাজওয়ীদ'। বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ের উপরও গুরুত্বারোপ করেছেন যে, এটি অবশ্যই মাত্রাতিরিক্ত অলঙ্করণ ও অস্বাভাবিক ঢঙের অত্যধিক ব্যবহার থেকে মুক্ত থাকতে হবে। তবে প্রত্যেকের উচিত সম্ভাব্য সর্বোত্তম স্বভাবজাত স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করা; কারণ নবী ﷺ বলেছেন,

زينوا القران باصواتكم

"তোমরা নিজেদের স্বরের মাধ্যমে কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করো।"[১]

তবে উল্লেখ্য যে, তিলাওয়াতের শিল্পমাধুর্যের উপর ব্যাপক গুরুত্বারোপ করা হলেও, স্বয়ং শৈল্পিক ও সুমধুর সুরের তিলাওয়াতকে কেবল লক্ষ্য হিসেবে স্থির করা হয়নি। তিলাওয়াত হলো কুরআনের অন্তর্নিহিত বার্তা অনুধাবন ও বাস্তবায়নের একটি মাধ্যম। সাধারণভাবে বলতে গেলে, নিছক চোখ বুলানোর চেয়ে তিলাওয়াত উত্তম, কারণ এতে বাক ও শ্রবণ-ইন্দ্রিয়সমূহ জড়িত থাকে; আর এ সবই কুরআনের অন্তর্নিহিত বার্তাকে গভীরভাবে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আর এ উদ্দেশ্য সাধনের স্বাভাবিক দাবী হলো, কুরআন তিলাওয়াত হতে হবে একাগ্রচিত্তে তারতিলের সাথে এবং তার অর্থ ও মর্ম অনুধাবন করে; নিছক আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে নয়।

---

১ এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, আহমদ, দারিমী ও ইবনু হিব্বান সংগ্রহ করেছেন

১০

আসবাবুন নুযূল

কুরআন হলো স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের জন্য সার্বজনীন পথনির্দেশনা– যা তাদের নিজ স্রষ্টা ও সকল সৃষ্টির সাথে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে। তবে, কুরআন নাযিল হয়েছে এমন এক ব্যক্তির নিকট যিনি একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানের একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে জীবন যাপন করেছেন। তাই স্বাভাবিক কারণেই, মাঝেমধ্যে এমনসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যেগুলোর সমাধানের ব্যাপারে নবী ﷺ এর অনুসারীদের কোনো ধারণা ছিল না; কিংবা অনেক সময় তারা নবী ﷺ-কে এমন অনেক ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন, যে বিষয়ে তাদের কোনো সুস্পষ্ট জ্ঞান ছিল না। এসব প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে নবী ﷺ এর নিকট কুরআনের বিভিন্ন আয়াত নাযিল হয়েছে। এসব ঘটনাপ্রবাহকে ওহী নাযিলের প্রসঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়; আর এগুলোকে বলা হয় 'আসবাবুন নুযূল'[১] বা ওহী নাযিলের নেপথ্য কারণসমূহ। তবে সেসব ওহী বিশেষ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হলেও তাতে এমন কিছু দিকনির্দেশনা রয়েছে যার তাৎপর্য স্থান ও কালের গণ্ডি পেরিয়ে সার্বজনীন ও শাশ্বত গুরুত্ব লাভ করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, খাওলাহ বিনতু সা'লাবাকে তার স্বামী আওস ইবনুস সামিত যিহার[২] করার প্রেক্ষিতে তিনি নবী ﷺ এর নিকট নালিশ করতে গেলেন। নবী ﷺ এর স্ত্রী আয়েশা বলেন, "বরকতময় তিনি যিনি সবকিছু শোনেন। খাওলাহ বিনতু সা'লাবা যখন নবী ﷺ এর নিকট তার স্বামীর ব্যাপারে নালিশ করছিলেন তখন আমি তার কিছু কথা খুব ভালোভাবেই শুনেছি। তিনি বলেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমি আমার যৌবনকাল তার

---

১ আমাদের এ অঞ্চলে 'আসবাবুন নুযুল' পরিভাষাটি 'শানে নুযুল' হিসেবে সমধিক পরিচিত—সম্পাদক

২ আরবদের প্রথা অনুযায়ী স্ত্রীকে এ কথা বলা যে, 'তুমি আমার নিকট আমার মায়ের পিঠের মতো'।

নিকট কাটিয়েছি এবং বেশ কয়েকটি সন্তান জন্ম দিয়েছি। এখন আমি বৃদ্ধা হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে সে আমার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে। হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট নালিশ করছি'!"। এক সন্ধ্যা পার হওয়ার আগেই জিবরাঈল ﷺ নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নিয়ে হাজির হন:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا

"আল্লাহ ঐ ব্যক্তির বক্তব্য শুনেছেন, যে তোমার নিকট তার স্বামীর ব্যাপারে নালিশ দায়ের করছিল।"[১]

এ কারণে ওহী নাযিলের নেপথ্য কারণসমূহকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যে, তা হলো– মুহাম্মাদ ﷺ এর নুবুওয়্যাত সময়ের এমন কিছু ঘটনা যার প্রেক্ষিতে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত বা সূরা নাযিল হয়েছে।[২]

কোনো আয়াত নাযিলের নেপথ্য কারণ জানার উপায়

কোনো বিশেষ ওহীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা কেবল তারাই জানতে পারেন যারা সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কিংবা প্রত্যক্ষদর্শীদের কেউ যাকে অবহিত করেছেন। সুতরাং জ্ঞানের এ শাখার একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস হলেন সাহাবায়ে কেরামগণ। নবী ﷺ এর হাদীসসমূহের ন্যায় এসব বর্ণনার নির্ভরযোগ্যতাও বর্ণনাকারীদের পরম্পরার বিশুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল। কোনো আয়াত নাযিলের নেপথ্য কারণ প্রসঙ্গে কোনো তাবি'ঈর বক্তব্যকে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ সাধারণত দুর্বল হিসেবে গণ্য করেছেন, যদি ঐ তাবি'ঈ তার মতকে কোনো সাহাবী থেকে বর্ণনা না করে থাকেন।[৩]

১ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনু মাজাহ (খণ্ড ৩, পৃঃ ২৪৩, নং ২০৬৩) ও ইবনু আবী হাতিম। নাসিরুদ্দীন আলবানী সহীহু সুনানি ইবনি মাজাহ গ্রন্থে (খণ্ড ১, পৃঃ ৩৫১-২, নং ১৬৭৮) এটিকে প্রামাণ্য আখ্যায়িত করেছেন। উদ্ধৃত আয়াতটি কুরআনের সূরা আল মুজাদালাহ (৫৮) এর ১ নং আয়াত।

২ দেখুন মানাহিলুল ইরফান, খণ্ড ১, পৃঃ ৯৯।

৩ দেখুন প্রিন্সিপলস অব ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স, পৃঃ ৩৯।

আসবাবুন নুযূলের গুরুত্ব

কুরআনে বর্ণিত বহু আইনের তাৎপর্য অনুধাবন করার ক্ষেত্রে ওহীর নেপথ্য কারণের জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওহীর নেপথ্য কারণের জ্ঞানের কিছু উপকারিতা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. প্রায়শ আসবাবুন নুযূলে কতিপয় ইসলামী আইনের নেপথ্য কারণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রতিটি আইনের নেপথ্যে বিদ্যমান প্রজ্ঞাসংক্রান্ত জ্ঞান বিশেষজ্ঞদেরকে এমন কিছু সাধারণ মূলনীতি সরবরাহ করে দেয় যার ফলে তারা একই ধরনের নতুন নতুন সমস্যাদির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নে সক্ষম হন। যেকোনো সমস্যা নিরসনে ইসলামী আইন মানুষের সার্বিক কল্যাণকে কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছে– আসবাবুন নুযূল থেকে তার একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তা'আলার অপার দয়া—যা সকল ঐশী আইনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ—সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারি।

দৃষ্টান্তস্বরূপ: ইবনু আব্বাস ﵄ বর্ণনা করেছেন যে, হিলাল ইবনু উমাইয়া নবী ﷺ এর নিকট গিয়ে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে শুরাইক ইবনু শাহমার সাথে ব্যভিচারের অভিযোগ দায়ের করেন। নবী ﷺ তাকে বললেন, "প্রমাণ (অর্থাৎ চারজন সাক্ষী) নিয়ে এসো, অন্যথায় তোমাকে তোমার পিঠে (আশিটি বেত্রাঘাতের) শাস্তি নিতে হবে।" হিলাল জবাব দিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর উপর অন্য কোনো পুরুষকে দেখতে পায়, তাহলে কি সে ওখান থেকে চুপচাপ চলে গিয়ে সাক্ষী খুঁজে বেড়াবে?" আল্লাহর রাসূল পুনরায় বললেন, "প্রমাণ নিয়ে এসো, অন্যথায় তোমাকে শাস্তি নিতে হবে।" হিলাল তখন বললেন, "ঐ সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমি সত্য কথাই বলছি। আর আমার পিঠকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে আল্লাহ অবশ্যই কিছু না কিছু নাযিল করবেন।" অতঃপর জিবরাঈল ﵇ নিম্নোক্ত ওহী নিয়ে হাজির হন:

وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ
شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٦ وَ الْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ

الْكٰذِبِيْنَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٨﴾
وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَاۤ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٩﴾

"আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে এবং তাদের কাছে তারা নিজেরা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো সাক্ষী থাকে না, তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য হচ্ছে (এই যে, সে) চার বার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে সাক্ষ্য দেবে যে, সে (নিজের অভিযোগে) সত্যবাদী এবং পঞ্চম বার বলবে, তার প্রতি আল্লাহর লা'নত হোক যদি সে (নিজের অভিযোগে) মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে। আর স্ত্রীর শাস্তি এভাবে রহিত হতে পারে, যদি সে চার বার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, এ ব্যক্তি (তার অভিযোগে) মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলে, তার নিজের ওপর আল্লাহর গজব নেমে আসুক যদি এ ব্যক্তি (তার অভিযোগে) সত্যবাদী হয়।"[১]

২. আয়াতের সাধারণ অর্থগুলোর মধ্য থেকে বিশেষ কোন অর্থটি বাঞ্ছিত–ওহীর নেপথ্য কারণসমূহ মাঝেমধ্যে তা সুনির্দিষ্ট করে দেয়। অর্থাৎ, আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ অনেক সময় এতোটা সাধারণ হতে পারে যে, মানুষ তার মধ্যে এমনসব বিষয়াদিও অন্তর্ভুক্ত করে ফেলতে পারে যা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য নয়। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো নিম্নোক্ত আয়াত:

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَاۤ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ
بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨٨﴾

"যারা নিজেদের কার্যকলাপে আনন্দিত এবং যে কাজ যথার্থই তারা নিজেরা করেনি সেজন্য প্রশংসা পেতে চায়, তাদেরকে তুমি আযাব থেকে নিরাপদ মনে করো না; আসলে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী রয়েছে।"[২]

একবার মারওয়ান[৩] তার দারোয়ানকে বললো, "হে রাফি, ইবনু আব্বাসের নিকট গিয়ে তাকে বলো, যদি আমাদের মধ্যে কেউ তার নিজের কার্যকলাপে

১ সূরা আন নূর (২৪): ৬-৯। হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম বুখারী (সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ২৪৫-৬, নং ২৭১), ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনু মাজাহ।

২ সূরা আলে ইমরান (৩): ১৮৮।

৩ মারওয়ান ইবনুল হাকাম ছিলেন মুয়াবিয়ার অধীনে মদীনার গভর্নর। তিনি পরবর্তীতে খলিফা হয়েছিলেন এবং উমাইয়ারা চূড়ান্তভাবে উৎখাত হওয়ার আগ পর্যন্ত তার বংশধরেরা শাসনকার্য পরিচালনা করেছে।

আনন্দিত হয় এবং যে কাজ যথার্থই সে নিজে করেনি সেজন্য প্রশংসা পেতে চায়—এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে যদি শাস্তি পেতে হয়, তাহলে তো আমাদের সকলকেই শাস্তি পেতে হবে।" তার এ মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ইবনু আব্বাস ﵁ জবাব দিলেন, "এ আয়াতের ব্যাপারে তোমাদের সকলের কী হলো? এ আয়াত তো নাযিল হয়েছে আহলে কিতাবদের[১] প্রসঙ্গে।" তারপর তিনি (এর আগের আয়াতটি) পাঠ করেন:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾

"এ আহলি কিতাবদের সেই অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দাও, যা আল্লাহ তাদের থেকে নিয়েছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল: তোমরা কিতাবের শিক্ষা মানুষের মধ্যে প্রচার করবে, তা গোপন করতে পারবে না। কিন্তু তারা কিতাবকে পেছনে ফেলে রেখেছে এবং সামান্য দামে তা বিক্রি করে দিয়েছে; কতই না নিকৃষ্ট কারবার তারা করে যাচ্ছে!"[২]

তারপর ইবনু আব্বাস বলেন, "যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদেরকে কোনো এক ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তখন তারা তা গোপন করে তাঁর সামনে অন্য কিছু উপস্থাপন করেছিল। অতঃপর তারা তাঁকে এ বিশ্বাস করিয়ে চলে গিয়েছিল যে, তারা তাঁকে তাঁর জিজ্ঞাসিত বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছে; এর বিনিময়ে তারা তাঁর প্রশংসা ও ধন্যবাদ আশা করেছিল। তারা জিজ্ঞাসিত বিষয়টি নবী ﷺ থেকে গোপন করে রাখতে সক্ষম হওয়ার কারণে অত্যন্ত খুশিও হয়েছিল।"[৩] সুতরাং এ আয়াতের মাধ্যমে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে বুঝানো হয়নি, যে তার কৃতকর্মের ব্যাপারে খুশি; বরং এর মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা আসমানী কিতাব পেয়ে খুশি, কিন্তু তারপরও তারা তার অর্থসমূহ বিকৃত কিংবা গোপন করে।

---

১ খ্রিস্টান ও ইহুদী।

২ সূরা আলে ইমরান (৩): ১৮৭।

৩ এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম বুখারী (সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৭৩-৪, নং ৯১) ও ইমাম মুসলিম (সহীহু মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃঃ ১৪৫৮, নং ৬৬৮৭)।

৩. ওহীর নেপথ্য কারণসমূহ থেকে মাঝেমধ্যে এমন কতিপয় আইনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—যা সংশ্লিষ্ট আয়াত থেকে বের করে আনা সম্ভব। কোনো আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ থেকে একটি বিশেষ আইনের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে; পক্ষান্তরে যে পরিস্থিতিতে উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে তা খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, সেখান থেকে ভিন্ন একটি আইন বেরিয়ে আসছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ: একবার 'উরওয়াহ ﵁ তার খালা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা ﵂-কে বললেন, "আপনি কি এ আয়াতটি সম্পর্কে জানেন?

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ

"নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া (স্থান দু'টি) আল্লাহর (বিশেষ) নিদর্শন। অতঃপর হজ্ব কিংবা ওমরাহ সম্পাদন করার সময় কোনো ব্যক্তি এ দু' স্থানের মাঝখানে তাওয়াফ (সা'ঈ) করলে তার কোনো পাপ হবে না।"[১]

আমার মনে হয় না যে, হাজ্জের সময় এ দু' স্থানের মাঝখানে সা'ঈ না করলে কারও গুনাহ হবে।" আয়েশা ﵂ জবাব দিলেন, "ভাগ্নে, তুমি কী ভয়ঙ্কর কথা বলছো! তুমি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছ, আয়াতের অর্থ যদি তা-ই হতো, তাহলে আয়াতটির গঠন হতো এরকম—'যে ব্যক্তি এ দু'স্থানের মাঝখানে সা'ঈ করবে না, তার কোনো পাপ হবে না'। কিন্তু এ আয়াত তো নাযিল হয়েছে এ কারণে যে, প্রাক-ইসলামী যুগে আনসাররা[২] (তাদের হাজ্জ্ব কিংবা 'উমরাহকে) সমুদ্র উপকূলের 'ঈসাফ' ও 'নায়লা' নামক দু'টি দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতো। লোকজন সেখানে গিয়ে সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সা'ঈ করে নিজেদের মাথা ন্যাড়া করে নিতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর তারা সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সা'ঈ করা পছন্দ করেনি, কারণ তারা এ কাজ জাহিলি যুগে করতো। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিল করেছেন, "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া (স্থান দু'টি)

---

১ সূরা আল বাকারা (২) : ১৫৮।

২ আক্ষরিক অর্থ 'সাহায্যকারী'। ইসলামের পরিভাষায় এ শব্দটি দ্বারা মদীনার মুসলিমদেরকে বুঝানো হয় যারা নবী (সা.) ও তাঁর সাহাবিরা মক্কা থেকে হিজরত করার পর আশ্রয় দিয়েছিলেন।

আল্লাহর (বিশেষ) নিদর্শন।''[১] আরেকটি বর্ণনায় তিনি এ কথা যোগ করেন, "অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সা'ঈ করতে হবে। অতএব এ দু' স্থানের মাঝখানে সা'ঈ করা থেকে কাউকে অব্যাহতি দেয়া হয়নি।''[২]

যদিও আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ থেকে এমনটি মনে হতে পারে যে, হাজ্জের সময় সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সা'ঈ করা নিছক মুবাহ একটি কাজ; তদুপরি ওহী নাযিলের নেপথ্য কারণ থেকে জানা যায় যে, এটা হাজ্জের একটি ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক অংশ।

ব্যাখ্যার পদ্ধতি

কুরআনের আয়াতসমূহ হতে পারে সাধারণ ('আম) কিংবা সুনির্দিষ্ট (খাস); এবং ওহীর নেপথ্য কারণ আয়াতের সাধারণ অর্থ কিংবা তার বিশেষ অর্থকে সমর্থন করতে পারে অথবা তাকে সীমাবদ্ধ করে দিতে পারে।

১. প্রথম ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যেখানে ওহীর নেপথ্য কারণ আয়াতের স্বাভাবিক অর্থকে সমর্থন করে, সেখানে আয়াতটিকে তার সাধারণ অর্থ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ: আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه বর্ণনা করেছেন যে, ইহূদীরা তাদের মহিলাদেরকে ঋতুকালীন অবস্থায় ঘর থেকে বের করে দিতো। তারা তাদের সাথে নিজেদের ঘরে একসাথে বসবাস করতো না। আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

---

১ সহীহু মুসলিম, খণ্ড ২, পৃঃ ৬৪৪, নং ২৯২৩। কুরআনের আয়াতটি সূরা আল বাকারা'র (২): ১৫৮ নং আয়াত।

২ এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম বুখারী (সহীহুল বুখারী, খণ্ড ২, পৃঃ ৪১২-৩, নং ৭০৬) ও ইমাম মুসলিম (সহীহু মুসলিম, খণ্ড ২, পৃঃ ৬৪৫, নং ২৯২৬)।

"তারা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে; বলে দাও, সেটি একটি অশুচিকর ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থা। এ সময় স্ত্রীদের (সাথে সহবাস) থেকে দূরে থাকো এবং তারা পাক-সাফ না হওয়া পর্যন্ত তাদের ধারে-কাছেও যেও না। তারপর যখন তারা পাক-পবিত্র হয়ে যায় তখন তাদের কাছে যাও, যেভাবে যাবার জন্য আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তাওবা করে ও পবিত্রতা অবলম্বন করে।"[১]

তারপর আল্লাহর নবী ﷺ বললেন,

جامعوهن فى البيوت و اصنعوا كل شيء غير النكاح

"তোমাদের ঘরে তোমরা তাদের সাথেই বসবাস করো, আর তোমরা তাদের সাথে সহবাস ছাড়া সবকিছুই করতে পারো।"[২]

ঋতুবতী মহিলাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়া যাবে না– মর্মে এ আয়াতে যে সাধারণ অর্থ রয়েছে, ওহী নাযিলের পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকেও তার সমর্থন পাওয়া যায়।

২. যেক্ষেত্রে আয়াতের বিশেষ কোনো অর্থ ওহী নাযিলের নেপথ্য কারণ দ্বারা সমর্থিত হয়—সেক্ষেত্রে আয়াতটিকে বিশেষ অর্থের আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ: 'উরওয়াহ ﵀ বর্ণনা করেন যে, আবু বকর ছয়জন কিংবা সাতজন দাস মুক্ত করে দিয়েছিলেন, যাদের সবাইকে ঈমান আনয়নের কারণে নির্যাতন করা হচ্ছিল; আর তারা ছিলেন–বিলাল, আমির ইবনু ফুহাইরা, নাহদিয়া ও তার কন্যা, উম্মু 'ঈসা এবং নাওইল গোত্রের একজন দাসী; আর নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ তাঁর ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল:

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾

১ সূরা আল বাকারাহ (২): ২২২।

২ এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম মুসলিম (সহীহু মুসলিম, খণ্ড ১, পৃঃ ১৭৫-৬, নং ৫৯২), আবু দাউদ (সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ১, পৃঃ ৬৪, নং ২৫৮), তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ।

"আর যে পরম মুত্তাকী ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনের জন্য নিজের ধন-সম্পদ দান করে—তার প্রতি কারো কোনো অনুগ্রহের প্রতিদানস্বরূপ নয়—তাকে তা থেকে দূরে রাখা হবে। সে তো কেবলমাত্র নিজের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজ করে। আর তিনি অবশ্যই (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন।"[১]

আয়াতের শব্দাবলীতে 'পরম মুত্তাকী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যা কোনো কিছুর সর্বোচ্চ মাত্রা নির্দেশ করে। সাধারণ কিছুর পরিবর্তে বিশেষ কোনো কিছু বুঝাতে এ শব্দ ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এসব আয়াতের উদ্দেশ্য হবে আবু বকর সিদ্দীক; পাশাপাশি তার স্বার্থত্যাগের এই অনুপম দৃষ্টান্তে একটি সাধারণ শিক্ষাও রয়েছে।

৩. যেখানে ওহী নাযিলের নেপথ্য কারণটি সুনির্দিষ্ট এবং আয়াতটি সাধারণ অর্থেই নাযিল হয়েছে—সেক্ষেত্রে আয়াতটিকে সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে হবে, যাতে সে আয়াত নাযিলের পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রত্যেকটি অবস্থায় তা প্রয়োগ করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মুসাইয়িব ﵁ বর্ণনা করেন যে, আবু তালিব ﵁ মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকা অবস্থায় আল্লাহর নবী ﷺ তাকে দেখতে এলেন। এ সময় আবু জাহল ও আব্দুল্লাহ ইবনু আবী উমাইয়া আবু তালিবের কাছে ছিলো। নবী ﷺ বললেন, "চাচা, আপনি বলুন, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই'; তাহলে আমি এর ভিত্তিতে আল্লাহর কাছে আপনার জন্য সুপারিশ করবো।" তখন আবু জাহল ও আব্দুল্লাহ বলল, "আবু তালিব, তুমি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করবে?" তারা তাকে বারবার একই প্রশ্ন করতে থাকলো, যতক্ষণ না তিনি বললেন যে, তিনি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মবিশ্বাসই অনুসরণ করছেন। নবী ﷺ বললেন, "আমি আপনার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকবো, যতক্ষণ না আমাকে তা করতে নিষেধ করা হয়।" তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوٓا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا أُولِي قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

১ সূরা আল লাইল (৯২): ১৭-২১। উরওয়া'র এই বক্তব্যটি সংগ্রহ করেছেন ইবনু আবী হাতিম। তাফসীরুত তাবারী, খণ্ড ১২, পৃঃ ২৬০।

"নবী ও ঈমানদারদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা সঙ্গত নয়, এমনকি তারা তাদের নিকটজন হলেও; যখন একথা তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামেরই উপযুক্ত।"[১]

যদিও এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে আবু তালিবের মৃত্যুর মুহূর্তকে কেন্দ্র করে, তবুও ক্ষমাপ্রার্থনার উপর নিষেধাজ্ঞার এ বিধান সকল যুগের সকল মুসলমানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যদিও তাদের পিতা-মাতা কিংবা নিকটাত্মীয়দের কেউ শির্ক কিংবা কুফরীতে অটল অবস্থায় মারা যায়।

কুরআনের কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান কিংবা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় মূলনীতিটি হলো—যে বিশেষ পরিস্থিতিতে উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে তার মধ্যে নয়, বরং শব্দের সাধারণ অর্থের মধ্যেই মূল শিক্ষা নিহিত রয়েছে। তবে আয়াতের সাধারণ অর্থকে যথাযথ প্রসঙ্গে স্থাপন ও অর্থের বিচ্যুতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ওহী নাযিলের পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর জ্ঞান সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ: ইউসুফ ইবনু মাহাক বর্ণনা করেন যে, মারওয়ান হিজাযের গভর্নর থাকা অবস্থায় খলিফা মুয়াবিয়া ﷺ তার পুত্র ইয়াযীদকে তার পরবর্তী খলিফা হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং এ উদ্দেশ্যে তিনি মারওয়ানের নিকট একটি চিঠি লিখেন। তারপর মারওয়ান মদীনার লোকদেরকে একত্রিত করে একটি ভাষণ দেন। তাতে তিনি ইয়াযীদ ইবনু মুয়াবিয়াকে তার পিতার পরবর্তী খলিফা হিসেবে মেনে নিয়ে তার অনুকূলে আনুগত্যের শপথ পাঠ করার আহ্বান জানান। ভাষণের এক পর্যায়ে যখন তিনি এ কথা সংযুক্ত করলেন যে, এটি ছিল আবু বকর ও 'উমারের সুন্নাহ বা রীতি; তখন আব্দুর রহমান ইবনু আবী বকর জবাব দিলেন যে, এটি বরং হিরাক্লিয়াস ও সিজারের সুন্নাহ। এ কথার প্রেক্ষিতে মারওয়ান তাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিলেন; কিন্তু আব্দুর রহমান আয়েশা ﷺ এর ঘরে আশ্রয় নেওয়ায় সৈনিকরা তাকে গ্রেফতার করতে পারেনি। তখন মারওয়ান বললেন, নিঃসন্দেহে সে হলো এমন ব্যক্তি যার ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে:

১ সূরা আত তাওবাহ (৯):১১৩। এই ঘটনাটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম বুখারী (সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৫৮, নং ১৯৭) ও ইমাম মুসলিম (সহীহ মুসলিম, খণ্ড ১, পৃঃ ১৮, নং ৩৬)।

وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَآ اَتَعِدٰنِنِىْٓ

"এবং যে তার পিতা-মাতাকে বলে, তোমাদের উভয়ের প্রতি উফ্।"[১][২]

তার বক্তব্যের সংবাদ আয়েশা ﵂ এর নিকট পৌঁছালে তিনি বললেন, "মারওয়ান মিথ্যা বলেছে। আল্লাহর শপথ, এ আয়াতটি তার প্রসঙ্গে নাযিল হয়নি, আমি চাইলে তার নাম বলে দিতে পারি যার প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।"[৩]

আসবাবুন নুযূল সংক্রান্ত কতিপয় বিশেষ গ্রন্থ

এ বিষয়ের উপর সর্বাধিক খ্যাতনামা গ্রন্থ হলো আলী ইবনু আহমদ ওয়াহিদী'র (মৃত্যু ১০৭৬ 'ঈসায়ী/৪৬৮ হিঃ) লেখা 'আসবাবু নুযূলিল কুরআন'। একশ' বছর পূর্বে বইটির প্রথম মুদ্রণ প্রকাশিত হবার পর এ যাবৎ বইটি অনেকবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। বেশ কয়েকটি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিসমূহকে তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করে ১৯৯১ সালে এর একটি নতুন সংস্করণ মুদ্রিত হয়; এবং তা থেকে আগেকার মুদ্রণগুলোর কতিপয় ভুল অপসারণ করা হয়। তারপরও ওয়াহিদী'র বইটিতে বিশুদ্ধ ও ভুল বর্ণনার একটি মিশ্রণ রয়েছে। অন্যান্য যেসব খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে গ্রন্থ সঙ্কলন করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন—ইমাম ইবনু তাইমিয়া (আত তিবইয়ান ফী নুযূলিল কুরআন) ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী (লুবাবুন নুকূল ফী আসবাবিন নুযূল)। বর্তমান সময়ে ইয়েমেনের একজন হাদীস বিশেষজ্ঞ মুকবিল ইবনু হাদী ওয়াদি একটি ব্যাপকভিত্তিক গ্রন্থ সঙ্কলন করেছেন, যেখানে ওহী নাযিলের প্রায় সব প্রামাণ্য কারণসমূহ স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটির শিরোনাম হলো 'আস সহীহুল মুসনাদ মিন আসবাবিন নুযূল'।[৪]

---

১ ক্রোধ বা অসন্তুষ্টির অভিব্যক্তি।

২ সূরা আল আহ্কাফ (৪৬): ১৭। আয়াতের বাকী অংশে রয়েছে, "তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাচ্ছো যে, মৃত্যুর পর আমি আবার কবর থেকে উত্তোলিত হবো? আমার পূর্বে তো আরো বহু মানুষ চলে গেছে। (তাদের কেউ তো জীবিত হয়ে ফিরে আসেনি)। মা-বাপ আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলে, "আরে হতভাগা, বিশ্বাস কর। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। কিন্তু সে বলে, এসব তো প্রাচীনকালের কল্প-কাহিনি।"

৩ ইমাম বুখারী (সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৩৩৮-৯, নং ৩৫২) ও ইমাম নাসাঈ এ সংক্রান্ত বেশ কিছু বর্ণনা সংগ্রহ করেছেন।

৪ দেখুন মা'লুমাত – মাকতাবাতুল কুরআন কর্তৃক প্রকাশিত আল কুরআনুল কারীম (আরবি সিডি)।

১১

মাক্কী ও মাদানী ওহী

আমরা সকলেই জানি যে, নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর সমগ্র কুরআন একত্রে নাযিল হয়নি; বরং হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে খণ্ড খণ্ড হিসেবে। নাযিলের এ ধারা চালু ছিল নুবুওয়্যাতের প্রথম থেকে শুরু করে তাঁর ইন্তেকালের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত। এ প্রক্রিয়ায় সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে কুরআন নাযিল হয়।

কুরআনের বিভিন্ন অংশ নাযিলের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল সেসব সমস্যার সমাধান করা—যা মক্কা ও মদীনায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজমান ছিল। মক্কার সমস্যা ও চাহিদা মদীনা থেকে ভিন্ন রকমের হওয়ায় মক্কা ও মদীনার ওহীসমূহের কিছু বিশেষ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এ দিক থেকে বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ যে, মক্কা ও মদীনার আয়াতসমূহের মধ্যকার পার্থক্যগুলোকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে সমগ্র কুরআনকেই ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। ইসলামী জীবনব্যবস্থায় কুরআনের গুরুত্ব সর্বাধিক হওয়ায় সাহাবায়ে কেরামদের সময় থেকে নিয়ে মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ জ্ঞানের এ শাখাটিতে তাদের প্রচুর সময় ও সামর্থ্য ব্যয় করেছেন।

মাক্কী আয়াতসমূহের কিছু বিশেষ দিক

মাক্কী ওহী দ্বারা কুরআনের সেসব আয়াত ও সূরাকে বুঝানো হয়, যা নবী ﷺ এর হিজরতের পূর্বে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। এতে সেসব আয়াতও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা নাবী ﷺ তায়েফসহ মক্কার বাইরের অন্যান্য এলাকায় অবস্থানকালীন সময়ে নাযিল হয়েছিল।[1] এসব ওহীতে ইসলামী আন্দোলনের প্রথম দিকের অবস্থার গতি-প্রকৃতি বোঝা যায়— যেখানে মূলনীতিসমূহকে

১ আল ইতকান, খণ্ড ১, পৃঃ ২৩।

সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এ সময়ের ওহীতে যেসব বিষয় প্রধানত স্থান পেয়েছে তার অন্যতম হলো:

১. তাওহীদ (আল্লাহ তা'আলার এককত্ব)

মক্কার লোকদের সামনে যখন ইসলামকে প্রথম উপস্থাপন করা হয়, তখন তারা ছিল নানা রকম কুফর ও শির্কে লিপ্ত। তাদের অধিকাংশ লোক আল্লাহতে বিশ্বাস করতো, তবে তারা আল্লাহ ও তাদের নিজেদের মধ্যে অসংখ্য মধ্যস্থতাকারী নির্ধারণ করে নিয়েছিল। এসব মধ্যস্থতাকারীর প্রতিনিধি হিসেবে তারা মূর্তি নির্মাণ করে সেগুলোর পূজা শুরু করে দিয়েছিল। এর ফলে প্রথম দিকের ওহীগুলোতে আল্লাহ তা'আলার এককত্ব ও সকল কিছুর উপর তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতার ব্যাপারে লোকদেরকে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কোনো মাতা-পিতা, বংশধর কিংবা তাঁর ক্ষমতায় ভাগ বসানোর মতো কোনো অংশীদার নেই। সেখানে আরো বলা হয়েছে যে, মূর্তিগুলো মানুষের ভালো-মন্দ কোনোটাই সাধন করার ক্ষমতা রাখে না। যেসব মূর্তি নিজেরা দেখতে কিংবা শুনতে পায় না, সেগুলোর পূজা করার যৌক্তিকতাকে মাক্কী আয়াতগুলোতে চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে।

২. সালাত

ওহীর প্রাথমিক কিছু আয়াতের মাধ্যমে নবী ﷺ-কে নুবুওয়্যাতের জন্য মনোনীত করার বিষয়টি জানিয়ে দেবার পর তাঁকে সালাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল عليه السلام-কে প্রেরণ করেন। যৌক্তিক বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে সালাতের সঠিক পদ্ধতি নিরূপণ করা সম্ভব ছিল না বিধায়, সরাসরি ফেরেশতা পাঠানোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, খোদ নবী ﷺ-কেও আল্লাহর 'ইবাদাহ করার সঠিক পদ্ধতি শেখাতে হয়েছিল। নিজ প্রভুর ব্যাপারে কোনো ব্যক্তির সচেতনতা লাভের ক্ষেত্রে সালাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকায় প্রথম দিকে অবতীর্ণ

আয়াতসমূহে নবী ﷺ ও তাঁর অনুসারীবৃন্দকে নিয়মিত সালাত সম্পাদন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[১]

মক্কার লোকেরা যেহেতু এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল যে, এসব দেবতারা তাদের প্রার্থনাসমূহকে তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর নিকট পৌঁছে দিবে, সেহেতু প্রাথমিক আয়াতসমূহের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই ভুল ধারণার অপনোদন করা। সেসব আয়াতে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, সালাত ও দু'আ উভয়টিই হতে হবে সরাসরি এবং একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে, কোনো মাধ্যম ছাড়া। কারণ তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি তাঁর বান্দাদের ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম।

তাওহীদের সাথে সালাতের গভীর সম্পর্কের কারণে সালাতের উপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত বিশুদ্ধ সালাত বাস্তবে তাওহীদেরই প্রতিনিধিত্ব করে।

৩. অদৃশ্য জগৎ

মানুষের পক্ষে যেহেতু অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে জানার কোনো উপায় নেই, সেহেতু প্রাথমিক আয়াতসমূহে অদৃশ্য জগতের বিস্ময়াবলী, রহস্যাদি ও বিভীষিকা সম্পর্কে তাদেরকে জানানো হয়েছে। সৎ কাজ সম্পাদন অব্যাহত রাখতে বিশ্বাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সেসব আয়াতে জান্নাতের আরাম-আয়েশের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। একই সাথে সেগুলোতে জাহান্নামের আগুন ও তার নিদারুণ আযাবের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো বিশ্বাসীদেরকে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করা। জাহান্নামের বর্ণনার মাধ্যমে বিশ্বাসীদেরকে এই মর্মে পুনরায় আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে, যারা এ দুনিয়ায় অন্যায় কাজ করে তারা আল্লাহর শাস্তি এড়াতে পারবে না। খুব বেশী দেরী হয়ে যাওয়ার আগেই ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অবিশ্বাসীদেরকে নিজেদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করার সুযোগ করে দেয়াও ছিল এসব বর্ণনার অন্যতম উদ্দেশ্য। এ ধরনের কিছু আয়াতে সেসব লোকের উদ্দেশ্যে যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে—যারা পুনরুত্থানের বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য প্রকৃতি থেকে উদাহরণ দেয়া হয়েছে, যেমন: মৃত ভূখণ্ডে

---

[১] দেখুন আল কুরআন ২৩:১-১১; ৭০:৩৪-৫; ৭৩: ২০; ৭৪: ৩৮-৪৩।

বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে তাকে পুনরায় সজীব করে তোলা। অন্যান্য আয়াতে যৌক্তিকভাবে দেখানো হয়েছে যে, প্রথমবার সৃষ্টি করার তুলনায় পুনরায় সৃষ্টি করার কাজটি অধিকতর সহজ; যদিও আল্লাহর নিকট সবই সমান।

৪. আল্লাহর অস্তিত্ব

সাধারণভাবে মক্কার সকল লোকেরা আল্লাহকে বিশ্বাস করলেও আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান কিছু লোকও সেখানে ছিল। এর ফলে প্রথম দিকের কতিপয় আয়াতে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে—এমন কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণও উপস্থাপন করা হয়েছে। কখনো কখনো তাদের নিজেদের বাসস্থান এই পৃথিবীতে সহজে দৃশ্যমান বিভিন্ন সৃষ্টজীব থেকে প্রমাণ দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ মক্কাবাসীদেরকে জিজ্ঞেস করছেন,

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾

"তাহলে কি এরা উটগুলো দেখছে না, কিভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে? আকাশ দেখছে না, কিভাবে তাকে ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে? পাহাড়গুলো দেখছে না, কিভাবে তাদেরকে শক্তভাবে বসানো হয়েছে? আর যমীনকে দেখছে না, কিভাবে তাকে বিছানো হয়েছে?"[১]

অন্যান্য সময় সোজাসাপ্টা যুক্তি ব্যবহার করে আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন, তারা কি শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে, নাকি তারা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টি করেছে:

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾

"তারা কি কোনো কিছু ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে? নাকি এরা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা?"[২]

সংক্ষিপ্ত চ্যালেঞ্জের দিক থেকে এ আয়াতটি খুবই বিস্ময়কর। সৃষ্টির উৎস সংক্রান্ত প্রশ্নের মাত্র তিনটি সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে। এ আয়াতে কেবল

১ সূরা আল গাশিয়াহ (৮৮): ১৭-২০।
২ সূরা আত তূর (৫২): ৩৫।

দু'টি (সম্ভাব্য উত্তর) উল্লেখ করে তৃতীয়টিকে অব্যক্ত রেখে দেয়া হয়েছে; কারণ এ তৃতীয় উত্তরটি একেবারে সুস্পষ্ট। উল্লিখিত সম্ভাব্য দু'টি উত্তরকে ভুল প্রমাণ করার জন্য এ আয়াতে মোটেও চেষ্টা করা হয়নি; কারণ উভয়টিই সুস্পষ্ট মিথ্যা। যে বস্তুর নিজেরই অস্তিত্ব নেই—তা অন্য কোনো কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। একইভাবে একথা সবারই জানা যে, এমন একটা সময় ছিল যখন নারী-পুরুষ কারোরই কোনো অস্তিত্ব ছিল না; সুতরাং আমরা নিজেরা নিজেদেরকে সৃষ্টি করতে পারিনি। যদি কেউ এই মর্মে যুক্তি দেখায় যে, সে তার পিতা-মাতা থেকে এসেছে, তার পিতা-মাতা এসেছে তাদের পিতা-মাতা থেকে এবং এ প্রক্রিয়ায় সকল মানুষ জন্ম লাভ করেছে; তাহলেও এই কার্যকারণের ধারাবাহিকতা এমন এক সত্তা পর্যন্ত গিয়ে থেমে যেতে বাধ্য হবে, যেখানে সে নিজ অস্তিত্বের জন্য এমন সত্তার মুখাপেক্ষী হবে যার অস্তিত্ব অন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়—যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। সুতরাং আমাদের অস্তিত্বকে অর্থবহ করতে হলে স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহকে মেনে নিতেই হবে। জুবাইর ইবনু মুতইম নামক মক্কার এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে সালাতে উক্ত আয়াত পাঠ করতে শুনেছিলেন, আর এর ফলে তার মনে হয়েছিল যেন তার প্রাণ উড়ে যাচ্ছে; আর এই ঘটনাটিই পরবর্তীতে তার ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[১]

৫. চ্যালেঞ্জ

কুরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহী এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর নবী—কুরাইশদের নিকট তা প্রমাণ করার জন্য মাক্কী সূরাসমূহের কিছু কিছু আয়াতে সকল আরবদেরকে কুরআনের অনুকরণে কিছু একটা রচনা করার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। অনেকগুলো সূরার সূচনা হয়েছে 'আলিফ—লাম—মীম', 'সাদ', কিংবা 'নুন' এর ন্যায় স্বতন্ত্র অক্ষর দিয়ে; এর উদ্দেশ্য ছিল—মক্কার লোকেরা যেসব বর্ণ দিয়ে বক্তৃতা ও কাব্যের ফুলঝুরি ছোটাতো সেই একই অক্ষর দিয়ে তাদেরকে বিরক্ত করা। আল্লাহ একই অক্ষরসমষ্টি দিয়ে কুরআন নাযিল করেছেন, তারপরও তারা এর অনুকরণ করতে পারেনি। আরবরা কুরআনের ছোট্টতম সূরাটির অনুরূপও কোনো কিছু

১ সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৩৫৭-৮, নং ৩৭৭। আরো দেখুন ফাতহুল বারী (খণ্ড ৮, পৃঃ ৪৬৯) গ্রন্থে ইবনু হাজারের মতামত।

রচনা করতে সক্ষম না হওয়ায় কুরআনের অলৌকিকত্ব ও আসমানী উৎসের বিষয়টি তৎকালীন সময়ের লোকদের কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। তবে তাদের অনেকে কুরআনকে একটি যাদুমন্ত্র ও নবী ﷺ-কে একজন মহাযাদুকর হিসেবে বিবেচনা করতে অধিক পছন্দ করতো।

৬. প্রাচীন জনগোষ্ঠী

মাক্কী যুগের আয়াতসমূহে প্রায়শ ‘আদ ও সামুদ জাতির ন্যায় প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। এসব জাতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার উদ্দেশ্য ছিল সেসব লোককে সতর্ক করে দেওয়া—যারা ইসলামের বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। সেসব আয়াতে প্রাচীন সভ্যতার বিস্ময়কর দিকসমূহ আলোচনা করা হয়েছে; পাশাপাশি আল্লাহ তাদের উপর তাঁর যেসব মহান অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলেন সেগুলোও তুলে ধরা হয়েছে। তারপর আলোচনা করা হয়েছে কীভাবে সেসব লোক আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তাঁর অনুগ্রহসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং পরিশেষে আল্লাহর শাস্তি কীভাবে তাদেরকে পাকড়াও করেছে; অথচ তারা একটুও বুঝতে পারেনি আল্লাহর বিরাগভাজন হলে তাদের পরিণতি কী হতে পারে। এসব দৃষ্টান্ত ছিল আরবদের নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত; কারণ সেসব সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ তখনও অবশিষ্ট ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ: মাদায়েনে সালেহ এলাকায় সিরিয়াগামী বাণিজ্যিক রূটের পাশেই ছিল সালেহ নবীর জনগোষ্ঠী সামুদ জাতির প্রস্তর সমাধিগুলো।

৭. ঈমান

মাক্কী যুগের আয়াতসমূহে অল্প কয়েকটি আইন নাযিল করা হয়েছে। কারণ, সেসব আয়াতে এমন সব মূলনীতির উপর মনোনিবেশ করা হয়েছে যা ছিল প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের ঈমানের (বিশ্বাস) ভিত্তি মজবুত করার জন্য সহায়ক। এসব আয়াতে আল্লাহভীতি ও সকল বিষয়ে তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন থাকার গুরুত্বের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। প্রায়শ এসব আয়াতে ধৈর্যশীল, অধ্যবসায়ী, সত্যবাদী ও বিশ্বাসভাজন হওয়ার উপদেশ দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের নৈতিক ও আত্মিক চরিত্রকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া—যারা ছিল মক্কার সমাজে সংখ্যালঘু ও প্রচণ্ড চাপের সম্মুখীন।

৮. সংক্ষিপ্ত আয়াত

সাধারণত মাক্কী সূরাগুলোতে রয়েছে ছোট ছোট আয়াত, হৃদয়গ্রাহী অন্তমিল ও একটি শক্তিশালী ছন্দ প্রবাহ। এসব বৈশিষ্ট্যের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামবিদ্বেষী শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা। এসব আয়াত সংক্ষিপ্ত হওয়া অত্যন্ত জরুরী ছিল; কারণ ঐ পর্যায়ের শ্রোতারা খুব দীর্ঘ পরিসরের বাক্য শুনতে আগ্রহী ছিল না। তারা বরং কুরআনের কোনো একটি অংশ শোনা মাত্র নিজেদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে অন্যদিকে চলে যেতো। তাই ছোট ছোট আয়াতের মাধ্যমে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। মাক্কী যুগের এসব আয়াতের সাথে প্রায়শ ভাগ্যকথকদের সুর-ঝঙ্কারের বাহ্যিক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে ভাগ্যকথকদের বাক্যগুলো অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হলেও কুরআনের আয়াতসমূহের অর্থ ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ: ভাগ্যকথক যাবরা তার জাতিকে নিম্নোক্ত ভাষায় একটি আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিল:

শপথ ঝড়ো বাতাসের,
ও তিমির রাত্রির;
শপথ উজ্জ্বল প্রভাতের,
ও তিমির বিদারী নক্ষত্রের;
শপথ বৃষ্টি-ভরপুর মেঘমালার।
উপত্যকার বৃক্ষরাজি সত্যিই ছলনাময়ী,
আর (তাতে) রাগে-ক্রোধে দাঁত কড়মড় করে উঠে।
নিশ্চয় পর্বত পার্শ্বের প্রশস্ত রাস্তাটি সঙ্কেত দিচ্ছে
আসন্ন এক শোকাতুর পরিবেশের,
যা থেকে তুমি পরিত্রাণের কোনো রাস্তা খুঁজে পাবে না।

— ভাগ্যকথক যাবরা।

মাদানী ওহীর বৈশিষ্ট্য

মাদানী ওহী বলতে কুরআনের সেসব আয়াত ও সূরাসমূহকে বুঝানো হয় যা রাসূল ﷺ এর মদীনায় হিজরতের পর নাযিল হয়েছে। এতে অন্তর্ভুক্ত

রয়েছে সেসব আয়াত, যা বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রসহ বিদায় হজ্জ চলাকালে ও তার পরবর্তী সময়ে মক্কা ও মীনায় নাযিল হয়েছে। এসব আয়াতের সবগুলোকেই মাদানী হিসেবে বিবেচনা করা হয়; কারণ এগুলো রাসূল ﷺ এর নবুওতী জীবনের দ্বিতীয় ধাপের ওহীর প্রতিনিধিত্ব করে, যে স্তরে ইসলামী রাষ্ট্র একটি সুসংহত রূপ লাভ করেছিল।[১]

মাদানী আয়াতসমূহের কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. আইন

মদীনা ইসলামের নতুন কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হওয়ার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। নবী ﷺ হন মদীনা রাষ্ট্রের শাসক; যে রাষ্ট্রে মুসলিম, ইহূদী ও মূর্তিপূজকদের সকলেই শামিল ছিলো। একটি সংবিধান প্রণয়ন করে বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ফলে মদীনার যুগে নাযিলকৃত আয়াতসমূহে স্থান পায় অসংখ্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক আইন-কানুন, যা ছিল একটি ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন ও ক্রমবিকাশের জন্য অত্যন্ত জরুরী। এ যুগেই ইসলামের শেষ তিনটি স্তম্ভ (যাকাত, সাওম ও হজ্জ) সংক্রান্ত ওহী নাযিল হয়।[২] অনুরূপভাবে এই যুগেই মদ্যপান, শূকরের মাংস ভক্ষণ ও জুয়াবাজি ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়।

২. আহলে কিতাব (আসমানী কিতাবধারী জনগোষ্ঠী)

মদীনায় আসার পরই মুসলিমরা প্রথমবারের ন্যায় ইহূদীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে। মুসলিমদের চিন্তা-বিশ্বাসের ভিত নাড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ইহূদীরা নবী ﷺ-কে আল্লাহ, আগেকার নবী-রাসূল ও অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতো। এর ফলে মদীনায় নাযিলকৃত বেশ কিছু আয়াতে ইহূদীদের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। এ সময়ে মদীনার মুসলিমরা ব্যাপকহারে খ্রিস্টানদেরও সংস্পর্শে চলে আসে। ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই যে, মদীনার কিছু কিছু আয়াতে নবী 'ঈসা ﷺ ও আল্লাহ সম্পর্কে খ্রিস্টানদের ভুল ধারণাসমূহকে তুলে ধরা হয়েছে। সেসব আয়াতে বলা

---

১ আল ইতকান, খণ্ড ১, পৃঃ ২৩।

২ যাকাতের বিধানটি মক্কায় নাযিল হলেও সে সময় তা ছিল অনানুষ্ঠানিক; হিজরতের আগ পর্যন্ত এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান বিস্তারিত আকারে নাযিল হয়নি।

হয়েছে যে, 'ঈসা ﷺ এর জন্ম আদম ﷺ এর জন্মের চেয়ে বেশী বিস্ময়কর নয়, কারণ আদম ﷺ এর পিতা বা মাতা কেউই ছিলেন না; পক্ষান্তরে 'ঈসা ﷺ এর পিতা না থাকলেও মাতা তো ছিলেন। আরো জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, 'ঈসা ﷺ মৃতকে জীবিত করা সহ অন্যান্য যেসব অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করেছেন, তার সবই ছিল আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতা ও তাঁর অনুমতিক্রমে। সুতরাং 'ঈসা ﷺ আল্লাহ নন, কিংবা আল্লাহর পুত্রও নন এবং আল্লাহ তা'আলাও ত্রিত্ববাদের তৃতীয় সত্তা নন।

৩. মুনাফিক (ভণ্ড)

ইসলামের চূড়ান্ত বার্তা নাযিল শুরু হওয়ার পর মদীনাতেই প্রথম আমরা এমন কিছু মানুষ দেখতে পাই, যারা আন্তরিক বিশ্বাস ছাড়াই বাহ্যিকভাবে ইসলামের ভেতরে ঢুকতে শুরু করেছে। মক্কাতে মুসলিমরা ছিল নির্যাতিত ও আক্রান্ত; তাই সেখানে কেউ সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস স্থাপন না করে ইসলামে প্রবেশ করেনি; বরং অনেকে অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করেও বাহ্যিকভাবে গোপন রাখতো। পক্ষান্তরে মদীনার মুসলিমরা ছিল শক্তিশালী এবং নগরীর শাসক। এর ফলে সেখানে আমরা এমন কিছু লোকের সন্ধান পাই, যাদের ইসলাম গ্রহণের নেপথ্য উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের শক্তিমত্তা থেকে নিজেরা উপকৃত হওয়া এবং মুসলিম সমাজের ভেতরে থেকে ইসলামের বিরোধিতা করা। নবী ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সুলূলের মদীনার শাসক হিসেবে রাজমুকুট লাভ করার প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। নবী ﷺ মদীনার শাসক নিযুক্ত হওয়ায় ইবনু সুলূলের আশার গুড়ে বালি পড়ে যায়।[১] যেহেতু মুসলিমরা ছিল শক্তিশালী এবং তার পক্ষে মুসলিমদের প্রকাশ্য বিরোধিতা করাও সম্ভব ছিল না, সেহেতু সে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে ভেতর থেকে এর বিরোধিতা শুরু করে। পরিশেষে সে মুনাফিকদের নেতায় পরিণত হয়। এর প্রেক্ষিতে মাদানী স্তরে নাযিলকৃত আয়াতসমূহের মাধ্যমে মুসলিমদেরকে ভণ্ডদের সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়ার পাশাপাশি তাদেরকে কীভাবে সফলতার সাথে মোকাবেলা করা যেতে পারে— সে কৌশলও বাতলে দেয়া হয়।

---

১ দেখুন সহীহ্ মুসলিম, খণ্ড ৩, পৃঃ ৯৮৯, নং ৪৪৩১।

৪. জিহাদ

মদীনাতে প্রথমবারের ন্যায় শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুমতি প্রদান করা হয়। মাক্কী যুগে মুসলিমদেরকে পাল্টা আঘাত করতে নিষেধ করা হয়েছিল। এর পেছনে কারণ ছিল মূলত দু'টি– (১) মুসলিমরা ছিল সংখ্যালঘু এবং এর ফলে সহজে এদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল; (২) সেটি ছিল ঈমানদারদের চরিত্র বিনির্মাণের একটি স্তর। যেসব লোক ইসলামের বাণী প্রচারের দায়িত্ব আঞ্জাম দিবে, তাদের জন্য পরম ধৈর্য নামক গুণটি অর্জন করা ছিল সর্বাধিক জরুরী। মজবুত ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিরাই কেবল এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। মাক্কী যুগ আসন্ন ইসলামী আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তুত করে দিয়েছে। মাদানী যুগে এসে কুফরী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে একের পর এক যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে; এর মাধ্যমেই মক্কা বিজয় হয় ও সমগ্র আরব উপদ্বীপ ইসলামী শাসনের অধীনে চলে আসে। এর প্রেক্ষিতে মাদানী যুগের বেশ কিছু আয়াতে মুসলিমদেরকে যুদ্ধ সংক্রান্ত ইসলামী নীতিমালা শেখানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ: সেসব আয়াতে শেখানো হয়েছে যুদ্ধবন্দীদের সাথে কী ধরনের আচরণ করতে হবে; পাশাপাশি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে শত্রুবাহিনীকে ফাঁদে ফেলার কৌশল হিসেবে পিছু হটতে হলে তার বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। এসব আয়াতে মুসলিমদেরকে সম্ভাব্য সর্বোত্তম যুদ্ধাস্ত্রে নিজেদেরকে সুসজ্জিত করার জন্যও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

৫. দীর্ঘ আয়াত

মাদানী যুগের আয়াতসমূহ তুলনামূলকভাবে মাক্কী যুগের আয়াত থেকে দীর্ঘতর। এমনকি মাদানী যুগের এমন কিছু আয়াত রয়েছে যা মাক্কী যুগের কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ সূরার চেয়েও দীর্ঘতর। যেমন সূরা আল বাকারা'র ঋণ সংক্রান্ত আয়াতটি হলো কুরআনের দীর্ঘতম আয়াত।[১] মাক্কী যুগে নাযিলকৃত সূরা আল কাউসার[২] কুরআনের সবচেয়ে ছোট সূরা– যেখানে তিনটি সংক্ষিপ্ত আয়াতে সর্বসাকুল্যে মাত্র ১১টি স্বতন্ত্র শব্দ রয়েছে। মাদানী যুগে এসে মাক্কী

---

১ সূরা আল বাকারাহ (২): ২৮২।
২ ১০৮ নং সূরা।

যুগের ন্যায় অনাগ্রহী শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণের কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ এতোদিনে ইসলাম বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং এর অনুসারীর সংখ্যাও বেড়ে অনেক হয়েছে। এর ফলে সেসব আয়াতে ইসলামের মৌলিক আইন-কানুন শেখানো হয়েছে। সুদীর্ঘ এসব আয়াত মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য এ স্তরের শ্রোতারা ছিল পূর্ণ মাত্রায় আগ্রহী।

৬. সূরাসমূহের বিন্যাস

মাক্কী যুগে অবতীর্ণ আয়াতসমূহকে নাযিলের বিন্যাস অনুযায়ী মুখস্থ কিংবা লিপিবদ্ধ করা হয়নি। কখনো কখনো বিভিন্ন সূরার আয়াত একসাথে নাযিল হয়েছে, আবার কখনো সম্পূর্ণ সূরা একসাথে নাযিল হয়েছে। একেক আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে নবী ﷺ তাঁর ওহী লেখকদেরকে তা সংশ্লিষ্ট সূরার মধ্যে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিতেন। নতুন সূরা নাযিল হলে যে বিন্যাস অনুযায়ী তা লিপিবদ্ধ করতে হবে, তিনি সে অনুযায়ী সূরাটিকে পাঠ করে শোনাতেন। মাদানী যুগের আয়াত ও সূরা নাযিল শুরু হয়ে যাওয়ার পর, সেসব সূরা ও আয়াত মাক্কী যুগের কোন কোন সূরা ও আয়াতের পূর্বাপরে স্থান দিতে হবে– নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে তা বলে দিয়েছেন। এভাবে সমগ্র কুরআনের ওহী নাযিল সম্পন্ন হওয়ার পর কোনো কোনো মাক্কী আয়াত মাদানী সূরার মধ্যে, আবার মাদানী আয়াত মাক্কী সূরার মধ্যে পাওয়া যায়। নবী ﷺ আল্লাহর নির্দেশক্রমে এসব আয়াত ও সূরা বিন্যস্ত করেছেন। মাক্কী আয়াতের সাথে মাদানী আয়াতের এই সংমিশ্রণের পেছনে কারণ হতে পারে যে, বিভিন্ন আয়াত নাযিল হয়েছে একটি ক্রমবিকাশমান সমাজের চাহিদাকে কেন্দ্র করে। পক্ষান্তরে তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যে এর বিন্যাসকে ভিন্নভাবে ঢেলে সাজানোর মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, কুরআন নিছক একটি ঐতিহাসিক দলিল নয়। ওহী নাযিলের ক্রমধারা অনুসরণ না করে বিন্যস্ত করার মাধ্যমে কুরআনের মূল বাণীর সাধারণ ও সার্বজনীন দিকসমূহকে জোরালোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

স্বাতন্ত্র্যের গুরুত্ব

বেশ কয়েকটি কারণে মাক্কী ও মাদানী যুগে নাযিলকৃত সূরা ও আয়াতসমূহের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যরেখা টানা জরুরী। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তিনটি কারণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. ফিক্‌হ (ইসলামী আইন)

সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে ইসলামের বিভিন্ন আইন-কানুন নাযিল হয়েছে। কতিপয় আইনের মাধ্যমে পূর্বের কিছু আইনকে বাতিল করে দেয়া হয়েছে, আর বাদবাকী আইনসমূহ নাযিল হয়েছে ধীরে ধীরে। তাই বিভিন্ন আইন-কানুন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে কোন আইন কখন নাযিল হয়েছে– তা জানা অত্যন্ত জরুরী। মদীনা যুগের শেষের দিকে নাযিলকৃত আইন-কানুনসমূহ প্রাথমিক যুগের আইন-কানুনসমূহের জায়গা দখল করে নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ: মাদকদ্রব্যের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে বেশ কয়েকটি ধাপ অবলম্বন করে। এ সংক্রান্ত প্রথম আইনটিতে কেবল এর বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন:

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ؕ قُلْ فِيْهِمَاۤ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۫ وَ اِثْمُهُمَاۤ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ؕ وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ۬ قُلِ الْعَفْوَ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۝۲۱۹

"তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, মদ ও জুয়ার ব্যাপারে নির্দেশ কী? বলে দাও, ঐ দু'টির মধ্যে বিরাট ক্ষতিকর বিষয় রয়েছে যদিও লোকদের জন্য তাতে কিছুটা উপকারিতাও আছে; কিন্তু তাতে তাদের উপকারিতার চেয়ে গোনাহ অনেক বেশী।"[1]

মাদক সংক্রান্ত দ্বিতীয় ধাপের আয়াতে মুসলিমদেরকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ

১ সূরা আল বাকারাহ (২): ২১৯।

"তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের কাছে যেও না; যতক্ষণ না তোমরা যা বলছো তা বুঝতে পারো।"[১]

তবে তৃতীয় আইনটিতে যে কোনো ধরনের মাদকদ্রব্যের ধারেকাছে যাওয়ার উপরও পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

"মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শরসমূহ—এ সবই হচ্ছে ঘৃণ্য শয়তানী কার্যকলাপ; এগুলো থেকে দূরে থাকো।"[২]

কেউ যদি এসব আয়াতের ক্রমধারা না জানে, তাহলে তার পক্ষে এই ভুল ধারণায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যে, কেবল সালাতের সময়ে নেশাগ্রস্ত না থাকলে তার জন্য মাদকদ্রব্য পান করা বৈধ; কিংবা সে মনে করতে পারে যে, তার জন্য মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ।

২. দাওয়াহ

যে ক্রমধারা অবলম্বন করে কুরআনের আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে তা অনুধাবন করার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সর্বোত্তম পদ্ধতি আয়ত্ত করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ: কুরআন ঈমানদারদেরকে শিক্ষা দেয় যে, তারা যেন অবিশ্বাসীদের মূর্তি বা তাদের উপাস্যদেরকে নিয়ে হাসি-তামাশা বা গালমন্দ না করে। এর উদ্দেশ্য হলো, অবিশ্বাসীরা যাতে ইসলামের বাণী শ্রবণ থেকে দূরে সরে না যায় এবং তারা যেন অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালমন্দ না করে বসে। এর পরিবর্তে মুসলিমদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন মূর্তিপূজা কী কারণে সঠিক নয়, তা অবিশ্বাসীদেরকে যুক্তি-বুদ্ধির মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়। নবী ইবরাহীম ﷺ তাঁর জাতিকে উদ্দেশ্য করে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, আল্লাহ তার উদ্ধৃতি দিয়েছেন:

أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾

---

১ সূরা আন নিসা (৪): ৪৩।
২ সূরা আল মায়িদাহ (৫): ৯০।

"তাহলে তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমনসব জিনিসের পূজা করছো যারা তোমাদের না কোনো উপকার করতে পারে, না কোনো ক্ষতি?"[১]

মুসলিমরা মক্কাতে নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কয়েক বছর যাবৎ ধৈর্যের সাথে সহাবস্থান ও যুক্তি-বুদ্ধির চর্চা করার পর মদীনায় হিজরতের প্রেক্ষিতে ইবরাহীম ﷺ এর জাতি ও তাদের মিথ্যা উপাস্যদের প্রতি তাঁর শত্রুতার ঘোষণা সম্বলিত নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছিলো:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرٰهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدٰوَةُ وَالْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُۥٓ

"তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সাথীদের মধ্যে রয়েছে একটি উত্তম আদর্শ। তিনি তাঁর কওমকে বলে দিয়েছিলেন, 'তোমাদের থেকে এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের উপাসনা করে থাকো তাদের থেকে আমরা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করছি। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরদিনের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে—যতদিন না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে'।"[২]

মক্কার অবিশ্বাসীরা মুসলিমদের যুক্তি-বুদ্ধি ও ধৈর্যচর্চার জবাব দিয়েছিল নির্যাতন ও সহিংসতার মাধ্যমে। তারা মুসলিমদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং এর ফলে দু' পক্ষের মধ্যে সশস্ত্র সঙ্ঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়। সুতরাং এটি কোনো ব্যক্তির জন্য সুন্নাহ নয় যে, সে ইসলাম গ্রহণপূর্বক এ আয়াত পাঠ করে নিজের পরিবার ও পরিচিত লোকদের উপর তা প্রয়োগ করে দেবে।

৩. সীরাত

নবী ﷺ এর জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর অধিকাংশই কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তাই যে ক্রমধারা অবলম্বন করে কুরআনের আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে তা অনুধাবন করার মাধ্যমে নবী ﷺ এর জীবনচরিতের একটি বৃহৎ অংশকে একত্রিত করা সম্ভব।

১ সূরা আল আম্বিয়া (২১): ৬৬।
২ সূরা আল মুমতাহিনাহ (৬০): ৪।

১২

নাসখ: রহিতকরণ ও প্রতিস্থাপন

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলদের নিকট যেসকল আইন নাযিল করেছেন, তার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ সম্পর্কে মানুষের চিন্তা-বিশ্বাস (আকীদাহ), তার দাসত্বের ('ইবাদত) পদ্ধতি এবং তার সামাজিক জীবন ও আচার-আচরণকে (মুয়ামালাত) সংশোধন করে দেওয়া। আল্লাহ সম্পর্কে একটি মাত্র চিন্তা-বিশ্বাসই নির্ভুল, আর তা হলো তাওহীদ বা তাঁর এককত্ব; এ তত্ত্ব অনুযায়ী আল্লাহ এমন এক সত্তা, যার গুণাবলী, কর্মক্ষমতা ও প্রভুত্বে কারো কোনো অংশীদারিত্ব নেই। এ কারণে স্থান ও কালের ব্যবধান সত্ত্বেও সকল নবী একই পদ্ধতিতে নিজ উম্মাহকে এই তাওহীদ মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেছেন:

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

"আমি তোমার পূর্বে যে রাসূলই পাঠিয়েছি তাঁর প্রতি এ ওহী করেছি যে, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই; কাজেই তোমরা আমারই বন্দেগী করো।"[১]

তবে 'ইবাদত ও সামাজিক আচরণবিধির ক্ষেত্রে সবসময় একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি। এ কথা সত্য যে, প্রত্যক্ষ 'ইবাদত ও সামাজিক আচরণবিধি—সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধি সাধন এবং সমাজের সুরক্ষা প্রদান; একইসাথে বিভিন্ন জাতি-গোত্রকে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখা। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রভেদে একেক জাতি ও জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন একেক রকমের। এমনকি একই জাতির প্রয়োজনও সময়ের ব্যবধানে বদলে যেতে পারে। তাই কোনো জাতির জন্য একটি বিশেষ যুগে যা উপযুক্ত আরেক যুগে তা তার জন্য যুৎসই না-ও হতে পারে। একইভাবে একজন নবী তাঁর

১ সূরা আল আম্বিয়া (২১): ২৫।

নুবুওয়্যাত জীবনের শুরুর দিকে তাঁর জাতিকে ডাকার জন্য যে পদ্ধতি অনুসরণ করেন, পরবর্তী পর্যায়ে তা বদলে যেতে পারে। আল্লাহর আইন ঐ সমাজে বাস্তবায়িত হয়ে তার ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর পুরোনো আইন নতুন পরিস্থিতির জন্য অসমঞ্জস হয়ে পড়তে পারে। সুতরাং বিভিন্ন আইনের পেছনে যে প্রজ্ঞা বিরাজমান, তাতে এসব বিষয়কে বিবেচনায় রাখা হয়েছে; কারণ আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী দয়া ও জ্ঞান নিয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। আমাদেরকে কোনো কিছুর আদেশ ও নিষেধ করার একচ্ছত্র অধিকার কেবল তাঁরই, যেমন তিনি বলেন:

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ﴿٢٣﴾

"তাঁর কাজের জন্য (কারো সামনে) তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে না, বরং তাদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে।"[১]

অতএব আল্লাহ যদি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞানের ভিত্তিতে তাঁরই দেওয়া একটি আইনকে নতুন একটি আইন দিয়ে প্রতিস্থাপন করেন, তাহলে তা অস্বাভাবিক মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই। আর এ প্রক্রিয়ায় একটি আইনকে আরেকটি আইনের মাধ্যমে বদলে দেয়াকে আরবি-ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় 'নাসখ'। নাসখের বিষয়টি আল্লাহ নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন:

وَاِذَا بَدَّلْنَاۤ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْۤا اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُفْتَرٍ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾

"যখন আমি একটি আয়াতের জায়গায় অন্য একটি আয়াত নাযিল করি—আর আল্লাহ ভালো জানেন তিনি কী নাযিল করবেন—তখন এরা বলে, 'তুমি নিজেই এ কুরআনের রচয়িতা'; আসলে এদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না।"[২]

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَاۤ اَوْ مِثْلِهَا ؕ

১ সূরা আল আম্বিয়া (২১): ২৩।
২ সূরা আন নাহল (১৬): ১০১।

"আমি যে আয়াতকে মানসুখ করি বা ভুলিয়ে দেই, তার জায়গায় আনি তার চাইতে উত্তম অথবা কমপক্ষে ঠিক তেমনটিই।"[১]

নাসখ প্রমাণিত হওয়ার শর্তাবলী

নাসখের জন্য নিম্নোক্ত তিনটি শর্ত পূরণ হতে হবে:

১. ব্যাপারটি হতে হবে এমন যে, পূর্বের আসমানী কোনো আইনকে রহিত করে নতুন কোনো আইন দেয়া হয়েছে। এ কথার অর্থ হলো, মাদকদ্রব্যের উপর পর্যায়ক্রমে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে সেটিকে নাসখ এর শ্রেণীভুক্ত করা হবে না, কারণ এখানে প্রত্যেকটি পরবর্তী আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের নিষেধাজ্ঞার পরিধিকে সম্প্রসারিত করেছে মাত্র। লোকদের আদি অভ্যাসে এলকোহলকে বৈধ ধরে নেয়া হয়েছিল। যদিও এটি ছিল তাদের নিছক একটি ধারণা যে, এলকোহল একটি বৈধ জিনিস এবং এ বিষয়ে তিনটি আয়াত নাযিলের মাধ্যমে ধীরে ধীরে এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এ পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়াকে নাসখ এর শ্রেণীভুক্ত করা হবে না; কারণ, এলকোহলের বৈধতা দিয়ে আল্লাহ ইতোপূর্বে কখনো কোনো বক্তব্য নাযিল করেননি।

২. আগের আইনটিকে রহিত করে নতুন আইন জারী করার জন্য যে প্রমাণটিকে ব্যবহার করা হবে, তা অবশ্যই এমন একটি আসমানী আদেশ হতে হবে যা রহিত আইনটি নাযিল হওয়ার পরে নাযিল হয়েছে।

৩. পূর্বের আইনটি বদলে দিয়ে নতুন যে আইনটি দেয়া হবে তার কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকতে পারবে না। কেননা, কোনো আইনের জন্য যদি কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে, তাহলে মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পর তা আপনা-আপনি বাতিল হয়ে যায়; সুতরাং এ ধরনের প্রক্রিয়া নাসখ হিসেবে বিবেচ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ: রমজান মাসের প্রতিদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই রমজান মাসের রাত্রিতে কিংবা ঐ মাসের পর

[১] সূরা আল বাকারাহ (২): ১০৬।

দিবা-রাত্রি যে কোনো সময়ে পানাহারের বৈধতার সাথে নাসখের কোনো সম্পর্ক নেই।[১]

উল্লেখ্য যে, কেবল আসমানী আদেশ ও নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রেই নাসখ বিষয়টি প্রযোজ্য। পরিস্থিতির বর্ণনামূলক বক্তব্যে নাসখ সংঘটিত হয় না, কারণ এ ধরনের বক্তব্য হয় সত্য, নতুবা মিথ্যা; তাই যদি বলা হয় যে, আগের বিবৃতিটিকে রহিত করা হয়েছে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে তার অর্থ দাঁড়ায়, আগের বক্তব্যটি ছিল হয় ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচার নতুবা ভুল; আর এ দু'টির কোনোটিকেই আল্লাহর প্রতি আরোপ করা যায় না।[২] তাই আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী, পূর্বেকার নবী ও তাঁদের জাতির ঘটনাপঞ্জী, বিভিন্ন নীতিগর্ভ উপমা ও পরকালের বর্ণনা–এ সবই নাসখের বিধানের আওতা বহির্ভূত। একইভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া সকল প্রতিশ্রুতি ও সতর্কবাণীসমূহও নাসখের আওতামুক্ত; কারণ আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। যদি পূর্বে কোনো আয়াতে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেন, আর পরবর্তী কোনো আয়াতে তাঁর দর্শন লাভের ওয়াদা করেন–তাহলে একেও নাসখ আখ্যায়িত করার কোনো অবকাশ নেই। জান্নাতের প্রতিশ্রুতিটি আল্লাহর দর্শন লাভের প্রতিশ্রুতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়নি; বরং উভয়টিই সংঘটিত হবে।[৩] আরো উল্লেখ্য যে, যুগের বিবর্তনে 'ইবাদাত ও নৈতিক আচরণের মূলনীতিসমূহে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না। সালাত, সিয়াম, সাদাকা ও হাজ্জ – এ সবই আল্লাহর দ্বীনের সার্বজনীন রীতি হিসেবে সবসময় চালু ছিল; চাই যে নবী-ই সে বার্তা পৌঁছে দিক না কেন। এমনিভাবে সকল নবী-ই মিথ্যাচার, খুন, ব্যভিচার, প্রতারণা ইত্যাদির নিন্দা করেছেন। তাই নাসখের বিষয়টি মূলত দ্বীনি আচার কিংবা সামাজিক আইন-কানুনের খুঁটিনাটি বিষয়ের ক্ষেত্রে কার্যকর; দ্বীনের মূলনীতিতে নাসখের কোনো ভূমিকা নেই।

---

১ উসূলুল ফিক্‌হ এর যে কোনো গ্রন্থে এসব শর্তের উল্লেখ রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ: দেখুন শারহুল কাওকাবিল মুনীর, খণ্ড ৩, পৃঃ ৫২৬-৭।

২ তবে এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, কুরআনে মাঝেমধ্যে বিবৃতির আকারে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। দেখুন ২:১২৫, ২:২২৮, ২:২৩৩, ৩:৯৭।

৩ দেখুন শারহুল কাওকাবিল মুনীর, খণ্ড ৩, পৃঃ ৫৪৩।

নাসখের জ্ঞান

ইসলামী আইনবিদ ও কুরআনের ব্যাখ্যাকারদের নিকট নাসখের জ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এ বিষয়ের পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকলে ইসলামী আইনের প্রায়োগিক দিক নিয়ে অনেক সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যেতে হয়। রহিত আইন সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে কেউ কেউ অনেক সময় হালাল ভেবে নিজে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে এবং অন্যদেরকেও সেদিকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে। এ ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, একবার চতুর্থ খলিফা আলী ইবনু আবী তালিব ﵁ একজন বিচারককে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি মানসুখ (রহিত) আইন-কানুন সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন কি না। বিচারক জবাব দিলেন, "না।" আলী ﵁ তাকে বললেন, "তুমি নিজে ধ্বংস হয়েছো এবং অন্যদেরও ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছো!"[১] তবে উল্লেখ্য যে, বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নাসখ সংক্রান্ত ঘটনার সংখ্যা মাত্র অল্প কয়েকটি; আর এগুলো সনাক্ত করার সুনির্দিষ্ট তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। সেগুলো হলো:

১. নবী ﷺ কিংবা তাঁর কোনো সাহাবীর সুস্পষ্ট বক্তব্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ: নবী ﷺ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন,

"আমি তোমাদেরকে ইতিপূর্বে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, তবে এখন তোমরা তা করতে পারো; কারণ কবর যিয়ারত সন্দেহাতীতভাবে (পরকালীন জীবনের কথা) স্মরণ করিয়ে দেয়।"[২]

সালামাহ ইবনুল আকওয়া নামক এক সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, নিম্নোক্ত আয়াত:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ

"আর যাদের রোযা রাখার সামর্থ্য আছে, (এরপরও রাখে না) তারা যেন ফিদ্ইয়া দেয়; একটি রোযার ফিদ্ইয়া একজন মিসকিনকে খাওয়ানো।"[৩]

---

১ জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাঁর আল ইতকান (খণ্ড ৩, পৃঃ ৫৯) গ্রন্থে এটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

২ বুরাইদাহ কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম মুসলিম (সহীহু মুসলিম, খণ্ড ২, পৃঃ ৪৬৩-৪, নং ২১৩১), আবু দাউদ (সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ২, পৃঃ ৯১৯, নং ৩২২৯), নাসাঈ ও আহমদ।

৩ সূরা আল বাকারাহ (২): ১৮৪।

নাযিল হওয়ার পর যে রোজা না রাখতে চাইতো সে এর বিনিময়ে ফিদ্ইয়া প্রদান করতো যতক্ষণ না তার পরবর্তী এ আয়াত[১] নাযিল হয়ে উক্ত বিধানকে প্রতিস্থাপন করে:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ

"কাজেই এখন থেকে যে ব্যক্তি এ মাসের সাক্ষাৎ পাবে তার জন্য এই সম্পূর্ণ মাসটিতে রোযা রাখা অপরিহার্য।"[২]

২. রহিতকারী ও রহিত—উভয় আইনের ব্যাপারে প্রথম দিকের মুসলিম বিশেষজ্ঞদের পূর্ণ মতৈক্য। অর্থাৎ এই মর্মে তাদের মতৈক্য থাকতে হবে যে, বিধানটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক রহিত করা হয়েছে। এমন নয় যে, তারা নিজেরা একমত হয়েই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোনো আইনকে রহিত করে দিয়েছেন। একটি হাদীসে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে, যেখানে নবী ﷺ বলেছেন,

من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد الرابعة فاقتلوه

"যে ব্যক্তি মদ পান করে তাকে বেত্রাঘাত করো, আবার যদি পান করে বেত্রাঘাত করো, আবারও যদি পান করে বেত্রাঘাত করো; আর চতুর্থবার যদি পান করে তবে তাকে হত্যা করো।"[৩]

এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামগণ একমত ছিলেন যে, নেশা গ্রহণকারী ব্যক্তিকে হত্যা করতে হবে। পরবর্তীতে যে এ আইনটি কার্যকর করা হয়নি, এর কারণ

---

১ সূরা আল বাকারাহ (২): ১৮৫।

২ এই হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম বুখারী (সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ২৭, নং ৩৪) ও ইমাম মুসলিম (সহীহু মুসলিম, খণ্ড ২, পৃঃ ৫৫৫, নং ২৫৪৭-৮)। মনে রাখতে হবে, সাহাবায়ে কেরাম নাসখ শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন বিদ্যমান আইনে ব্যাপক পরিসরের পরিবর্তন বুঝাতে; পরবর্তী প্রজন্মের বিশেষজ্ঞগণ এ পরিভাষাটিকে যে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন সাহাবীরা ঠিক সেই অর্থে একে ব্যবহার করেননি। সাহাবীদের নিকট তাখছীছ (বিশেষায়ণ) ও পূর্ণ রহিতকরণ—উভয়টিই ছিলো নাসখের পরিধির অন্তর্ভুক্ত। রোজা রাখার পরিবর্তে একজন গরীব মানুষকে খাবার খাওয়ানোর যে সাধারণ অনুমতি ছিল—তা বাতিল করা হয়েছে। তবে ইবনু আব্বাসের বক্তব্য অনুযায়ী (সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ২৬-৭, নং ৩২) বয়োবৃদ্ধ ও আরোগ্য লাভের আশা নেই এমন রোগীদের জন্য আজও এই অনুমতি বহাল রয়েছে।

৩ এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ (সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ৩, পৃঃ ১২৫২-৩, নং ৪৪৬৭-৭০); নাসিরুদ্দীন আলবানী সহীহু সুনানি আবী দাউদ গ্রন্থে (খণ্ড ৩, পৃঃ ৮৪৮, নং ৩৭৬৩-৪) এটিকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

এটা ছিলো না যে, তারা নিজেরা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত (ইজমা) নিয়ে তা বাতিল করেছেন; বরং এর কারণ হলো তাদের সবার জানা ছিল যে, নবী ﷺ এ আইনটিকে বাতিল করে দিয়েছেন।[১]

৩. এ বিষয়ের নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক জ্ঞান যে, যে আইনটিকে রহিত করা হয়েছে সেটি রহিতকারী আইনটির পূর্বে নাযিল হয়েছে এবং তা রহিতকারী আইনটির কোনো সম্পূরক বিধি নয়, বরং তার সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক। উদাহরণস্বরূপ: শাদ্দাদ ইবনু আউস ؓ বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের সময় (৮ হিঃ/৬৩০ 'ঈসায়ী) নবী ﷺ বলেছিলেন,

افطر الحاجم والمحجوم

"শিঙ্গা[২] যে গ্রহণ করে এবং শিঙ্গা যে লাগিয়ে দেয়–উভয়েই রোজা ভঙ্গ করেছে।"[৩]

পক্ষান্তরে ইবনু আব্বাস ؓ বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ রোযারত ও ইহরাম অবস্থায় শিঙ্গা গ্রহণ করেছেন।[৪] এ বর্ণনার কিছু কিছু পাঠে বলা হয়েছে যে, এই ঘটনা বিদায় হজ্জের সময় (১০ হিঃ/৬৩২ 'ঈসায়ী) সংঘটিত হয়েছে।[৫]

দলিল হিসেবে কুরআন কিংবা সহীহ হাদীস থেকে কোনো প্রমাণ না থাকলে কেবল ইজতিহাদের মাধ্যমে নাসখ নির্ধারণ করা যায় না। একইভাবে কুরআন-হাদিসের কোনো ব্যাখ্যাকারীর মতামত কিংবা নিছক কারও কাছে মূল পাঠের কোনো অংশকে বাহ্যিকভাবে সাংঘর্ষিক মনে হলেই তার ভিত্তিতে নাসখের বিধান প্রয়োগ করার কোনো অবকাশ নেই।

---

১ ইমাম তিরমিযী তাঁর আল ইলাল গ্রন্থে এ বিষয়ে ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন। দেখুন সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ৩, পৃঃ ১২৫২, পাদটীকা নং ৩৯০৩।

২ শিঙ্গা লাগানো হলো ছেদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ত্বকের উপরিভাগে রক্ত টেনে এনে সংশ্লিষ্ট স্থানকে রক্তশূন্য করার একটি প্রথা– যা রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩ এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম আবু দাউদ (সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ২, পৃঃ ৬৫০, নং ২৩৬৩), তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও আহমদ; নাসিরুদ্দীন আলবানী সহীহু সুনানি আবী দাউদ গ্রন্থে (খণ্ড ২, পৃঃ ৪৫১, নং ২০৭৫) এটিকে প্রামাণ্য আখ্যায়িত করেছেন।

৪ সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৩, পৃঃ ৯১, নং ১৫৯।

৫ দেখুন ফাতহুল বারী, খণ্ড ৪, পৃঃ ২১০।

নাসখের প্রকারভেদ

আসমানী আইনের মূল উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ; আর এগুলোতে মূলত চার ধরনের নাসখ সংঘটিত হতে পারে:

১. কুরআন দ্বারা কুরআনের নাসখ:

এ ধরনের নাসখ তখন সংঘটিত হয় যখন কুরআনের আইনসংক্রান্ত কোনো আয়াতের স্থান দখল করে নেয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নতুন আইনসমৃদ্ধ আরেকটি আয়াত। এ ধরনের নাসখের একটি দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে অসচ্চরিত্রের নারীদের ব্যাপারে ইসলামী আইন সংক্রান্ত আয়াতে। কুরআনে প্রথম আইনটিকে নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে:

وَالّٰتِیۡ یَاۡتِیۡنَ الۡفَاحِشَۃَ مِنۡ نِّسَآئِکُمۡ فَاسۡتَشۡهِدُوۡا عَلَیۡهِنَّ اَرۡبَعَۃً مِّنۡکُمۡ ۚ فَاِنۡ شَهِدُوۡا فَاَمۡسِکُوۡهُنَّ فِی الۡبُیُوۡتِ حَتّٰی یَتَوَفّٰهُنَّ الۡمَوۡتُ اَوۡ یَجۡعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِیۡلًا

"তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী নিয়ে এসো। আর চার জন সাক্ষ্য দিয়ে যাবার পর তাদেরকে ঘরে আবন্ধ করে রাখো, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু এসে যায় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য কোনো পথ বের করে দেন।"[১]

উপরোক্ত আইনটিকে বেত্রাঘাতের নিম্নোক্ত আইনের মাধ্যমে বাতিল ও প্রতিস্থাপন করা হয়েছে:

اَلزَّانِیَۃُ وَالزَّانِیۡ فَاجۡلِدُوۡا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنۡهُمَا مِائَۃَ جَلۡدَۃٍ ۪

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী উভয়ের প্রত্যেককে এক শত বেত্রাঘাত করো।"[২]

২. দ্বিতীয় প্রকারের নাসখ হলো সুন্নাহর মাধ্যমে কুরআনের নাসখ:

এ ধরনের নাসখ আদৌ সংঘটিত হয়েছে কি না—এ নিয়ে কিছুটা বিতর্ক রয়েছে। যারা এ ধরনের নাসখ সম্ভব হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন তারা

---

১ সূরা আন নিসা (৪): ১৫।

২ সূরা আন নূর (২৪): ২।

উদাহরণ হিসেবে ওসিয়্যাত সংক্রান্ত আয়াতটিকে পেশ করছেন, যেখানে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে নিম্নোক্ত দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ

"তোমাদের কারোর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায় তাহলে তার পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনদের জন্য ন্যায়নীতি অনুযায়ী ওসিয়্যাত করে যাওয়াকে তার জন্য ফরয করা হয়েছে।"[১]

প্রাথমিক এই আইনটি উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনের মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হয়েছে এবং তা ঐ হাদীস দ্বারা বাতিল হয়ে গিয়েছে যেখানে নবী ﷺ বলেছেন,

"নিশ্চয় আল্লাহ (উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে) প্রত্যেক হকদারের অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন; সুতরাং যে উত্তরাধিকার সম্পত্তি লাভ করবে তার বরাবর আর কোনো ওসিয়্যাত করা যাবে না।"[২]

৩. তৃতীয় প্রকার নাসখ হলো কুরআনের মাধ্যমে সুন্নাহর নাসখ:

অর্থাৎ নবী ﷺ এর শেখানো কোনো ইসলামী আইনকে কুরআনে নাযিলকৃত কোনো আয়াতের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা। এ ধরনের নাসখের একটি উদাহরণ হলো বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায়ের বিধান রহিতকরণ। মদীনায় হিজরতের আগ পর্যন্ত মুসলিমরা নবী ﷺ এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জেরুজালেমে অবস্থিত বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ

---

১ সূরা আল বাকারাহ (২): ১৮০।

২ এই হাদীসট সংগ্রহ করেছেন ইমাম আবু দাউদ (সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ২, পৃঃ ৮০৮, নং ২৮৬৪), নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও আহমদ; নাসিরুদ্দীন আলবানী তাঁর সহীহু সুনানি আবী দাউদ গ্রন্থে (খণ্ড ২, পৃঃ ৫৫৪, নং ২৪৯৩) এটিকে প্রামাণ্য আখ্যায়িত করেছেন। উল্লেখ্য, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, এ হাদীসটি সূরা নিসা'র উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াতসমূহকে স্পষ্ট করে দেয় মাত্র। তাই তাঁদের দৃষ্টিতে নাসখ সম্পাদিত হয়েছে কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে, হাদীসের মাধ্যমে নয়। তাদের যুক্তি হলো এই যে, কুরআনের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুতাওয়াতির বর্ণনা পরম্পরার মাধ্যমে, পক্ষান্তরে (উক্ত) হাদীসের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অল্প সংখ্যক বর্ণনা পরম্পরার মাধ্যমে – যার ফলে উক্ত হাদীসের মধ্যে এতটুকু শক্তি সৃষ্টি হয়েছে যে, তা সূরা নিসা'র আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা করে দিতে পারে, কিন্তু তা এতোটা শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি যে, কুরআনের একটি আয়াতকে নিজে থেকেই রহিত করে দিবে। দেখুন শারহুল কাওকাবিল মুনীর, খণ্ড ৩, পৃঃ ৫২৯।

ফিরিয়ে সালাত আদায় করতেন। মদীনায় হিজরতের কিছু দিন পর আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ

"মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। এখন তোমরা যেখানেই থাকো না কেন এদিকেই মুখ করে নামায পড়তে থাকো।"[১]

নবী ﷺ এর স্ত্রী আয়েশা رضي الله عنها এ বিষয়টিও বর্ণনা করেছেন যে, রামাদানের রোযা সংক্রান্ত বিধান নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত আশূরা'র (১০ই মুহাররম) রোযা ছিল বাধ্যতামূলক। রামাদানের রোজা ফরজ হওয়ার পর আশূরা'র রোযাকে লোকেরা ঐচ্ছিক হিসেবে পালন করতো।[২] নবী ﷺ মদীনায় হিজরত করে দেখতে পেলেন যে, মিশরের ফেরাউনের কবল থেকে নবী মূসার পরিত্রাণ দিনের স্মরণে ইহূদীরা ঐ দিন রোযা রাখে। নবী ﷺ-ও মুসলিমদেরকেও রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন, কিন্তু এ ব্যাপারে কুরআনে কোনো ওহী নাযিল হয়নি। তবে হিজরতের দ্বিতীয় বছর আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيٓ أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ

"রামাদানের মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানবজাতির জন্য হিদায়াত এবং এমন দ্ব্যর্থহীন শিক্ষা সম্বলিত, যা সত্য-সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়। কাজেই এখন থেকে যে ব্যক্তি এ মাসের সাক্ষাৎ পাবে, তার জন্য এই সম্পূর্ণ মাসটিতে রোযা রাখা অপরিহার্য।"[৩]

৪. চতুর্থ প্রকার নাসখ হলো সুন্নাহ দ্বারা সুন্নাহর নাসখ:

এ ধরনের নাসখে নবী ﷺ এর সুন্নাহর মাধ্যমে সাব্যস্ত কোনো একটি আইনকে পরবর্তী সময়ের কোনো সুন্নাহর মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করে দেয়া হয়।

---

১ সূরা আল বাকারাহ (২): ১৪৪। ওহীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা জানার জন্য দেখুন সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৪, নং ১৩।

২ এই হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম বুখারী (সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ২৪, নং ২৯) ও ইমাম মুসলিম (সহীহু মুসলিম, খণ্ড ২, পৃঃ ৫৪৮-৯, নং ২৪৯৯-৫০৩)।

৩ সূরা আল বাকারাহ (২): ১৮৫।

সাহাবী জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ'র নিম্নোক্ত বক্তব্যে এ ধরনের নাসখের একটি দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

"আল্লাহর রাসূল ﷺ এর দু'টি নির্দেশের শেষেরটিতে আগুনে পাকানো বস্তু খাওয়ার পর ওযু না ভাঙ্গার কথা বলা হয়েছে।"[1] ইসলামের প্রথম দিকে নবী ﷺ তাঁর অনুসারীদেরকে রান্না করা খাবার খাওয়ার পর নামাজ পড়ার আগে ওযু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন; তবে পরবর্তী সময়ে তিনি তাদেরকে বলেছেন যে, এমনটি করা আর জরুরী নয়।

ইজমা বা কিয়াস এর মাধ্যমে কুরআন কিংবা সুন্নাহর কোনো আইন রহিত করার কোনোই অবকাশ নেই। ইজমা ও কিয়াসের উভয়টি হলো মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার ফল; তাই তাদের অনুসিদ্ধান্তসমূহ কখনও ভুলের উর্ধ্বে নয়। সুতরাং ইজমা ও কিয়াসকে ইসলামী আইনের দু'টি উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হলেও এগুলোকে আসমানী বিধান মনে করা হয় না। তবে কুরআন বা সুন্নাহতে সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা করা হয়নি–এমন পরিস্থিতির উপর শারীয়াহ প্রয়োগ করার সময় ইজমা ও কিয়াসকে ব্যবহার করা ইসলামী আইন-ব্যবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা।[2]

স্বয়ং কুরআনের মধ্যে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে নাসখ সম্পাদিত হতে পারে:

১. আয়াত ও আইনের নাসখ:

প্রথম পদ্ধতিতে নতুন আইন দ্বারা পূর্বের আইনটি বাতিল হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াতের পাঠও কুরআন থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। আয়েশা ؓ এর নিম্নোক্ত বক্তব্যে এ পদ্ধতির একটি দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়:

"ওহীসমূহের মধ্যে এ আইনটিও ছিল যে, কোনো ধাত্রী কোনো শিশুকে দশবার দুধ পান করালে ঐ শিশুর সাথে ধাত্রী ও তার নিকটাত্মীয়ের বিয়ে নিষিদ্ধ হয়ে যায়, যেমনটি ঘটে থাকে আপন মায়ের নিকটাত্মীয়দের ক্ষেত্রে।

---

১ এই হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম আবু দাউদ (সুনানু আবী দাউদ, খন্ড ১, পৃঃ ৪৬-৭, নং ১৯২), ইমাম তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ; নাসিরুদ্দীন আলবানী তাঁর সহীহু সুনানি আবী দাউদ গ্রন্থে (খন্ড ১, পৃঃ ৩৯, নং ১৭৭) এটিকে প্রামাণ্য আখ্যায়িত করেছেন।

২ দেখুন প্রিন্সিপলস অব ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স, পৃঃ ১৫০-১।

তারপর এই আইনটির স্থান দখল করে পাঁচবার দুধ পান করানো সংক্রান্ত আইন–যা আল্লাহর রাসূল ﷺ এর ইন্তেকালের অল্প কিছুদিন আগ পর্যন্তও কুরআনের অন্যান্য আয়াতসমূহের সাথে পঠিত হতো।"[১]

তবে এ ধরনের নাসখ খুবই কম।

২. আইনটি বলবৎ থাকে, শুধু আয়াতের তিলাওয়াত রহিত হয়ে যায়:

এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা সংশ্লিষ্ট আয়াতটির পাঠ কুরআন থেকে সরিয়ে নিয়ে তার তিলাওয়াত বন্ধ করে দিয়েছেন, কিন্তু আইনটিকে নতুন আইনের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করেননি। এ ধরনের নাসখও বিরল, যদিও তা প্রথম পদ্ধতির মতো ততোটা দুর্লভ নয়।

এ ধরনের নাসখের অল্প কয়েকটি দৃষ্টান্তের অন্যতম হলো বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ব্যভিচারীদেরকে পাথর মেরে হত্যা সংক্রান্ত আয়াত– যা দ্বিতীয় খলিফা উমার ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه বর্ণনা করেছেন। আর সেটি হলো:

الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة

"বৃদ্ধ নারী ও পুরুষ ব্যভিচার করলে তাদেরকে নিশ্চিতরূপে পাথর মারবে।"[২]

নবী ﷺ কুরআনের যে চূড়ান্ত আকার রেখে গিয়েছেন–উপরোক্ত আয়াতটি তার মধ্যে নেই; কিন্তু তিনি নিজেই বেশ কয়েকটি ঘটনায় ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা সংক্রান্ত আইনটিকে প্রয়োগ করেছেন এবং তা হাদীসে সুসংরক্ষিত রয়েছে। তাঁর পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের সকলেই এ আইনটিকে প্রয়োগ করেছেন।[৩]

৩. আয়াতের তিলাওয়াত বহাল থাকবে, শুধু আইন রহিত হয়ে যাবে:

এটি হলো নাসখের সবচেয়ে সাধারণ রূপ যেখানে এক আয়াতে বর্ণিত কোনো আইন অন্য আরেকটি আয়াতে বর্ণিত আইনের মাধ্যমে বাতিল হয়ে যায়,

---

১ সহীহু মুসলিম, খণ্ড ২, পৃঃ ৭৪০, নং ৩৪২১।

২ দেখুন সহীহু মুসলিম, খণ্ড ৩, পৃঃ ৯১২, নং ৪১৯৪ ও ইবনু মাজাহ। আয়াতের শব্দাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন ইমাম ইবনু মাজাহ। (দেখুন মাওসুআতুল হাদীছিশ শারীফ, ইবনু মাজাহ, হুদুদ অধ্যায়, নং ২৫৪৩)।

৩ দেখুন সহীহু মুসলিম, খণ্ড ৩, পৃঃ ৯১১-৯২২, নং ৪১৯১-৪২২৫।

কিন্তু আগের আয়াতটির মূল পাঠ যথারীতি কুরআনে থেকে যায়। এ প্রক্রিয়ায় আইন রহিত হওয়ার সুস্পষ্ট উদাহরণ রয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে:

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ

"তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদের স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীদের যাতে এক বছর পর্যন্ত ভরণ-পোষণ করা হয় এবং ঘর থেকে বের করে না দেয়া হয়, সে মর্মে স্ত্রীদের পক্ষে মৃত্যুর পূর্বে ওসিয়্যাত করে যাওয়া উচিত।"[১]

এ আয়াত পরবর্তী সময়ে নাযিলকৃত আরেকটি আয়াতের মাধ্যমে বাতিল হয়ে গিয়েছে, যে আয়াতে বলা হয়েছে:

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا

"তোমাদের মধ্য থেকে যারা মারা যায়, তাদের (মৃত্যুর) পরে যদি তাদের স্ত্রীরা জীবিত থাকে, তাহলে তাদের চার মাস দশ দিন নিজেদেরকে (বিবাহ করা থেকে) বিরত রাখতে হবে।"[২]

প্রতিস্থাপনের প্রকারভেদ

একটি আইন বাতিল হয়ে গেলে কখনও তা আরেকটি আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতো; আবার কখনও আইনটি কেবলই বাতিল করা হয়েছে, কোনো নতুন আইন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়নি। প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে নতুন আইনটি আগের আইনের তুলনায় হতে পারে সহজতর, হতে পারে সমমানের, আবার কখনও অধিকতর কঠিনও হতে পারে। সুতরাং প্রতিস্থাপনের দিক থেকে সর্বমোট চারভাবে একটি আইন বাতিল হয়ে যেতে পারে:

---

১ সূরা আল বাকারাহ (২): ২৪০।

২ সূরা আল বাকারাহ (২): ২৩৪। উল্লেখ্য, ক্রমধারার দিক দিয়ে ২৩৪ নং আয়াতটি ২৪০ নং আয়াতের পূর্বে হলেও ২৩৪ নং আয়াতটি ২৪০ নং আয়াতের পরে নাযিল হয়েছে। তবে আয়াতসমূহ লিপিবদ্ধ ও তিলাওয়াত করার সময় নবী (সা.) ঐশী নির্দেশ মোতাবেক সেগুলোর বিন্যাস পরিবর্তন করিয়েছেন। দেখুন সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৪০, নং ৫৩।

১. প্রতিস্থাপন ছাড়া রহিত:

এ ধরনের নাসখের একটি দৃষ্টান্ত হলো নবী ﷺ এর সাথে ব্যক্তিগত পরামর্শ করার পূর্বে সাদাকাহ করা সংক্রান্ত বিধান বাতিল। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত নির্দেশ প্রদান করেছিলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَٰجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَةً ۚ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন রাসূলের সাথে একান্তে আলাপ করতে চাও তখন আলাপ করার আগে কিছু সাদাকা করে নিও।"[১]

পরবর্তীতে মহান আল্লাহ এই বলে তাদেরকে উক্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন:

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَٰتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ

"একান্ত আলাপের আগে সাদাকা দিতে হবে ভেবে তোমরা ঘাবড়ে গেলে না কি? ঠিক আছে, সেটা যদি না করতে পারো—বস্তুত আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে অব্যাহতি দিয়ে দিয়েছেন; তাহলে সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে থাকো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে থাকো।"[২]

২. একটি সহজতর আইনের মাধ্যমে পূর্বের কঠিনতর আইন নাসখ:

এ ধরনের নাসখ সংঘটিত হয়েছে রোযা সংক্রান্ত আইনে। ইবনু উমার رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে, নিম্নোক্ত আয়াত নাযিলের মাধ্যমে:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

---

১ সূরা আল মুজাদালাহ (৫৮): ১২।
২ সূরা আল মুজাদালাহ (৫৮): ১৩।

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করে দেয়া হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। এ থেকে আশা করা যায়, তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে।"[১]

মুসলিমদের জন্য (সন্ধ্যা) রাতের নামাজ আদায় কিংবা ঘুমিয়ে পড়ার পর থেকে পরের দিন সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত পানাহার ও সহবাস নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। তারপর আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ

"রোযার সময় রাতের বেলা স্ত্রীদের কাছে যাওয়া তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হলো।"[২]

৩. একই ধরনের আইনের মাধ্যমে নাসখ:

এ ধরনের নাসখের একটি দৃষ্টান্ত হলো নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে বাইতুল মাকদিস থেকে মক্কার দিকে কিবলাহ পরিবর্তন:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ

" মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। এখন তোমরা যেখানেই থাকো না কেন এদিকেই মুখ করে নামায পড়তে থাকো।"[৩]

৪. একটি কঠিনতর আইনের মাধ্যমে নাসখ:

এ ধরনের নাসখের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো সেই আইন বাতিল করে দেয়া যেখানে রোযা রাখতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে রোযার পরিবর্তে ফিদ্‌ইয়া দেওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। নতুন আইনে শারীরিকভাবে সক্ষম সকল ব্যক্তির উপর রোযা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে।[৪]

---

১ সূরা আল বাকারাহ (২): ১৮৩।

২ সূরা আল বাকারাহ (২): ১৮৭। এই বর্ণনাটি সংগ্রহ করেছেন ইবনু আবী হাতিম। আরো দেখুন সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ২৮, নং ৩৫।

৩ সূরা আল বাকারাহ (২): ১৪৪। দেখুন 'নাসখ অব দ্যা সুন্নাহ বাই দ্যা কুরআন', পৃঃ ২২৬।

৪ আরো বিস্তারিত জানার জন্য 'নাসখের জ্ঞান' শিরোনামের ১ নং পয়েন্ট দেখুন।

নাসখের প্রজ্ঞা

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, এক আইন দ্বারা আরেক আইনের প্রতিস্থাপন মূলত বেশ কিছু উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ কারণকে সামনে রেখে করা হয়েছে। কারণ আল্লাহর কোনো কাজই নিছক তামাশা বা উদ্দেশ্যহীন নয়। এসব কারণের কয়েকটির বর্ণনা আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন, আর বাকী কারণসমূহ সুস্পষ্ট ও আল্লাহ তা'আলার কার্যধারা থেকে উৎসারণযোগ্য। যদিও কতিপয় আইন প্রতিস্থাপনের কারণ আমাদের জ্ঞানের বাইরে। আল্লাহর সত্তা আমাদের জ্ঞান ও উপলব্ধির বাইরে। তাঁর জ্ঞানের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই, তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে ঘিরে রেখেছে। তাই মানুষ স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর কার্যাবলীর নেপথ্যে বিরাজমান প্রজ্ঞাকে পূর্ণরূপে অনুধাবন করার ক্ষমতা রাখে না। তবে নাসখের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত মৌলিক কারণসমূহ উপলব্ধি করা যায়:

১. নাসখ হলো মানব সমাজের উন্নতির সাথে সঙ্গাতি বজায় রেখে আসমানী আইনসমূহকে ধীরে ধীরে পূর্ণতার স্তরে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণকে বিবেচনায় রাখার একটি মাধ্যম।

২. এটি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ঈমানদারদেরকে পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হয়—যেখানে তাদেরকে কিছু সুনির্দিষ্ট আইন নিবিড়ভাবে অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয় এবং কিছু কিছু জায়গায় তাদেরকে সেসব আইন অনুসরণ না করার নির্দেশ দেয়া হয়। আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করতে ঈমানদাররা কতোটুকু প্রস্তুত এবং আল্লাহর প্রজ্ঞার উপর তাদের কতটুকু বিশ্বাস রয়েছে—এ বিচিত্র পরিস্থিতি সৃষ্টি করার মাধ্যমে মূলত তারই পরীক্ষা নেয়া হয়।

৩. এর মাধ্যমে এটি দেখানো হয় যে, আল্লাহ মুসলিম জাতির কল্যাণ ও স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করেন। যে নাসখে পুরাতন আইনকে একটি কঠিনতর আইনের মাধ্যমে বাতিল করা হয়, সেখানে ঈমানদারদেরকে বৃহত্তর পুরস্কার অর্জনের একটি সুযোগ করে দেয়া হয়; এ ক্ষেত্রে মূলনীতিটি হলো—কাঠিন্য যত বেশী, পুরস্কারও তত বেশী। পক্ষান্তরে, যে নাসখে পুরাতন আইনকে একটি সহজতর আইনের মাধ্যমে বাতিল করা হয়,

সেখানে ঈমানদারদেরকে একটু বিশ্রাম দান করে এ বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যে, আল্লাহ মূলত তাদের কল্যাণই কামনা করেন।

নাসিখ মানসুখ বিষয়ক গ্রন্থাবলী

অনেক বিশেষজ্ঞ সুনির্দিষ্টভাবে এ বিষয়ের উপর বেশ কিছু গ্রন্থ সঙ্কলন করেছেন। সম্ভবত এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক প্রাচীন গ্রন্থটি হলো বিখ্যাত তাবিয়ী হাদীস বিশেষজ্ঞ কাতাদাহ ইবনু দিয়ামা'র (মৃত্যু ৭৩৭ 'ঈসায়ী/১১৮ হিঃ) লেখা 'আন নাসিখ ওয়াল মানসুখ ফী কিতাবিল্লাহ'। অন্যান্য যেসব বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন: ইবনু হাযাম যাহিরী (মৃত্যু ৯৩২ 'ঈসায়ী/৩২০ হিঃ), আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ নাহহাস (মৃত্যু ৯৫০ 'ঈসায়ী/৩৩৮ হিঃ), মাকী ইবনু আবী তালিব (মৃত্যু ১০৪৬ 'ঈসায়ী/ ৪৩৭ হিঃ) ও ইবনুল জাওযী (মৃত্যু ১২০১ 'ঈসায়ী/৫৯৭ হিঃ)।[1]

১ মা'লুমাত – মাকতাবাতুল কুরআন কর্তৃক প্রকাশিত আল কুরআনুল কারীম (আরবি সিডি)।

১৩

মুহ্কাম ও মুতাশাবিহ্

মানবজাতির নিকট কুরআন নাযিল হয়েছে ফুরকান হিসেবে; অর্থাৎ স্রষ্টা ও সৃষ্টির সাথে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যা নিরূপণের একটি মাধ্যম হিসেবে। কোনো আন্দাজ-অনুমান কিংবা সংশয়ের অবকাশ না রেখে এসব সম্পর্কের মূলনীতিসমূহ কুরআনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এগুলোই হলো কুরআনের সারনির্যাস (উম্মুল কিতাব)। দৃষ্টান্তস্বরূপ: সালাতের মূলনীতিতে মানুষ ও আল্লাহর মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে, পক্ষান্তরে যাকাতের মূলনীতিতে জোর দেয়া হয়েছে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ দিকটির ওপর। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে কুরআনের বর্ণনা তুলে ধরেছেন:

كِتٰبٌ فُصِّلَتۡ اٰيٰتُهٗ قُرۡاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوۡمٍ يَّعۡلَمُوۡنَ ۝٣

"এটি এমন এক গ্রন্থ যার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে আরবি ভাষায়—সেসব লোকদের জন্য যারা জ্ঞানের অধিকারী।"[১]

স্বয়ং কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহের মাধ্যমেই মুসলিম জাতির ঐক্যের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করা হয়েছে। এসব আয়াত ও তার মূলনীতিসমূহকে 'মুহ্কামাত' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

তবে কুরআন যেহেতু মানুষ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট গোটা জগতের রহস্যাদি নিয়ে আলোচনা করে, সেহেতু অনিবার্য কারণেই এ গ্রন্থে বাস্তবতার এমন কিছু অস্পষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেগুলো সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত। এগুলোর মধ্যে এমন কয়েকটি বিষয় রয়েছে যা কেবল অন্য আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়লেই বুঝা সম্ভব; আর কিছু বিষয় তো এমন

---

১ সূরা ফুস্সিলাত (৪১): ৩।

রয়েছে যেগুলোর তাৎপর্য বুঝা আদৌ সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ: কতিপয় সূরার শুরুতে আরবি বর্ণমালার যেসব অক্ষর রয়েছে সেগুলোর নিজস্ব কোনো স্পষ্ট অর্থ নেই। প্রাচীন আরবি কাব্যে এগুলোর ব্যবহার থাকলেও তা কখনো বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হয়নি, তাছাড়া প্রসঙ্গ থেকে সবসময় সেগুলোর বাঞ্ছিত অর্থ বুঝা যেতো। আরবি কাব্যের নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিতে তার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে:

قلنا لها : قفى فقالت ق

ক্বুলনা লাহাঃ ক্বিফী, ফাকালাত ক্বাফ[১]

(আমরা তাকে বললাম, 'থামো'; আর সে বললো, 'ক্বাফ' [ক্বাফ শব্দটি ওয়াক্বাফতু শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ– যার অর্থ 'আমি থামলাম']))।

তবে কুরআনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক যুগের কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেছেন যে, সূরার শুরুর এসব অক্ষরের সাথে সংশ্লিষ্ট সূরার পাশাপাশি কুরআনের অন্যান্য সূরায় ঐ অক্ষরের ব্যবহারের মধ্যে একটি গাণিতিক সম্পর্ক রয়েছে। এ বিষয়টির ব্যাখ্যামূলক উদাহরণের জন্য আমরা সূরা ক্বাফ'কে পর্যালোচনা করি, যার শুরু হয়েছে এভাবে:

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۝١

"ক্বাফ, মহিমান্বিত কুরআনের শপথ।"

গবেষণায় দেখা গেছে যে, এ সূরায় আরবি বর্ণমালার অন্যান্য অক্ষরের তুলনায় 'ক্বাফ' অক্ষরটি অধিক হারে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া এ সূরার সামগ্রিক অক্ষর সংখ্যার সাথে ক্বাফের অনুপাত কুরআনের অন্য একশ' তেরটি সূরায় ব্যবহৃত ক্বাফের অনুপাতের চেয়ে বেশী।

তবে ক্বাফ বর্ণের বাঞ্ছিত অর্থ আমাদের জানা নেই। অনুমানের ভিত্তিতে কুরআনের কতিপয় ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, এটি হলো 'কুরআন' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ; আবার অনেকের মতে, এ অক্ষরটি 'ক্বুদিয়াল আমর' (অবধারিত)

---

১ ইবনু ফারিস কর্তৃক উল্লিখিত ও মিন ''উলূমিল কুরআন গ্রন্থে (পৃঃ ১৩৬) উদ্ধৃত।

শব্দগুচ্ছের প্রতিনিধিত্ব করে। যেহেতু যার উপর কুরআন নাযিল হয়েছে সেই মুহাম্মাদ ﷺ এর অর্থ বিশ্লেষণ করে দেননি এবং তার ব্যাকরণগত প্রেক্ষাপটও কোনো সুস্পষ্ট অর্থের ইঙ্গিত বহন করে না; তাই আমরা সততার সাথে শুধু এতোটুকুই বলতে পারি যে, একমাত্র আল্লাহ-ই এর সঠিক অর্থ জানেন।

আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো 'রূহ' (আত্মা) সম্পর্কিত; যার সম্পর্ক স্বয়ং মানুষের সাথে। ওহী ও মানবীয় অভিজ্ঞতা—উভয়টি থেকেই আত্মার অস্তিত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়; তবে তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না। আত্মার উৎস প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন,

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى

"এরা তোমাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বলে দাও, 'রূহ আমার রবের হুকুমে'।"[১]

এখান থেকে আমরা জানতে পারি যে, আত্মা একটি মাখলুক, তবে তা কী দিয়ে তৈরী–তা কেবল আল্লাহ-ই জানেন। যদিও এর অন্যান্য অনেক বিষয় আমরা জানি। যেমন: মাতৃগর্ভে মানব শিশুর ক্রমবিকাশের সময় পঞ্চম মাসে একজন ফেরেশতা একে ভ্রূণের মধ্যে স্থাপন করেন, আরেকজন ফেরেশতা মৃত্যুর সময় তা মানবদেহ থেকে বের করে নেন ইত্যাদি।[২] তবে তা কী উপাদান দিয়ে তৈরী হয়েছে, এর গঠন ও দেহের কোন জায়গায় এর অবস্থান কিংবা এটি দেহের সাথে কীভাবে সংযুক্ত–এসব ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।

মানুষ ও তার জগৎ সম্পর্কিত একটি দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে পরকালীন জীবন ও কিয়ামতের আলোচনায়। এসব ক্ষেত্রে জান্নাত ও জাহান্নামের বিভিন্ন ফলমূল ও পানীয়সমূহকে নাম ধরে উল্লেখ করা হয়েছে; তবে ইবনু আব্বাসের মতে শুধু তাদের নামগুলোই একরকম, বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন।[৩] স্বয়ং আল্লাহ এদের কয়েকটির অনুপম বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন: প্রবাহমান দুধের নদী যা কখনো টক হবে না, কিংবা এমন মদ যা নেশার সৃষ্টি করবে

১ সূরা আল ইসরা (১৭): ৮৫।
২ দেখুন কুরআন ৩২: ১১ ও সহীহু মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃঃ ১৩৯১-৩, নং ৬৩৯০-৭।
৩ ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু জারীর কর্তৃক সংগৃহীত। দেখুন তাফসীরু ইবনি কাসীর, খণ্ড ১, পৃঃ ৬৬।

না, আমল পরিমাপের জন্য পাল্লা বা মীযান এবং জাহান্নামবাসীদের ত্বক যা অগ্নিদগ্ধ হওয়ার পর পুনরায় গজিয়ে উঠবে।

একইভাবে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়ক্ষণও আমাদের অজানা। যদিও এর অনেকগুলো নিদর্শনের কথা কুরআন ও সুন্নাহতে উল্লেখ রয়েছে এবং এ প্রলয় প্রক্রিয়াকে জীবন্তরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে, তথাপি এর সঠিক দিনক্ষণ মানুষের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এ কারণে কিয়ামত ও পরকালীন জীবনের যেসব উপাদানের কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো সবসময়ই অস্পষ্ট।

কুরআনের যেসব আয়াতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির এ ধরনের রহস্যাদি নিয়ে অস্পষ্ট ভঙ্গিতে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলোকে বলা হয় 'মুতাশাবিহাত'। কিছু কিছু আয়াতে কুরআন নিজেকে সম্পূর্ণ 'মুহ্কাম' হিসেবে পরিচয় দিয়েছে; একটি আয়াতে কুরআনকে সম্পূর্ণ মুতাশাবিহ এবং অপর আরেকটি আয়াতে কুরআনকে আংশিক মুহ্কাম ও আংশিক মুতাশাবিহ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এতে কোনো সাংঘর্ষিক বৈপরীত্য তৈরী হয় না। কারণ প্রথম দু'টি ক্ষেত্রে শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে স্বাভাবিক অর্থে, আর সর্বশেষ ক্ষেত্রটিতে সেগুলো ব্যবহৃত হয়েছে অধিকতর পারিভাষিক অর্থে। যেহেতু আরবি পরিভাষা 'মুহ্কাম' এর সাধারণ অর্থ হলো 'যথার্থ' বা 'পূর্ণরূপে গঠিত'; সেহেতু এর গঠনশৈলী, যুক্তিবিন্যাস ও অন্তর্নিহিত বার্তার দিক থেকে সমগ্র কুরআনকে সাধারণভাবে মুহ্কাম হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নোক্ত ভাষায়:

الٓر ۚ كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝١

"আলিফ-লাম-রা। একটি ফরমান। এর আয়াতগুলো সুস্পষ্ট এবং সুবিন্যস্তভাবে বিবৃত হয়েছে, এক পরম প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে।"[১]

অনুরূপভাবে নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুতাশাবিহ শব্দের স্বাভাবিক অর্থ (পরস্পর সদৃশ বা একই রকম)-কে সমগ্র কুরআনের প্রতি আরোপ করেছেন:

---

১ সূরা হুদ (১১): ১।

ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِىَ

"আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী নাযিল করেছেন, এমন একটি গ্রন্থ যার সমস্ত অংশ সামঞ্জস্যপূর্ণ বা পরস্পর সদৃশ, যার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।"[১]

অর্থাৎ ছন্দ ও কাব্যিক পূর্ণতার দিক থেকে কুরআনের সকল আয়াত পরস্পরের সাথে সাদৃশ্যশীল এবং এগুলোর একটি অপরটির অর্থকে সমর্থন করে।

তবে এ দু'টি পরিভাষার সুনির্দিষ্ট অর্থ তাফসীরশাস্ত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচের আয়াতে সেসব অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে, যার সাথে সাথে রয়েছে একটি কঠোর হুঁশিয়ারি:

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٧﴾

"তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন। এ কিতাবে দুই ধরনের আয়াত আছে: এক হচ্ছে 'মুহ্কামাত', যেগুলো কিতাবের আসল বুনিয়াদ এবং দ্বিতীয় হচ্ছে 'মুতাশাবিহাত'। যাদের মনে বক্রতা আছে তারাই ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সবসময় মুতাশাবিহাতের পেছনে লেগে থাকে এবং তার মনগড়া অর্থ করার চেষ্টা করে থাকে। অথচ সেগুলোর আসল অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। আর পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারীরা বলে, 'আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, এসব আমাদের রবের পক্ষ থেকেই এসেছে'; আর প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান লোকেরাই কোনো বিষয় থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।"[২]

অতএব মুহ্কাম এর সংজ্ঞায় বলা যেতে পারে যে, তা হলো এমন কিছু আয়াত যার অর্থ সুস্পষ্ট, আর মুতাশাবিহ মূলত সেসব আয়াত যার অন্তর্নিহিত অর্থ কেবল আল্লাহই ভালো জানেন। আয়েশা ﵂ বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ উপরোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন,

---

১ সূরা যুমার (৩৯): ২৩।
২ সূরা আলে ইমরান (৩): ৭।

فاذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولائك الذين سمى الله فاحذروهم

"তোমার সাথে যদি সেসব লোকের দেখা হয় যারা অস্পষ্ট আয়াতসমূহের (মুতাশাবিহ) পেছনে লাগে, তখন বুঝে নিবে তারাই সেসব ব্যক্তি যাদের কথা আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন; সুতরাং তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকবে।"[১]

মুহ্‌কাম ও মুতাশাবিহ—ধারণা দু'টি থেকে কুরআন বুঝার কিছু দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। ইসলামী জীবনব্যবস্থায় আইনগত বিষয়গুলোর ভিত্তি গড়ে উঠেছে মুহ্‌কাম আয়াতসমূহকে কেন্দ্র করে। প্রাথমিক যুগের বিশেষজ্ঞগণ তাই মুহ্‌কাম আয়াতের উপরই অধিক মনোনিবেশ করেছেন– যেগুলোর সাথে মানুষের কার্যাবলীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে, যেসব আয়াত যুক্তি-বুদ্ধি ও সার্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য ব্যাকরণের মূলনীতি অনুসারে বিশ্লেষণযোগ্য ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার মতো। তবে যারা ভেতর থেকে ইসলামকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছেতারা ইসলামের উৎসমূল কুরআনের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। মুহ্‌কাম আয়াতসমূহ তাদেরকে দার্শনিক ব্যাখ্যা করার সুযোগ করে দেয় না। এ কারণে মুতাশাবিহ আয়াতসমূহ তাদের জন্য ভিন্নধর্মী ইসলামের খুঁটিতে পরিণত হয়েছে; আর আল্লাহর নাম ও গুণাবলীসমূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের ব্যাখ্যার সূচনাবিন্দু। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ কুরআনে নিজেকে তাঁর অসংখ্য গুণাবলীর মধ্য থেকে 'আল বাছীর' (সর্বদ্রষ্টা) ও 'আস সামী' (সর্বশ্রোতা) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। নবী ﷺ কিংবা তাঁর ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সাহাবায়ে কেরামগণ এসব আয়াতকে 'কেন ও কীভাবে'– এসব প্রশ্নের দিকে না গিয়ে সেগুলোকে স্বাভাবিক অর্থেই গ্রহণ করতেন। তাঁদের মতে আল্লাহ সবকিছু দেখেন ও শোনেন; তবে তাঁর দেখা-শোনার সাথে সৃষ্টজীবের দেখা-শোনার কোনো সাদৃশ্য নেই। তবে সাহাবায়ে কেরামদের পর কেউ কেউ এ যুক্তি উপস্থাপন করলেন যে, দেখা ও শোনা মানুষ কিংবা প্রাণীর বৈশিষ্ট্য—যার জন্য বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োজন

১ এ হাদীসটি সংগ্রহ করছেন ইমাম বুখারী (সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ৫৩-৪, নং ৭০) ও ইমাম মুসলিম (সহীহু মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃঃ ১৪০২, নং ৬৪৪২)।

হয়; আর সেসব মানবীয় অঙ্গ সর্বশক্তিমান আল্লাহর সত্তার জন্য মানানসই নয়। কেননা মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ

"তাঁর মতো কিছুই নেই।"[১]

ফলশ্রুতিতে উদ্ভব ঘটে 'জাহ্‌মিয়া' নামে একটি দর্শনগোষ্ঠীর–যারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীকে অস্বীকার করে বসে। এদের থেকে জন্ম নিয়েছে মু'তাযিলা নামে আরেকটি দল–যারা গ্রীক যুক্তিবিদ্যা এবং কুরআন ও সুন্নাহর অতিশয় যুক্তিবাদী ব্যাখ্যার মাধ্যমে জাহম ইবনু সাফওয়ানের সুস্পষ্ট ধর্মদ্রোহী বক্তব্যসমূহের তীব্রতার মাত্রা কিছুটা কমিয়ে দিয়েছে। প্রথম দিকের আব্বাসী শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই দার্শনিক দলটি মুসলিম উম্মাহকে এতোটাই গ্রাস করে ফেলে যে, তাদের ধারণাসমূহই একমাত্র গ্রহণযোগ্য মানদণ্ডে পরিণত হয় এবং যারা এর বিরোধিতা করেছে তাদেরকে যথারীতি শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়। আল্লাহর নামসমূহকে স্বীকার করা হলেও সেগুলোকে অর্থহীন করে ফেলা হয় এবং তাঁর দর্শন ও শ্রবণ সংক্রান্ত গুণসমূহকে কেবল 'জ্ঞান' অর্থে গ্রহণ করা হয়।

কালের পরিক্রমায় উম্মাহর মধ্যে এমন কতিপয় দলেরও আবির্ভাব ঘটেছে যাদের দাবী– সমগ্র কুরআনই হলো মুতাশাবিহ, আর কেবল তারাই এর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে অবগত। তারা কুরআনের বাহ্যিক অর্থকে নাম দিয়েছে 'যাহির বা ছারীহ' আর গোপন অর্থকে আখ্যায়িত করেছে 'বাতিন বা হাকীকত' হিসেবে। কারো কারো দাবী এই যে, কুরআনের গোপন অর্থসমূহ নবী ﷺ এর বংশধরদের মাধ্যমে গোপনে প্রচারিত হয়েছে, যাদেরকে তারা ইমাম নামে অভিহিত করেছে। আবার কেউ কেউ দাবী করেছেন যে, কুরআনের গোপন অর্থসমূহ প্রচারিত হয়েছে কতিপয় শায়খ বা আধ্যাত্মিক নেতার মাধ্যমে।

সৌভাগ্যক্রমে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের এ ধারাকে কুরআনে 'বক্র হৃদয় ও বিকৃতির ফল' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং নবী ﷺ মুসলিম উম্মাহকে এসব পন্থা অবলম্বনকারীদের পরিহার করার জন্য হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। ফলে

---

১ সূরা শূরা (৪২): ১১।

তা আমাদের জন্য কুরআনের মুহ্‌কাম আয়াতসমূহে বিবৃত সুস্পষ্ট বার্তাকে সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

১৪

কুরআনের সাহিত্যশৈলী

কুরআনের অল্প কয়েকটি আয়াতের উপর ক্ষণিক দৃষ্টিপাত করলেও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এতে বিচিত্র প্রকৃতির সাহিত্যশৈলীর সমাবেশ রয়েছে। রকমারি সাহিত্যিক বৈচিত্র্যের মাধ্যমে পাঠক বা শ্রোতার সামনে নিছক মনোমুগ্ধকর উপস্থাপনাই করা হয়নি, বরং এর মাধ্যমে কুরআনের মূল বার্তাকে সর্বাধিক কার্যকর পদ্ধতিতে পেশ করা হয়েছে।

পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরআনের উদ্দেশ্য হলো তিনটি ক্ষেত্রে মানুষকে মৌলিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা; যথা:

১. আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক;

২.মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক; এবং

৩.পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর সাথে মানুষের সম্পর্ক।

কুরআনের একেবারে প্রথম আয়াতটি থেকে নিয়ে সর্বশেষ আয়াত পর্যন্ত প্রত্যেকটি সূরা ও আয়াতে এ উদ্দেশ্যটি বিদ্যমান। একই দিকে আহ্বানের পুনরাবৃত্তি যেন পাঠকের মধ্যে একঘেয়েমী না আসে এবং আপাতদৃশ্য পুনরাবৃত্তি যেন বিরক্তির সৃষ্টি না করে বরং পাঠকের নিকট হৃদয়গ্রাহী করে বার্তাটি পৌঁছে দেয়, সে লক্ষ্যে বিচিত্র সাহিত্যিক ঢং ব্যবহার করা হয়েছে। এসব রচনাশৈলীর অনেকগুলোই আরবি ভাষা ও তার গঠনপ্রকৃতির জন্য অনন্য; কিছু কিছু আবার অত্যন্ত জটিল—যা কেবল সাহিত্যবিশারদ ও ভাষাতাত্ত্বিকরাই মূল্যায়ন করতে পারেন। এ অধ্যায়ে আমরা সাহিত্যের এমন চারটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক শৈলী নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবো—যা প্রায় কুরআনের সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে; আর সেগুলো হলো— মাসাল (উপমা, প্রবাদ ও রূপকালঙ্কার), কসম (শপথ), জাদাল (বিতর্ক) ও কিস্সাহ (গল্প)।

মাসাল

'মাসাল' শব্দটির সাধারণ অনুবাদ উপমা বা রূপকালঙ্কার হলেও কুরআনের বর্ণনা প্রসঙ্গে এ শব্দটির অর্থের মধ্যে প্রবাদ, এমনকি আদর্শভাবও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ কারণে ইসলামী জ্ঞানের দৃষ্টিতে মাসাল হলো, সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রভাবশালী ও চলমান একটি বাক্য বা ছত্র–যেখানে গঠনশৈলী যা-ই হোক না কেন–একটি ধারণা মূর্ত হয়ে উঠে। কুরআনে মাসালের তিনটি মৌলিক শৈলী ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো হলো: মুসাররাহ মাসাল (উক্ত), কামিন মাসাল (গুপ্ত) ও মুরসাল মাসাল (ঢংবিহীন)।[১]

১. মাসাল মুসাররাহ (উক্ত)

এটি হলো স্পষ্টভাবে বাস্তবসম্মত তুলনা দেওয়ার একটি শৈলী; আর এটি কুরআনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।[২] এ ধরনের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে আগুন ও পানি সংক্রান্ত উপমা ও রূপকালঙ্কারসমূহে–যা সেসব মুনাফিকদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে যারা ইসলাম গ্রহণের ভান করেছিল মাত্র। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ
فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ
فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ
وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

"এদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে– যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালালো এবং যখনই সেই আগুন চারপাশ আলোকিত করলো, তখন আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে ছেড়ে দিলেন এমন অবস্থায় যেন অন্ধকারের মধ্যে তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। তারা কালা, বোবা, অন্ধ। তারা আর ফিরে আসবে না। অথবা এদের

---

১ মাবাহিস ফী ''উলূমিল কুরআন, পৃঃ ২৯৩।

২ আল ইতকান, খণ্ড ৪, পৃঃ ৩৯।

দৃষ্টান্ত এমন যে– আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, তার সাথে আছে অন্ধকার মেঘমালা, বজ্রের গর্জন ও বিদ্যুতের চমক। বজ্রপাতের আওয়াজ শুনে নিজেদের মৃত্যুভয়ে এরা কানে আঙুল ঢুকিয়ে দেয়। আল্লাহ এ সত্য অস্বীকারকারীদেরকে সবদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। বিদ্যুৎ চমকে তাদের অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন বিদ্যুৎ শীগ্‌গির তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেবে। যখন সামান্য একটু আলো তারা অনুভব করে তখন তার মধ্যে তারা কিছুদূর চলে এবং যখনই তাদের ওপর অন্ধকার ছেয়ে যায়, অমনি তারা দাঁড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ চাইলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি একেবারেই কেড়ে নিতে পারতেন। নিঃসন্দেহে তিনি সবকিছুর ওপর শক্তিশালী।”[১]

এ আয়াতে আগুন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে আলোকশক্তি থাকার কারণে, আর পানি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে মাটিকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা থাকার কারণে। আগুন ও পানি মূলত প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে। আকাশ থেকে ওহী নাযিল করা হয়েছে মানুষের অন্তঃকরণকে আলোকিত করে তাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের জন্য। এসব আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা আগুন ও পানির উপমা ব্যবহার করেছেন যারা মুসলিম হওয়ার নিছক ভান করে আছে তাদের উপর ওহীর প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণের জন্য। যেসব কপট লোক কেবল বস্তুগত সুবিধা বাগানোর উদ্দেশ্যে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মতো, যে উত্তাপ ও আলো লাভের জন্য আগুন জ্বালায়। তবে তাদের ইসলাম গ্রহণ তাদের অন্তরে কোনো আলোকোজ্জ্বল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না; একইভাবে আল্লাহ তা‘আলা আগুনের নিছক উত্তাপদায়ক বৈশিষ্ট্যকে অবশিষ্ট রেখে আলো দানকারী বৈশিষ্ট্যকে সরিয়ে দেন। ফলে তারা পড়ে থাকে নিঃসীম অন্ধকারে, তারা হয়ে পড়ে অন্ধ–সত্য অবলোকনে অক্ষম। কপটদের অবস্থা ঐ ব্যক্তির মতোও বটে– যে প্রচণ্ড ঝড়-তুফানের মধ্যে পড়ে গিয়েছে; এখন সে বজ্রের বিদ্যুৎচমকে মৃত্যুর আশঙ্কা করছে এবং কর্ণবিদারী বজ্রপাতকে কোনোরকমে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে। আল্লাহর কালাম নাযিল হওয়ার পর আলোকিত প্রশান্তিময় জীবন লাভ করার পরিবর্তে কপট লোকেরা এর বজ্রগম্ভীর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা চালায়;

---

১ সূরা আল বাকারাহ (২): ১৭-২০।

কারণ তারা এটা ভেবে শঙ্কিত যে, সেসব আদেশ ও নিষেধাজ্ঞার সামনে আত্মসমর্পণের মানে হলো তাদের আত্মা ও অহঙ্কারের মৃত্যু ঘটা।

সত্য ও মিথ্যা সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত আয়াতে আগুন ও পানি সংক্রান্ত আরেকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে:

أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾

"আল্লাহ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেছেন এবং প্রত্যেক নদী-নালা নিজের পরিমাণ অনুযায়ী তা নিয়ে প্রবাহিত হয়। তারপর যখন প্লাবন আসে তখন ফেনা পানির ওপরে ভাসতে থাকে। আর লোকেরা অলংকার ও তৈজসপত্রাদি নির্মাণের জন্য যেসব ধাতু উত্তপ্ত করে তার ওপরও ঠিক এমনি ফেনা ভেসে ওঠে। এ উপমার সাহায্যে আল্লাহ হক ও বাতিলের বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেন। ফেনারাশি উড়ে যায় এবং যা মানুষের জন্য উপকারী তা যমীনেই থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ বিভিন্ন উপমা দিয়ে (নিজের কথা বুঝিয়ে) থাকেন।"[১]

অন্তরকে প্রাণশক্তি দেওয়ার জন্য যে ওহী নাযিল হয় তাকে আবারো সেই পানির সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয়ে পৃথিবীকে বিভিন্ন উদ্ভিদের মাধ্যমে সজীব করে দেয়। রূপক অর্থে মানুষেরা হলো বিভিন্ন আয়তনের উপত্যকা—যেখানে প্রবাহিত হয় ওহীর বন্যা। বস্তুজগতের বন্যা যেভাবে তার স্রোতের মাধ্যমে মাটির যাবতীয় ময়লা-আবর্জনা বের করে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে হিদায়াত ও জ্ঞান মানুষের অন্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সকল প্রকার কুপ্রবৃত্তিকে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেয়। তারপর অন্তরসমূহকে তুলনা করা হয়েছে স্বর্ণ, রৌপ্য, লোহা, দস্তা ইত্যাদির আকরের সাথে—যা আগুনের উত্তাপের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়। দূষিত বস্তুসমূহ আবর্জনা ও ফেনার আকারে উপরে ভেসে ওঠে, পরিশেষে সেগুলোকে তুলে ফেলে দেওয়া হয়; অবশিষ্ট থাকে কেবল বিশুদ্ধ ধাতু।

১ সূরা রা'দ (১৩): ১৭।

এভাবেই ঈমানদারদের অন্তরসমূহ যখন ওহীর আলো ও উত্তাপের সংস্পর্শে আসে, তখন খারাপ কামনা-বাসনাসগুলো দূরীভূত হয়ে আত্মা হয়ে ওঠে পরিশুদ্ধ।

উপরোক্ত দু'টি উদাহরণের উভয়টিতেই আগুন ও ওহী এবং পানি ও ওহীর মধ্যকার তুলনা অত্যন্ত স্পষ্ট। তুলনামূলক পদান্বয়ী অব্যয় 'মতো/ন্যায়'এবং 'তুলনা, নীতিগর্ভ উপমা, রূপকালঙ্কার' ইত্যাকার শব্দাবলী উল্লেখ করে দেওয়ার ফলে আয়াতের উদ্দেশ্য প্রকাশে কোনো অস্পষ্টতা থাকেনি।

২. মাসাল কামিন (গুপ্ত)

সাহিত্যের এ শৈলীতে তুলনার পরিভাষাসমূহ ব্যবহৃত হয়নি।[১] তবে এ ধরনের উপমায় ইসলামের আদর্শিক বিষয়াবলী এমনভাবে উপস্থাপিত হয় যা মানুষের সহজাত প্রকৃতির নিকট সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে; কারণ তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হয়ে থাকে অত্যন্ত গভীর ও হৃদয়গ্রাহী। উদাহরণস্বরূপ: প্রান্তিকধর্মী না হয়ে সকল ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের নির্দেশনা কুরআনের বহু আয়াতে দেওয়া হয়েছে। খরচ করার ব্যাপারে আল্লাহ সেসব লোকের প্রশংসা করেন:

وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

"যখন তারা ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না; বরং উভয় প্রান্তিকের মাঝামাঝি প্রতিষ্ঠিত থাকে।"[২]

আর সালাত প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা উপদেশ দিচ্ছেন:

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

"আর নিজের সালাত খুব বেশী উচ্চ কণ্ঠেও পড়বে না, বেশী ক্ষীণ কণ্ঠেও না; বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি পর্যায়ের কণ্ঠস্বর অবলম্বন করবে।"[৩]

১ আল ইতক্বান, খণ্ড ৪, পৃঃ ৪১।
২ সূরা আল ফুরক্বান (২৫): ৬৭।
৩ সূরা আল ইসরা (১৭): ১১০।

চমৎকার দ্যোতনার আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যাবে এই ধারণার মধ্যে যে, 'শোনা' কখনও 'দেখা'র মতো নয়। পাশ্চাত্য বিশ্বে প্রায়শ এ ব্যাপারটিকে অনেক সময়ই বাড়াবাড়ি পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। যেমন তারা বলে, 'দেখা মানে বিশ্বাস করা'। কিন্তু আমাদের জীবন এতো ঘটনাবহুল যে, সেখানে আমরা অনেক কিছু না দেখেই বিশ্বাস করি। যেমন চৌম্বক শক্তি, মন, বায়ু ইত্যাদি এবং এমন আরও অনেক কিছু যেগুলো আপাত দৃশ্যমান নয়। ফলে পাশ্চাত্যের এ বক্তব্যের বিশুদ্ধতা সব জায়গায় টেকে না। এ ক্ষেত্রে ইসলামী তত্ত্ব হলো, কোনো কিছু নিছক শোনার মাধ্যমে যে বিশ্বাস তৈরী হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী দৃঢ় বিশ্বাস তৈরী হয় সে বস্তুটিকে সরাসরি দেখলে। এ কারণে, আল্লাহ কীভাবে মৃতকে জীবন দান করেন তা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য নবী ইবরাহীম ﷺ যখন আল্লাহকে অনুরোধ করেছিলেন, তখন আল্লাহ বললেন:

قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ۖ

"তুমি কি বিশ্বাস করো না? ইবরাহীম জবাব দিলো–'বিশ্বাস তো করি, তবে এর দ্বারা আমার অন্তর আরও প্রশান্তি লাভ করবে'।"[১]

৩. মাসাল মুরসাল (শৈলীবিহীন)

এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষামূলক ছোট ছোট আয়াত, যার অনেকগুলোই প্রবাদে পরিণত হয়েছে। মাসাল কামিনের মতো এই মাসালেও দ্যোতনা কিংবা উপমার কোনোটিই নেই; তবে এখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তুলনা থাকতে পারে।[২] নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে এই ধরনের মাসালের স্পষ্ট ব্যবহার রয়েছে:

عَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ

"হতে পারে কোনো জিনিস তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।"[৩]

---

১ সূরা আল বাকারাহ (২): ২৬০।
২ আল ইতকান, খণ্ড ৪, পৃঃ ৪৩।
৩ সূরা আল বাকারাহ (২): ২১৬।

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ﴿٦٠﴾

"সদাচারের প্রতিদান সদাচার ছাড়া আর কি হতে পারে?"[১]

لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ

"পবিত্র ও অপবিত্র সমান নয়।"[২]

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ

"অনেক বারই দেখা গেছে, স্বল্প সংখ্যক লোকের দল আল্লাহর হুক্‌মে বিরাট দলের ওপর বিজয় লাভ করেছে।"[৩]

تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ؕ

"তুমি তাদের ঐক্যবন্ধ মনে করো; কিন্তু তাদের মন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন।"[৪]

কুরআনে ব্যবহৃত মাসালের উপকারিতা অনেক।[৫] এর মাধ্যমে স্পর্শাতীত বিষয়াবলীকে স্পর্শযোগ্য ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে লোকেরা তা সহজে অনুধাবন ও আত্মস্থ করে ধরে রাখতে পারে। যেসব তত্ত্ব অনুধাবন করা অত্যন্ত কঠিন, সেগুলো মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা কিংবা স্বাভাবিক কর্মধারার আলোকে উপস্থাপন করার ফলে তা হয়ে ওঠে দ্রুত ও সহজে অনুধাবনযোগ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ: যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কাউকে কোনো কিছু দান করে, সে আল্লাহর কাছে কোনো পুরস্কার লাভের যোগ্য নয়—এ তত্ত্বটি নিম্নোক্ত উপমার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে একটি স্পর্শযোগ্য ভঙ্গিতে:

فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا

---

১ সূরা আর রাহমান (৫৫): ৬০।
২ সূরা আল মায়িদাহ (৫): ১০০।
৩ সূরা আল বাকারাহ (২): ২৪৯।
৪ সূরা আল হাশর (৫৯): ১৪।
৫ দেখুন মাবাহিস ফী ''উলূমিল কুরআন, পৃঃ ২৯৭-৯।

"তার ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে—একটি মসৃণ পাথরখণ্ডের ওপর মাটির আস্তর জমেছিল; অতঃপর প্রবল বর্ষণের ফলে সমস্ত মাটি ধুয়ে গেলো, এখন সেখানে রয়ে গেলো শুধু পরিষ্কার পাথরখণ্ডটি। এই ধরনের লোকেরা দান-খয়রাত করে যে নেকী অর্জন করে বলে মনে করে, তার কিছুই তাদের হাতে আসে না।"[১]

মাঝেমধ্যে মাসাল ব্যবহার করা হয় লোকদেরকে কিছু সুনির্দিষ্ট ভালো কাজ সম্পাদনে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে; এখানে কাজটিকে এমন কিছুর সাথে তুলনা করা হয় যা মানুষের প্রকৃতিকে আকর্ষণ করে। এর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত আয়াতে:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ

"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে—যেমন একটি শস্যবীজ বপন করা হয় এবং তা থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়, যার প্রত্যেকটি শীষে থাকে একশতটি করে শস্যদানা। এভাবে আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন।"[২]

অনেক সময় উপমা ব্যবহার করা হয় কিছু খারাপ কাজকে নিরুৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে। সেক্ষেত্রে খারাপ কাজটিকে তুলনা করা হয় কিছু অরুচিকর বস্তুর সাথে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পরনিন্দা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ

"আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। এমন কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছে, যে তার নিজের মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খাওয়া পছন্দ করবে? বস্তুত, তা ভক্ষণ করতে তোমাদের ঘৃণা হয়।"[৩]

নিজ মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খাওয়ার কথা চিন্তা করা মাত্র আমাদের মন যেভাবে ঘৃণায় ভরে ওঠে, অপরের মানহানিকর কথা কিংবা পরনিন্দা শোনামাত্র আমাদের মধ্যে যেন ঠিক একই রকম অনুভূতি সৃষ্টি হয়ে যায়।

---

১ সূরা আল বাকারাহ (২): ২৬৪।
২ সূরা আল বাকারাহ (২): ২৬১।
৩ সূরা আল হুজুরাত (৪৯): ১২।

উত্তম আচরণের উদাহরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্রেণী বিশেষের প্রশংসা করা কিংবা কারো নৈতিক অধঃপতন তুলে ধরার জন্যও মাসাল ব্যবহৃত হতে পারে। সরাসরি আদেশ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের তুলনায় সাধারণত আলঙ্কারিক বক্তব্যের মাধ্যমে অধিকতর কার্যকর উপায়ে বার্তা পৌঁছে দেয়া যায়। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে প্রায়শ উপমা ও রূপকালঙ্কার ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

"এ কুরআনের মধ্যে আমি মানুষের জন্য নানা রকমের উপমা পেশ করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।"[১]

নবী ﷺ এর বক্তব্যেও অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যেখানে তিনি তাঁর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে উপমা ব্যবহার করেছেন।[২]

কসম (শপথ)—বাংলা ভাষার ন্যায় আরবি ভাষাতেও পাঠক বা শ্রোতার সামনে কোনো তত্ত্বের গুরুত্ব বা সত্যতা জোরালোভাবে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে কসম (শপথ) করা হয়। বাংলা ভাষায় 'আল্লাহর কসম' শব্দগুচ্ছটি জনসাধারণের মাঝে বহুল ব্যবহৃত; এর মাধ্যমে বুঝানো হয় যে, বক্তব্যটি ততোটাই নিশ্চিত 'যতোটা নিশ্চিতভাবে আমি আল্লাহতে বিশ্বাস করি'। তবে আরবি ভাষাতাত্ত্বিকরা ঐতিহ্যগতভাবে শপথের গঠনকে তিনটি মৌলিক অংশে বিভক্ত করেছেন:

১. ক্রিয়াপদ: 'আমি শপথ করছি';

২. ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনা—যার নামে শপথ নেয়া হয়; এবং

৩. ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনা—যার জন্য শপথ নেয়া হয়।[৩]

---

১ সূরা আয যুমার (৩৯): ২৭।

২ এগুলোর সংখ্যা এতো বেশী যে, এর কোনো একটি দিয়ে তালিকা শুরু করা বেশ কঠিন, তবে একটি ছোট্ট নমুনার জন্য সেসব লোকের উপমার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যারা আল্লাহর দেয়া সীমারেখা মেনে চলে আর যারা তা মেনে চলে না; হাদীসে তাদেরকে একটি জাহাজের উপর ও নীচের তলার লোকের সাথে তুলনা করা হয়েছে (সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৩, পৃঃ ৪০৬, নং ৬৭৩)। ঈমানদাররা এমন একটি ভবনের ন্যায় যার প্রতিটি ইটই একটি অপরটির পরিপূরক বা সহায়ক– এ সংক্রান্ত উপমা জানার জন্য আরো দেখুন সহীহুল বুখারী, খণ্ড ১. পৃঃ ২৭৮, নং ৪৬৮

৩ মাবাহিস ফী ''উলূমিল কুরআন, পৃঃ ৩০০।

'আমি শপথ করছি' (আক্‌সিমু) শব্দটিকে প্রায়শ কমিয়ে 'বি' ব্যবহার করা হয়, আবার কখনো 'বি' এর স্থলে 'তা', কিংবা 'ওয়া' ব্যবহার করা হয়। যে ব্যক্তি বা বস্তুর নামে শপথ নেয়া হয়, সেগুলোর আগে ঐসব শব্দ যোগ করে দেয়া হয়। তাই 'আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি'—বাক্যটিকে আরবিতে 'আকসিমু বিল্লাহ', 'বিল্লাহ', 'তাল্লাহ' কিংবা 'ওয়াল্লাহ' দ্বারা ব্যক্ত করার সুযোগ রয়েছে। কখনো কখনো ক্রিয়াপদ, অব্যয় ও যে ব্যক্তি বা বস্তুর নামে শপথ করা হয়—এ সবই মুছে দিয়ে কেবল ঐ ব্যক্তি বা বস্তুকে উল্লেখ করা হয় যার ব্যাপারে শপথ নেয়া হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তার পূর্বে গুরুত্ব নির্দেশক 'লা' অব্যয় ব্যবহার করা হয়। সবকিছু মুছে দিয়ে কেবল 'লা' অবশিষ্ট রেখে শপথ বাক্য উচ্চারণের একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত আয়াতে:

لَتُبْلَوُنَّ فِيٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ

"তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবনের ব্যাপারে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে।"[১]

অর্থ বিবেচনায় এ আয়াতটি আসলে এমন—'আল্লাহর শপথ, তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবনের ব্যাপারে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে।" কুরআনে বিপুল সংখ্যক শপথ বাক্য উচ্চারণ করা হয়েছে বিভিন্ন মাখলুকের নাম নিয়ে, যেমন:

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ﴿١﴾ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ﴿٢﴾

"শপথ সূর্যের ও তার কিরণের। শপথ চাঁদের যখন তা সূর্যের পেছনে পেছনে আসে।"[২]

তবে সাতটি স্থানে স্বয়ং আল্লাহর নামে শপথ বাক্য উচ্চারণ করা হয়েছে।[৩] তার মধ্যে তিনটি স্থানে আল্লাহ নবী ﷺ-কে আল্লাহর নামে শপথ নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন; এর একটি দৃষ্টান্ত হলো নিম্নোক্ত আয়াত:

---

১ সূরা আলে ইমরান (৩): ১৮৬।
২ সূরা আশ শামস (৯১): ১-২।
৩ আল ইতকান, খণ্ড ৪, পৃঃ ৪৬।

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۚ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ

"কাফিররা মনে করেছে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না। বলে দাও, আমার রবের শপথ, তোমাদেরকে অবশ্যই উঠানো হবে। তারপর (দুনিয়ায়) তোমরা যা কিছু করেছো সে ব্যাপারে অবশ্যই তোমাদেরকে অবহিত করা হবে।"[১]

অবশিষ্ট চারটি ক্ষেত্রে আল্লাহ নিজের নামেই শপথ বাক্য উচ্চারণ করেছেন, যার একটি দৃষ্টান্ত হলো নিম্নোক্ত আয়াত:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

"কিন্তু না, তোমার রবের কসম, এরা কখনো মু'মিন হতে পারে না যতক্ষণ এদের পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে এরা তোমাকে ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে না নেবে।"[২]

সবকিছুর একমাত্র স্রষ্টা হওয়ার কারণে আল্লাহ তাঁর ইচ্ছেমতো তাঁর যে কোনো মাখলুকের নামে শপথ করতে পারেন; তবে মানুষকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এর কারণ হলো, সেই সত্তা বা বস্তুর নামেই শপথ করা যায় যাকে শপথকারী ব্যক্তি প্রভু-প্রতিপালকের মতো সর্বোচ্চ সম্মানের স্থানে অধিষ্ঠিত করে রাখে; আর এভাবে একমাত্র আল্লাহকেই সম্মান দেখানো উচিত। তাই তারকারাজি, কারও পিতার কবর, কিংবা নবী ﷺ অথবা কা'বা– এসবের নামে শপথ নেয়া নিষিদ্ধ, যা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করার মতো ঘৃণ্য কাজ হিসেবে বিবেচ্য। 'উমার ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

من حلف بغير الله فقد اشرك

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করলো, সে আল্লাহর সাথে শির্ক করলো।"[৩]

---

১ সূরা আত তাগাবুন (৬৪): ৭।

২ সূরা আন নিসা (৪): ৬৫।

৩ এই হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম আবু দাউদ (সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ২, পৃঃ ৯২৩, নং ৩২৪৫) ও ইমাম তিরমিযী। নাছিরুদ্দীন আলবানী সহীহু সুনানি আবী দাউদ গ্রন্থে (খণ্ড ২, পৃঃ ৬২৭, নং ২৭৮৭)

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টির নামে শপথ উচ্চারণ করেন, কারণ এর সবকিছুই স্রষ্টা ও পালনকর্তা হিসেবে প্রকারান্তরে একমাত্র আল্লাহর দিকেই ইঙ্গিত করে।

কুরআনে যে বস্তু বা ঘটনার জন্য শপথ উচ্চারণ করা হয়, মাঝে-মধ্যে তাকেই অনুল্লেখ রাখা হয়। এটা সাধারণত করা হয় প্রসঙ্গ ও শপথের তাৎপর্যের স্পষ্টতার কারণে। দৃষ্টান্তস্বরূপ:

لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۝١ وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝٢

"আমি শপথ করছি কিয়ামতের দিনের। আমি শপথ করছি তিরস্কারকারী নফসের।"[১]

তার পরের আয়াত:

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ۝٣

"মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার হাড়সমূহ একত্রিত করতে পারবো না?"[২]

উপরের দু'টি শপথ এমন শ্রেণীর, যেখানে যার জন্য শপথ নেয়া হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়নি। আর তা হলো–'তোমাদেরকে পুনরুত্থিত ও বিচারের মুখোমুখি করা হবে'। আরবি ভাষা সাহিত্যে এভাবে শপথের উদ্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে অনুল্লিখিত রাখার কারণ হলো, বাক্যের প্রতিক্রিয়াকে নাটকীয়ভাবে বর্ধিত করে দেয়া। উদাহরণস্বরূপ, এটা অনেকটা বাংলা ভাষায় এভাবে সতর্ক করার মতো–'তোমার ঐ কাজ বন্ধ করা উচিত, নইলে...!'

জাদাল (বিতর্ক)

বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে কোনো কিছু বুঝার আগ্রহ মূলত মানব প্রকৃতিরই একটি অংশ। মানুষ সাধারণত যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হতে পছন্দ করে। এমনকি মানুষের সীমিত জ্ঞান যেসব বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয়ে অক্ষম, সেসব

এটিকে প্রামাণ্য আখ্যায়িত করেছেন।

১ সূরা আল ক্বিয়ামাহ (৭৫): ১-২।

২ সূরা আল ক্বিয়ামাহ (৭৫): ৩।

বিষয়েও যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তার রয়েছে অদম্য আগ্রহ। মানুষের এ প্রকৃতির দিকে পরোক্ষ ইঙ্গিত করে কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

"আর মানুষ বড়ই তর্কপ্রিয়।"[১]

ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ-কে মুশরিকদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার আদেশ দিয়েছেন; তবে তা হতে হবে ভদ্রোচিতভাবে, যাতে এর মাধ্যমে তাদের অন্তরসমূহ আন্দোলিত হয় এবং সত্যের দিকে আকৃষ্ট হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"(হে নবী!) প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা তুমি (মানুষকে) তোমার রবের পথের দিকে আহ্বান করো এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে।"[২]

সত্য উন্মোচনের উদ্দেশ্যে তিনি মুসলিমদেরকে ইহূদী-খ্রিস্টানদের সাথেও সংলাপের অনুমতি দিয়েছেন, যেমন:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"আর উত্তম পদ্ধতি ছাড়া আহ্‌লে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করো না।"[৩]

কুরআনের বক্তব্য যেহেতু মানুষকেই সম্বোধন করে, তাই বিষয়বস্তু উপস্থাপনার সময় মানুষের তর্কপ্রবণতার দিকটিকে সামনে রাখা এর জন্য অত্যন্ত স্বাভাবিক। এ কারণে সমগ্র কুরআন জুড়ে তর্কের (জাদাল) অসংখ্য উদাহরণ চোখে পড়বে। তবে কুরআনের যুক্তিসমূহ অত্যন্ত সরল ও সহজে বোধগম্য। কারণ এগুলোতে সবসময় অদৃশ্য বিষয়াদিকে প্রমাণ করার জন্য দৃশ্যমান বিষয়াবলীর উপর কোনো না কোনোভাবে নির্ভর করা হয়েছে। সমগ্র

---

১ সূরা আল কাহ্‌ফ (১৮): ৫৪। আয়াতটিকে এভাবেও অনুবাদ করা যেতে পারে, "তর্কপ্রবণ যে কোনো কিছুর চেয়ে মানবজাতি এক ধাপ এগিয়ে।"

২ সূরা আন নাহ্‌ল (১৬): ১২৫।

৩ সূরা আল আনকাবুত (২৯): ৪৬।

কুরআনে যে ধরনের যুক্তিপদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নে তার অল্প কয়েকটি তুলে ধরা হলো।

১. সকল সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান ঐকতান একজন মাত্র স্রষ্টার ইঙ্গিত বহন করে:

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ

"যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এক আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ থাকতো তাহলে উভয়টিই বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো।"[১]

দুই বা ততোধিক সত্যিকার স্রষ্টা থাকলে এ দুনিয়ায় কোনোরূপ শৃংখলা ও ঐকতান বজায় থাকতো না। কারণ তারা সৃষ্টি কিংবা নিয়ন্ত্রণের কোনো একটি দিক নিয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হলে বিশৃংখলা-বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে উঠতো–যতক্ষণ না তারা ঐকমত্যে উপনীত হতো কিংবা তাদের একজনের সিদ্ধান্তের সামনে অন্য সবাই মাথা নত করতো। ঐকমত্য পোষণ বা মাথা নত করা–উভয়টিই অক্ষমতা ও দুর্বলতার ইঙ্গিত বহন করে, যা কোনো সত্যিকার স্রষ্টার সিফাতে থাকতে পারে না। বস্তুত, দুর্বলতার এরূপ বর্ণনা মহাবিশ্বের স্রষ্টাকে মানবজাতির একটি বিষম ঝগড়াটে পরিবারের পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে আসে–যেরূপ কল্পনা গ্রীক, রোমান, হিন্দু ও মিশরীয় প্রভৃতি জাতি-গোষ্ঠী তাদের স্ব স্ব দেবতাদেরকে নিয়ে করেছে।

২. সৃষ্টির প্রক্রিয়া পুনরায় সৃষ্টির (পুনরুত্থান) সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে:

أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِىٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾

"মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি স্খলিত বীর্যরূপ (শুক্রাণু বা ডিম্বাণু) ছিল না?[২] **অতঃপর তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তার সুন্দর দেহ বানালেন এবং তার অংগ-প্রত্যংগগুলো সুঠাম**

---

১ সূরা আল আম্বিয়া (২১): ২২।

২ সাধারণত 'মানী' শব্দটির অনুবাদ করা হয় শুক্রাণু, তবে ডিম্বাণু অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

করলেন। তারপর তা থেকে নারী ও পুরুষ দু'রকম মানুষ বানালেন। তবুও কি তিনি মৃতদের পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন?"[১]

মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়া যে কত বিস্ময়কর; কীভাবে সে একটি বিন্দুবৎ তুচ্ছ উৎস থেকে ধীরে ধীরে সুগঠিত হয়ে ওঠে–যদি কেউ তা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ভেবে দেখে, তাহলে তার পক্ষে মানবজাতির পুনরায় সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের তত্ত্বকে অনুধাবন করা মোটেই কঠিন হবে না। কারণ, কোনো কিছুকে পুনরায় সৃষ্টি করার কাজটি প্রথমবার সৃষ্টি করার তুলনায় সহজতর; যেমনটি আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন:

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

"তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন, তারপর তিনিই পুনরায় একে সৃষ্টি করবেন এবং এটি তাঁর জন্য সহজতর।"[২]

কিস্সাহ (গল্প)

কোনো তথ্য গল্পাকারে শুনতে সবাই অধিক আগ্রহ বোধ করে। গল্প বর্ণনা যে মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ তৈরী করে–মানুষ সাধারণত তাতে একটু প্রশান্তি অনুভব করে। এর ফলে বিশ্বের সকল সমাজে গল্প ও গল্পকারদেরকে সবসময় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে বিশেষ সম্মানের আসনে। অনেক সময় গল্পের মাধ্যমে সামাজিক সমালোচনাকে সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ: চার্লস ডিকেন্স তার 'ডেভিড কপারফিল্ড' নামক উপন্যাসের মাধ্যমে ভিক্টোরিয়ান সমাজের শিশু শোষণকে আক্রমণ করেছেন। একইভাবে ১৯৮৪ সালে জর্জ ওরওয়েল আলোচনা করেছেন নাগরিকদের জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ নিয়ে। অতীতের বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতার গল্পসমূহ এখনও মানুষের মনে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করে। কারণ, সেগুলো অতীতের অনেক রহস্য মানুষের সামনে উন্মোচন করে দেয়। এ কারণে কৌতূহল উদ্দীপক ভঙ্গিতে মানবজাতির নিকট মূল বার্তা পৌঁছে

---

১ সূরা আল ক্বিয়ামাহ (৭৫): ৩৬-৪০।
২ সূরা আর রূম (৩০): ২৭।

দেয়ার লক্ষ্যে কুরআনে বেশ কয়েকটি স্থানে গল্প বর্ণনার (কিস্‌সাহ) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনের গল্পসমূহ নবী ﷺ ও তাঁর অনুসারীদেরকে এ মর্মে আশ্বস্ত করার কাজও আঞ্জাম দিয়েছে যে, পরিশেষে মিথ্যার উপর সত্যের বিজয় হবেই। একইভাবে এ গল্পসমূহ বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল ঈমানদারদের জন্যও একই উদ্দেশ্য সাধনের কাজ করে যাচ্ছে। তবে উল্লেখ্য যে, জনপ্রিয় উপন্যাসের অধিকাংশ গল্প তার লেখকের কাল্পনিক হলেও, কুরআনে বর্ণিত সব গল্পই নিখাদ সত্য। নিজ বাণীর প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা এসব গল্প নিজে থেকে বানিয়ে বলেননি; বরং এর সবই হচ্ছে ইতিহাসের কিছু অমোঘ সত্য উদাহরণ। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন– যিনি নিজেকে সত্যের মূর্ত প্রকাশ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾

"এটা এজন্য যে, আল্লাহই সত্য এবং তাঁকে বাদ দিয়ে এরা যাদেরকে ডাকে তারা সবাই মিথ্যা; আর আল্লাহই সর্বোচ্চ ও মহান।"[১]

আল্লাহ কুরআনকে সত্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ

"(হে মুহাম্মাদ!) তোমার প্রতি এ কিতাব সত্য সহকারে নাযিল করেছি।"[২]

وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ

"আমি তোমার কাছে যে কিতাব ওয়াহী করেছি তা সত্য, এর পূর্বে আগত কিতাবগুলোর সত্যায়নকারীও বটে।"[৩]

আল্লাহ তা'আলা সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, তাঁর বর্ণনা করা সকল গল্প সত্য। যেমন এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

---

১ সূরা আল হাজ্জ (২২): ৬২।
২ সূরা আল মায়িদাহ (৫): ৪৮।
৩ সূরা আল ফাতির (৩৫): ৩১।

نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَإِ مُوسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ

"আমি মূসা ও ফেরাউনের কিছু সত্য বৃত্তান্ত তোমাকে সঠিকভাবেই শোনাচ্ছি।"[১]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা এসব গল্পকে বানোয়াট হওয়ার সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়েছেন। যেমন ইউসুফ ﷺ ও তাঁর ভাইদের গল্পের শেষে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

"পূর্ববর্তী লোকদের এসব কাহিনির মধ্যে জ্ঞানী লোকদের জন্য রয়েছে শিক্ষা। এগুলো মোটেই বানোয়াট কথা নয়, বরং এগুলো পূর্বেকার কিতাবগুলোতে বর্ণিত সত্যের সমর্থন।"[২]

কুরআনে বর্ণিত গল্পসমূহকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম ভাগে রয়েছে: নবী-রাসূল সম্পর্কিত গল্পসমূহ। তাঁরা লোকদেরকে যেসব পদ্ধতিতে আল্লাহর দিকে ডাকতেন—এসব গল্পে আল্লাহ সেগুলোর বর্ণনা তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি বর্ণনা করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁদেরকে প্রদত্ত বিভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতা, তাঁদের প্রতি স্ব স্ব জাতির দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান এবং বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যকার সংগ্রামের শেষ ফলাফল। এ ধরনের গল্পের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে নূহ, ইবরাহীম, মূসা, হারুন ও 'ঈসা (আলাইহিমুস সালাম) এর ঘটনাবলীতে। দ্বিতীয় প্রকার গল্পে রয়েছে: নবী হিসেবে পরিচিত নয় এমন ব্যক্তিবর্গের ঘটনাবলী, যেমন: তালুত ও জালুত, আদম ﷺ এর দুই সন্তান, আসহাবে কাহ্ফ (গুহার অধিবাসী), যুলকারনাইন, কারুন, 'ঈসা ﷺ এর মা মারইয়াম প্রমুখ। তৃতীয় প্রকার গল্পে আলোচিত হয়েছে: সেসব ঘটনাবলী যা নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর যুগে সংঘটিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ: সূরা আলে ইমরানে বদর ও উহুদ যুদ্ধ, সূরা তাওবায় হুনাইন

---

১ সূরা আল ক্বাসাস (২৮): ৩।
২ সূরা ইউসুফ (১২): ১১১।

ও তাবুক যুদ্ধ, সূরা আহ্যাবে খন্দক যুদ্ধ ও সূরা বানী ইসরাঈলে রাত্রিকালীন ভ্রমণ (ইস্রা) ইত্যাদি।

কুরআনের কিছু কিছু গল্প বিভিন্ন সূরায় খণ্ড খণ্ড আকারে আলোচিত ও পুনরালোচিত হয়েছে। পুনরাবৃত্তি হলেও এর প্রতিটির ভাষাশৈলী ও উপস্থাপনারীতি ভিন্ন ভিন্ন। কোনো কোনো জায়গায় একটি গল্পের নিছক সারাংশ পেশ করা হয়েছে, আবার অন্যত্র তুলে ধরা হয়েছে সে গল্পের কোনো একটি অংশের বিস্তৃত বিবরণ। প্রকৃতপক্ষে, গল্পের বিবরণ ঠিক ততোটুকুই উল্লেখ করা হয়– মৌলিক বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য যতটুকু জরুরী। গল্পের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে এর শিক্ষাকে পাঠকের মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে দেয়া হয়। তবে মাঝেমধ্যে গল্পের বিভিন্ন দিকে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ধরনের পুনরাবৃত্তি কুরআনের অলৌকিক উৎসের বিষয়টিকেও সুপ্রমাণিত করে তোলে। কারণ, তাতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে একই তত্ত্বকে উপস্থাপন করা সত্ত্বেও তার প্রত্যেকটির অনন্যতা যেমন সংরক্ষিত, তেমনি আরবরা এর অনুলিপি তৈরী করার ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে।

১৫

কুরআনের ভাষাশৈলী

প্রত্যেক আইনেরই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য থাকে। ইসলামী আইন ও তার মূলনীতিগুলোও তার ব্যতিক্রম নয়। কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যেই এসব আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন রকম সামাজিক পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন রকমের আইন-কানুন প্রদান করা হয়েছে। কোনো কোনো আইন সমাজের সকল মানুষের এবং সর্বাবস্থায় পালন করার জন্য; আবার কোনো কোনো আইন সবার জন্য হলেও সবসময়ের জন্য নয়, বরং বিশেষ পরিস্থিতির জন্য; কখনো আবার বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর ও বিশেষ সময়ের জন্য, আবার কখনো বিশেষ শ্রেণী কর্তৃক সর্বাবস্থায় পালনের জন্য। এ কারণে, কুরআনে যে ভাষাশৈলী ব্যবহার করে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তার মধ্যেই বিভিন্ন পরিস্থিতির পার্থক্য স্পষ্টভাবে বিবৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়; যাতে কোনো সংশয় সৃষ্টি না হয় এবং সম্ভাব্য ভুল ব্যাখ্যা এড়িয়ে চলা সম্ভব হয়।

মানবজাতির নিকট কুরআনের বার্তা যে আরবি ভাষায় পৌঁছে দেয়া হয়েছে তাতে এমন কিছু শব্দ, শব্দগুচ্ছ ও ব্যাকরণগত গঠনশৈলী রয়েছে যা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন রকমের অর্থ বহন করে; আইনের বাঞ্ছিত উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার জন্য সেসব অর্থ অত্যন্ত জরুরী। এ অধ্যায়ে সেসব অভিব্যক্তির কয়েকটিকে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে, যাতে পাঠকদেরকে অভিব্যক্তির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে একটু সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া যায়।

আম (সাধারণ) ও খাস (সুনির্দিষ্ট)

'আম' হলো এমন এক শব্দ বা অভিব্যক্তি যা আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হলে সম্পূর্ণ সাধারণভাবে তার অন্তর্ভুক্ত সব কিছুকেই বুঝায়।[1] তবে রূপক অর্থে

১ একটি বিকল্প সংজ্ঞা হলো, '('আম মূলত) এমন এক শব্দ যা অনেক কিছুর উপর প্রযোজ্য – যার কোনো

ব্যবহৃত হলে আম শব্দের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট বস্তুকেও বুঝানো সম্ভব। পক্ষান্তরে 'খাস' ব্যবহৃত হয় নির্দিষ্ট সংখ্যক বস্তু বুঝানোর জন্য; উদাহরণস্বরূপ: কোনো ব্যক্তিকে দশজন গরীব মানুষকে খাবার খাওয়ানোর নির্দেশ দেয়া হলে, তা খাস হিসেবে পরিগণিত হবে।[১]

উল্লেখ্য, কিছু কিছু আম শব্দ অন্য কিছু আম শব্দের চেয়ে অধিক পরিমাণ বা সংখ্যাকে নিজ বলয়ে অন্তর্ভুক্ত করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ: 'মানবজাতি'র তুলনায় 'পুরুষজাতি' শব্দটি অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক লোককে বুঝায়; কারণ মানবজাতির মধ্যে পুরুষ জাতি অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে স্তন্যপায়ীর তুলনায় মানবজাতির পরিধি অনেক ছোট, আবার প্রাণী শব্দের পরিধির চেয়ে স্তন্যপায়ী শব্দের পরিধি অনেক ছোট, ইত্যাদি।[২] একটি আম শব্দকে আরেকটি অধিকতর সীমিত আম বা খাস শব্দ দ্বারা সীমাবদ্ধ করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'তাখসীস'; যে শব্দের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ করা হয় তার নাম বৃহত্তর শ্রেণীর মুখাস্‌সিস।[৩]

নিম্নোক্ত ছয়টি উদাহরণে সর্বাধিক ব্যবহৃত সাধারণ শব্দাবলী রয়েছে, যার ব্যবহার সমগ্র কুরআন জুড়েই দেখা যায়।[৪]

১. কুল্ল (সব, প্রত্যেক):

প্রসঙ্গের উপর ভিত্তি করে এ শব্দের অনুবাদ বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কুরআনে আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন বক্তব্যে এ শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখা যায়:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

"প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।"[৫]

সংখ্যাসীমা নেই এবং যা প্রযোজ্য বিষয়ের সবকিছুকেই নিজ বলয়ের অন্তর্ভুক্ত করে'। (প্রিন্সিপ্লস অব ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স, পৃঃ ১০৪)।

১ প্রিন্সিপ্লস অব ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স, পৃঃ ১০৪-৫।

২ দেখুন শারহুল কাওকাবিল মুনীর, খণ্ড ৩, পৃঃ ১০৫।

৩ দেখুন প্রিন্সিপ্লস অব ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স, পৃঃ ৪০৬।

৪ দেখুন আল ইতকান, খণ্ড ৩, পৃঃ ৪৩-৪।

৫ সূরা আলে ইমরান (৩): ১৮৫।

ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ

"আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা।"[১]

এ কারণে ইসলাম বাইবেলোক্ত 'মালকীসিদ্দীক' (Melchizedek)[২] কে মিথ্যা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছে—যার ব্যাপারে 'The Letters to the Hebrews' শিরোনামে কোনো এক অজ্ঞাতপরিচয় লেখক লিখেছেন যে, 'তার (মালকীসিদ্দিকের) কোনো মা-বাবা বা কোনো বংশ-তালিকা ছিল না। আল্লাহর পুত্রের ন্যায় তার জীবনের শুরুও ছিল না, শেষও ছিল না; তিনি চিরকালের ইমাম।'[৩]

২. আল (নির্দিষ্টতাসূচক; তবে এমন নয় যে, বিষয়টি পাঠকের নিকট পরিচিত):

সাধারণত 'আল' এর অনুবাদ 'টি' করা হলেও নির্দিষ্টতা বুঝানোর ক্ষেত্রে এর অনুবাদ হবে 'সকল' বা 'প্রত্যেক'। যেমন:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟

"আর আল্লাহ আল-বাই' (সকল ব্যবসা) কে হালাল করেছেন এবং আর রিবা (সকল সুদ)কে করেছেন হারাম।"[৪]

এ কারণে সব ধরনের ব্যবসাকে বৈধ বিবেচনা করা হয়, যতক্ষণ না অন্য কোনো নির্দেশ দ্বারা তাকে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا

"আস সারিক ও আস সারিকাহ (প্রত্যেক পুরুষ চোর ও নারী চোর)—উভয়ের হাত কেটে দাও।"[৫]

---

১ সূরা আয যুমার (৩৯): ৬২।
২ পয়দায়েশ ১৪: ১৮-২০।
৩ ইবরানী ৭:৩।
৪ সূরা আল বাকারাহ (২): ২৭৫।
৫ সূরা আল মায়িদাহ (৫): ৩৮।

উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী মুসলিম সমাজ ও বিশেষত তাদের শাসকদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত নির্দেশ পালনকারী বলে মেনে নেয়া যাবে না, যতক্ষণ না তারা ধনী-গরিব নির্বিশেষে প্রত্যেক পুরুষ ও নারী চোরের হাত কেটে দেয়।

৩. আন নাকিরাহ (নেতিবাচক বা নিষেধমূলক বাক্যে অনির্দিষ্টতাসূচক শব্দ):

আরবি কোনো অনির্দিষ্টতাসূচক শব্দের অনুবাদের পূর্বে 'জনৈক' বা 'একটি' ব্যবহার করা হয়। তবে নেতিবাচক বাক্যের ক্ষেত্রে অনির্দিষ্টতাসূচক শব্দকে এমনভাবে অনুবাদ করতে হবে যাতে তার সাধারণ অর্থের সবটুকুই তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ:

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

উপরোক্ত আয়াতের আক্ষরিক অনুবাদ হলো
"হাজ্জের সময়ে রাফাস (একটি যৌন সম্ভোগ), ফুসূক (একটি দুষ্কর্ম) ও জিদাল (একটি ঝগড়া-বিবাদ) করা যাবে না।"[১]

মূলত আয়াতটির সঠিক অনুবাদ হবে এরকম:
"হাজ্জের সময়ে কোনোরূপ স্ত্রী-সম্ভোগ, দুষ্কর্ম ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া যাবে না।"

অনুরূপভাবে:

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

উক্ত আয়াতের আক্ষরিক অনুবাদ হলো,
"তোমার রব একজনের (আহাদান) উপর যুলুম করবেন না।"[২]

উপরোক্ত আয়াতে 'একজনের' জায়গায় যথার্থ অনুবাদ হবে 'কারও'।

৪. আল্লাযী ও তা থেকে উৎসারিত শব্দাবলী (সম্বন্ধবাচক সর্বনাম):

যখন বাক্যের উদ্দেশ্যের স্থানে ব্যবহৃত হয়, তখন তার অনুবাদ হবে 'যে-ই'। এর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত আয়াতে, যেখানে পিতা-মাতার প্রতি দুর্ব্যবহারকারীদের নিন্দা করা হয়েছে:

---

১ সূরা আল বাকারাহ (২): ১৯৭।
২ সূরা আল কাহ্ফ (১৮): ৪৯।

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا

"আর যে-ই (আল্লাযী) তার পিতা-মাতাকে বলবে, 'তোমাদের উভয়ের প্রতি উফ'।"[১]

উক্ত আয়াতে 'যে-ই' শব্দটি সাধারণ অর্থবোধক (আম) যা এমন প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে তার পিতা-মাতার সাথে অসম্মানজনকভাবে কথা বলে।

৫. اسماؤ الشّرط আসমাউশ শার্ত (শর্তবাচক বাক্যাংশের শুরুতে ব্যবহৃত সংযোজক অব্যয়):

যে-ই (মান), যা-ই বা যা কিছু (মা), যেখানেই (আইনামা) ও যে-ই (আইয়ুমা) ইত্যাদি।

এসব শব্দের প্রত্যেকটিই কোনোকিছুকে অত্যন্ত সাধারণভাবে বুঝায়; উদাহরণস্বরূপ, সাফা ও মারওয়া পাহাড় সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তা'আলার বক্তব্য:

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا

"যে ব্যক্তিই (মান) বাইতুল্লাহর হাজ্জ বা উমরাহ করে তার জন্য ঐ দুই পাহাড়ের মাঝখানে সা'ঈ করায় কোনো পাপ নেই।"[২]

এ সংক্রান্ত আরো কিছু উদাহরণ পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে:

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ

"আর যা কিছু (মা) সৎকাজ তোমরা করবে– আল্লাহ তা জানেন।"[৩]

وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

---

১ সূরা আল আহকাফ (৪৬): ১৭।
২ সূরা আল বাকারাহ (২): ১৫৮।
৩ সূরা আল বাকারাহ (২): ১৯৭।

"এবং যেখানেই তোমরা থাকো না কেন সে (কা'বার) দিকেই মুখ করে নামায পড়ো।"[১]

৬. اسم الجنس ইসমুল জিন্‌স (নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক কোনো বিশেষ্য বা সর্বনামের সাথে সম্বন্ধ (মুদাফ) পদে ব্যবহৃত সাধারণ বিশেষ্য):

এ ধরনের সাধারণ অর্থবোধক বিশেষ্যের কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ

"তাঁর (রাসূলের) হুকুমের (আমরিহী) বিরুদ্ধাচরণকারীদের ভয় করা উচিত।"[২]

সাধারণ অর্থবোধক বিশেষ্য 'আমর'কে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম 'হি' এর সাথে জুড়ে দেয়ার মাধ্যমে শব্দটিকে ব্যাপক অর্থবোধক বানানো হয়েছে। এ সতর্কীকরণ জারী করা হয়েছে মূলত সেসব লোকদের উদ্দেশ্যে, যারা নবী ﷺ এর কোনো নির্দেশের বিরোধিতা করে। অনুরূপভাবে:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ

"আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের (আওলাদিকুম) ব্যাপারে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন।"[৩]

উপরোক্ত আয়াতে সকল সন্তানের জন্যই উত্তরাধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

আমকে খাস বা সুনির্দিষ্টকরণ

আয়াতের প্রসঙ্গ, উদ্দেশ্য বা মূলনীতির প্রেক্ষিত বিবেচনায় সাধারণ শব্দকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।[৪]

---

১ সূরা আল বাকারাহ (২): ১৫০।
২ সূরা আন নূর (২৪): ৬৩।
৩ সূরা আন নিসা (৪): ১১।
৪ দেখুন আল ইতকান, খণ্ড ৩, পৃঃ ৪৪-৫।

১. প্রথম প্রকারে রয়েছে: এমন কিছু সাধারণ শব্দ যা সবসময় সাধারণ অর্থ প্রকাশ করে। এ প্রকৃতির 'আম' এর খুব বেশী উদাহরণ নেই, কারণ অধিকাংশ সাধারণ অর্থবোধক শব্দ কোনো না কোনোভাবে বিশেষায়িত হয়ে থাকে। তবে, এর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত আয়াতে:

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

"আর আল্লাহ সকল (কুল্ল) বিষয়ে জ্ঞান রাখেন।"[১]

আল্লাহর জ্ঞান নিরংকুশ (তাই কোনো অবস্থাতেই এর উপর সীমাবদ্ধতার বিশেষত্ব আরোপ করে একে 'খাস' করা যায় না)। একই প্রকারের আরেকটি দৃষ্টান্ত রয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ

"তোমাদের মায়েদেরকে (উম্মাহাতুকুম) তোমাদের জন্য (বিয়ে করা) নিষিদ্ধ করা হয়েছে।"[২]

এ আইনের কোনো ব্যতিক্রম নেই; কারণ আপন মা, সৎ মা, শাশুড়ি কিংবা দুধ মা—এরা সবাই এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

২. দ্বিতীয় প্রকারে রয়েছে: সেসব রূপকাশ্রিত আম শব্দ, যার সাধারণ অর্থ কখনোই উদ্দিষ্ট ছিল না, যেমন:

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّ قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿١٧٣﴾

"যাদেরকে লোকজন (আন নাস) বলেছিল, 'তোমাদের বিরুদ্ধে লোকজন জড়ো হয়েছে, তাদেরকে ভয় করো'। এ বক্তব্য তাদের ঈমান আরো বাড়িয়ে দিল, আর তারা বললো, 'আল্লাহ-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক'।"[৩]

---

১ সূরা আন নিসা (৪): ১৭৬।
২ সূরা আন নিসা (৪): ২৩।
৩ সূরা আলে ইমরান (৩): ১৭৩।

উপরোক্ত আয়াতে প্রথম 'লোকজন' শব্দ দ্বারা নুয়াইম ইবনু মাস'উদকে, আর দ্বিতীয় 'লোকজন' শব্দ দ্বারা আবু সুফিয়ান ও কুরাইশী সেনাবাহিনীকে বুঝানো হয়েছে; এ শব্দ দ্বারা সব লোক বুঝানো উদ্দেশ্য নয়—যেমনটা শব্দের সাধারণ অর্থ থেকে বুঝা যায়।[১]

৩. **'আম এর তৃতীয় প্রকার হলো:** বিশেষায়িত 'আম, যার সাধারণ অর্থটি কোনো এক বিশেষায়নকারী শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, কুরআনে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য (কাবা) ঘরের হাজ্জ্ব সম্পাদন করা সকল লোকের (আন নাস) জন্য আবশ্যক, যারা সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে।"[২]

আয়াতের শেষাংশে উচ্চারিত বিশেষায়নকারী বাক্যাংশের মাধ্যমে 'সকল লোক' এর সাধারণ অর্থকে সীমিত করা হয়েছে। অর্থাৎ কেবল সেসব লোকের উপরই হাজ্জ্ব ফরয, যারা সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে।

তাখসীসের শব্দাবলী

তাখসীস বা সাধারণ অর্থবোধক শব্দকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার সম্পাদিত হয় বিশেষায়নকারী শব্দ বা শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে, যা সাধারণ বিবৃতির মধ্যে অথবা বাইরে কোথাও বিদ্যমান। সাধারণ বিবৃতির মধ্যে যে পাঁচ ধরনের তাখসীস পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ:[৩]

১. ইস্তিসনা (ব্যতিক্রম):

এ ক্ষেত্রে সাধারণ আইনটির পরে একটি ব্যতিক্রমসূচক পদান্বয়ী অব্যয় ও বিশেষায়নকারী একটি বাক্যাংশ বা শব্দগুচ্ছ থাকে। এর একটি উত্তম উদাহরণ রয়েছে নিচের আয়াতে:

---

১ আল ইতক্বান, খণ্ড ৩, পৃঃ ৪৫।
২ সূরা আলে ইমরান (৩): ৯৭।
৩ আল ইতক্বান, খণ্ড ৩, পৃঃ ৪৬-৭।

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ
يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ
فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟
عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

"যারা (আল্লাযীনা) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলবিদ্ধ করা হবে বা তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় তাদের জন্য এ অপমান ও লাঞ্ছনা নির্ধারিত রয়েছে আর আখেরাতে রয়েছে তাদের জন্য এর চাইতেও বড় শাস্তি। তবে যারা তোমাদের হাতে ধরা পড়ার পূর্বে তাওবা করে তাদের জন্য নয়। তোমাদের জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।"[১]

২. সিফাত (বিশেষণ):

এ ধরনের তাখসীস বলতে মূলত সেসব সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশকে বুঝানো হয় যার শুরুতে থাকে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম, যেমন আল্লাযী, আল্লাতী (যে, যা), ও এগুলো থেকে উৎসারিত শব্দসমূহ। এ ধরনের তাখসীসের একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে নিষিদ্ধ বিয়ের আলোচনা সংক্রান্ত নিম্নোক্ত আয়াতে:

وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ

"তোমাদের যেসব (আল্লাতী) স্ত্রীদের সাথে তোমরা সহবাস করেছ তাদের মেয়েদেরকে (রাবাইবুকুম) বিয়ে করা নিষিদ্ধ, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে মানুষ হয়েছে।"[২]

অর্থাৎ যে স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ঐ স্ত্রীর গর্ভে তার অন্য কোনো স্বামীর ঔরসে জন্ম নেওয়া সকল মেয়েদেরকে বিয়ে করা সবসময়ের জন্য নিষিদ্ধ। তবে যদি শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার আগেই তার সাথে বিচ্ছেদ হয়ে যায় কিংবা সে মারা যায়, তাহলে ঐ মহিলার গর্ভে

---

১ সূরা আল মায়িদাহ (৫): ৩৩-৩৪।

২ সূরা আন নিসা (৪): ২৩।

জন্ম নেওয়া মেয়েদেরকে সে বিয়ে করতে পারবে। সুতরাং 'যাদের সাথে তোমরা সহবাস করেছ' বাক্যাংশটি 'তোমাদের স্ত্রীদের সৎ কন্যা' শীর্ষক আম বক্তব্যকে খাস বা সীমিত করে দিয়েছে।

৩. শার্ত (শর্ত):

শর্তমূলক বাক্যও বিশেষায়নের কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে। কারণ এর মাধ্যমে একটি অবস্থার উপর আরেকটি অবস্থার নির্ভরতা প্রকাশ করা হয়। সাধারণত এসব বাক্যাংশের শুরুতে থাকে অধীনস্থতা জ্ঞাপক সংযোজক অব্যয়, যেমন 'ইন' (যদি); দৃষ্টান্তস্বরূপ:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

"তোমাদের কারোর (আহাদুকুম) মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে যদি (ইন) ধন-সম্পত্তি রেখে যায়, তাহলে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্য প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী ওসিয়্যাত করে যাওয়াকে তার জন্য ফরয করা হয়েছে; মুত্তাকীদের জন্য এটা একটা দায়িত্ব।"[১]

উপরোক্ত শর্তাংশের মাধ্যমে মৃত্যুকালে ওসিয়্যাতনামা লিখে যাওয়ার সাধারণ দায়িত্বকে সীমিত করে কেবল সম্পদশালী লোকদের জন্য তা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৪. গায়াহ (সময় নির্দেশক বাক্যাংশ):

সাধারণত সময় নির্দেশক ক্রিয়া বিশেষণের শুরুতে থাকে অধীনস্থতা জ্ঞাপক সংযোজক অব্যয় 'হাত্তা' (যতক্ষণ না), আর সাথে থাকে একটি নেতিবাচক শব্দ। হাজ্জের আনুষ্ঠানিকতা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বক্তব্যে এ ধরনের তাখসীসের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে:

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ

১ সূরা আল বাকারাহ (২): ১৮০।

"আর কুরবানীর পশু তার নিজের জায়গায় পৌঁছে না যাওয়া পর্যন্ত (হাত্তা) তোমরা নিজেদের মাথা মুণ্ডন করো না।"[১]

ঋতুবতী মহিলাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ

"তারা পাক-সাফ না হওয়া পর্যন্ত (হাত্তা) তাদের কাছে যেও না।"[২]

৫. بدل البعض من الكل (অংশবিশেষ দিয়ে পুরো বস্তুকে বুঝানো):

এটি এক বিশেষ ধরনের আরবি বাকরীতি যেখানে 'যে ব্যক্তি-ই' শীর্ষক সংযোজক অব্যয় দিয়ে শুরু হওয়া একটি সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশের মাধ্যমে কোনো বিশেষ্যের একটি বিশেষ দিকের বর্ণনা তুলে ধরা হয়। নিম্নোক্ত আয়াতের আক্ষরিক অনুবাদে এ ধরনের গঠনশৈলীর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ

"(কাবা) ঘরের হাজ্জ্ব সম্পাদন করা সকল লোকের (আন নাস) উপর আল্লাহর একটি অধিকার, যে ব্যক্তি-ই (মান) সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে।"[৩]

আরবি ভাষায় 'যে ব্যক্তি-ই' শীর্ষক সংযোজক অব্যয়টি 'সকল লোক' বা 'আন নাস' শব্দের একাংশের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তার স্থানে ব্যবহৃত হয়। এ দিক থেকে এ আয়াতের অনুবাদ হতে পারে এভাবে, "যে ব্যক্তি-ই (মান) কা'বা গৃহে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর আল্লাহর এ অধিকার রয়েছে যে, সে ঐ ঘরের হাজ্জ্ব করবে।"

---

১ সূরা আল বাকারাহ (২): ১৯৬।
২ সূরা আল বাকারাহ (২): ২২২।
৩ সূরা আলে ইমরান (৩): ৯৭।

বাইরের কোনো বিবৃতির মাধ্যমে আয়াতের তাখসীস

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাখসীসের আরেকটি প্রকার হলো বাইরের কোনো বিবৃতির মাধ্যমে তাখসীস। এ সংক্রান্ত বহুল ব্যবহৃত তাখসীস পদ্ধতিসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো।[১]

১. কুরআন:

কুরআনের একটি সাধারণ বক্তব্য অন্য আরেকটি আয়াতের মাধ্যমে সীমিত হয়ে যেতে পারে। এ ধরনের সীমিতকরণের একটি স্পষ্ট উদাহরণ রয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে:

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ

"আর তালাকপ্রাপ্তাদের (আল মুতাল্লাকাত) উচিত তিন ঋতুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা।"[২]

এ বক্তব্যে সব ধরনের তালাকপ্রাপ্তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে—চাই তারা গর্ভবতী হোক বা না হোক এবং তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হোক বা না হোক। তবে এ সাধারণ নির্দেশনাটি নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে সীমিত হয়ে পড়েছে:

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ

"গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দতের সীমা সন্তান প্রসব পর্যন্ত।"[৩]

এবং

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ

---

১ দেখুন আল ইতক্বান, খণ্ড ৩, পৃঃ ৪৭-৮।
২ সূরা আল বাকারাহ (২): ২২৮।
৩ সূরা আত তালাক (৬৫): ৪।

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মুমিন নারীদেরকে বিয়ে করো এবং তারপর তাদেরকে স্পর্শ করার আগে তালাক দিয়ে দাও তখন তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের জন্য কোনো ইদ্দত অপরিহার্য নয়, যা পালন করার দাবী তোমরা করতে পারো।"[1]

অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দতের সময় নয় মাস পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হতে পারে। পক্ষান্তরে শারীরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়নি এমন মহিলাদের ইদ্দত পালনের কোনো প্রয়োজনই নেই। সুতরাং প্রথম আয়াতটি এখন কেবল সুনির্দিষ্টভাবে সেসব মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য যারা গর্ভবতী নয় এবং যাদের সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

২. সুন্নাহ:

নবী ﷺ এর বক্তব্যের মাধ্যমেও কুরআনের সাধারণ বক্তব্য বিশেষায়িত হতে পারে। নবী ﷺ এর দায়িত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল কুরআনের বক্তব্যসমূহকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, পূর্বোক্ত একট সাধারণ অর্থজ্ঞাপক আয়াতে:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوٰا ۚ

"আর আল্লাহ সকল ব্যবসাকে বৈধ করেছেন এবং সকল প্রকার সুদকে অবৈধ করে দিয়েছেন।"[2]

ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেবল সঠিক পদ্ধতিসমূহের কথা বলা হয়েছে। সুন্নাহর কতগুলো বক্তব্যের মাধ্যমে কয়েক প্রকার ব্যবসাকে বাতিল করে সেগুলোকে নিষিদ্ধ শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। ইবনু 'উমার رضي الله عنه বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ 'পশুর বীর্য' ব্যবসাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন,[3] তাছাড়া তিনি 'ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে প্রাণীর গর্ভস্থ ভ্রূণ' বিক্রির উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।[4] এর ব্যাখ্যায় ইবনু 'উমার বলেন, প্রাক-ইসলামী যুগে লোকজন ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে গর্ভবতী প্রাণীর ভ্রূণ বিক্রি করে দিতো।

---

১ সূরা আল আহ্যাব (৩৩): ৪৯।
২ সূরা আল বাকারাহ (২): ২৭৫।
৩ সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৩, পৃঃ ২৬৭, নং ৪৮৪।
৪ এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম বুখারী (সহীহুল বুখারী, খণ্ড ৩, পৃঃ ১৯৯, নং ৩৫৩) ও ইমাম মুসলিম

কিছু কিছু ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে নবী ﷺ এর সাধারণ বক্তব্যের পরিধিকে সীমিত বা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ ধরনের তাখসীসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো, সাহাবী আবুল ওয়াকিদ লাইসী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস যেখানে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন,

ما قطع من بهيمة و هي حية فهو ميتة

"জীবিত প্রাণীর শরীর থেকে যা কিছু (মা) কেটে নেয়া হবে, তা-ই মৃত হিসেবে বিবেচ্য।"[১]

এ হাদীসের সাধারণ অর্থের দাবী হলো, মুসলিমদের জন্য জীবিত প্রাণীর দেহ থেকে আলাদা করে নেয়া পশম কিংবা চুলও অবৈধ। তবে আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত নিম্নোক্ত আয়াত নবী ﷺ এর উপরোক্ত বক্তব্যের সাধারণ পরিধিকে সীমিত করে দিয়েছে:

وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

"তিনি পশুর পশম, লোম ও চুল থেকে তোমাদের জন্য পরিধেয় ও ব্যবহার-সামগ্রীসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যা জীবনের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তোমাদের কাজে লাগবে।"[২]

মুতলাক (শর্তহীন) ও মুকাইয়্যাদ (শর্তসাপেক্ষ)

এ দু'টি তত্ত্বও অনেকটা 'আম ও খাস তত্ত্বের ন্যায়। তবে মৌলিক পার্থক্য হলো, আম শব্দ তার অর্থের মধ্যে শামিল প্রত্যেক সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে; পক্ষান্তরে মুতলাক শব্দ দ্বারা তার অর্থের যে কাউকে বুঝায়, কিন্তু সবাইকে একসাথে অন্তর্ভুক্ত করে না।[৩] উদাহরণস্বরূপ: যদি আমি কোনো ভৃত্যকে

(সহীহু মুসলিম, খণ্ড ৩, পৃঃ ৭৯৮, নং ৩৬১৫)।

১ এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম আবু দাউদ (সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ২, পৃঃ ৮০৩, নং ২৮৫২), ইবনু মাজাহ ও দারিমী। নাছিরুদ্দীন আলবানী সহীহু সুনানি আবী দাউদ গ্রন্থে (খণ্ড ২, পৃঃ ৫৫২, নং ২৪৮৫) এটিকে প্রামাণ্য আখ্যায়িত করেছেন।

২ সূরা আন নাহ্‌ল (১৬): ৮০।

৩ দেখুন প্রিন্সিপ্‌লস অব ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স, পৃঃ ১১৩। উপরের আলোচনাটির ভিত্তি হলো ইবনু কুদামাহ ও আমিদীসহ অসংখ্য উসূলবিদদের দেয়া মুতলাকের সংজ্ঞা। সুবকীসহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ অবশ্য তাদের উক্ত সংজ্ঞার সমালোচনা করেছেন। দেখুন কাশফুল আসরার, খণ্ড ২, পৃঃ ৫২০।

বলি, "মেট্রিক পাশ যে ছাত্র এ ঘরে আছে তাদের প্রত্যেককে দশ টাকা করে দাও", তাহলে এ বর্ণনাটি 'আম। যারা এ শর্ত পূরণ করবে তাদের প্রত্যেককে দশ টাকা করে না দিলে, ভৃত্য আমার নির্দেশ পালন করেছে বলে মেনে নেওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে আমি যদি তাকে বলি, "একজন মিসকীন ব্যক্তিকে দশ টাকা দাও"[১] তাহলে এটি একটি 'মুতলাক' বর্ণনা। কোনো একজন গরীব মানুষকে দশ টাকা দিয়ে দিলে, সে নির্দেশের আনুগত্য করেছে বলে ধরে নেওয়া যাবে।

'মুতলাক' এর সংজ্ঞায় বলা যেতে পারে, তা হলো এমন এক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যেখানে কোনো সীমাবদ্ধতা আরোপ ব্যতিরেকেই একটি বাস্তব ধারণা মূর্ত হয়ে ওঠে। এর মাধ্যমে মূলত ইতিবাচক বাক্যে অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক বিশেষ্য (নাকিরাহ) ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো বস্তুকে অনির্দিষ্টভাবে বুঝানো হয়ে থাকে। 'ভৃত্য', 'চেয়ার' কিংবা 'পুরুষ' ইত্যাদি শব্দ মুতলাক; পক্ষান্তরে 'ঈমানদার ভৃত্য', 'ধাতব চেয়ার' কিংবা 'ফিলিপাইনী পুরুষ'– এসব শব্দ 'মুকাইয়্যাদ' হিসেবে পরিগণিত। কারণ এখানে বিশেষণ (সিফাত) ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যেকটি অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক বিশেষ্যকে সীমিত করা হয়েছে।

আল্লাহ কুরআনে বলেন যে, আল্লাহর নাম নিয়ে শপথ নিয়ে তা ভঙ্গা করার কাফ্ফারা হলো:

إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

"দশজন মিসকিনকে এমন মধ্যম পর্যায়ের আহার দান করো, যা তোমরা নিজেদের পরিবারকে খেতে দাও, অথবা তাদেরকে কাপড়-চোপড় দান বা একটি গোলামকে মুক্ত করে দেয়া।"[২]

কোন ধরনের গোলাম মুক্ত করতে হবে–এ নিয়ে আয়াতে কোনো সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়নি। তবে নিম্নোক্ত আয়াতে গোলামের ধরনের উপর বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়েছে:

---

১ বাংলা ভাষাভাষী কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, এ বাক্যেও এক ধরনের সীমিতকরণ করা হয়েছে, কারণ 'গরীব' একটি বিশেষণ – যা 'ব্যক্তি' শীর্ষক বিশেষ্যের পরিধিকে সীমিত করে দিচ্ছে। তবে (এর জবাবে বলা যেতে পারে), আমাদের ভাষায় 'গরীব ব্যক্তি' দু'টি পৃথক শব্দ হলেও তার জন্য আরবি ভাষায় মূলত একটি একক শব্দ রয়েছে, তা হলো 'মিসকীন'।

২ সূরা আল মায়িদাহ (৫): ৮৯।

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ

"আর যে ব্যক্তি ভুলবশত কোনো মুমিনকে হত্যা করে তার কাফ্ফারা হিসেবে একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করে দিতে হবে এবং নিহত ব্যক্তির পরিবারকে রক্তমূল্য দিতে হবে।"[১]

উসূলুল ফিক্হ বিশেষজ্ঞগণ যেসব বিষয় নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন তার অন্যতম হলো, কুরআন বা সুন্নাহর কোনো পাঠ থেকে একটি 'মুকাইয়্যাদ' বর্ণনাকে নিয়ে গিয়ে অন্য কোনো পাঠের 'মুতলাক' বর্ণনার উপর প্রয়োগ করার বৈধতা প্রসঙ্গ। কয়েকটি ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কয়েকটি ক্ষেত্রে এর অবৈধতার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মতৈক্য রয়েছে, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ নিয়ে মতপার্থক্যও রয়েছে। বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার লক্ষ্যে, ওহী নাজিলের নেপথ্য কারণ এবং বিধানসমূহের সাথে সে কারণের ঐক্য কিংবা অনৈক্য বিবেচনায় মুতলাক ও মুকাইয়্যাদ আয়াতসমূহকে চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে:

১. অভিন্ন কারণ (ছাবাব) ও বিধান (হুক্ম:)

এর একটি দৃষ্টান্ত হলো, আল্লাহর নামে নেওয়া শপথ ভঙ্গের চতুর্থ কাফ্ফারা; অর্থাৎ তিন দিন রোযা রাখা। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত এই মূলনীতিটি মুতলাক:

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ

"আর যে ব্যক্তি এর সামর্থ্য রাখে না, সে যেন তিন দিন রোযা রাখে। এ হচ্ছে তোমাদের কসমের কাফ্ফারা যখন তোমরা ভঙ্গ করো।"[২]

তবে ইবনু মাস'ঊদের তিলাওয়াত অনুযায়ী উপরোক্ত বিধানটি মুকাইয়্যাদ:

فصيام ثلاثة ايام متتابعات

১ সূরা আন নিসা (৪): ৯২।
২ সূরা আল মায়িদাহ (৫): ৮৯।

"সে যেন পরপর তিন দিন রোযা রাখে।"

কতিপয় বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্ত হলো, যেহেতু উভয় তিলাওয়াতে কারণ (আল্লাহর নামে নেয়া শপথ ভঙ্গা করা) ও বিধান (রোযা রাখা) দু'টিই অভিন্ন, সেহেতু মুতলাক বিধানটিকে মুকাইয়্যাদ তিলাওয়াতের আলোকে বুঝতে হবে। অনুরূপ পরিস্থিতিতে মুতলাক পাঠের উপর মুকাইয়্যাদ পাঠ প্রয়োগের বৈধতা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সাধারণ মতৈক্য রয়েছে; তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো, উভয় পাঠ প্রামাণ্য হতে হবে।

অনুরূপ আরেকটি উদাহরণ—যেখানে মুতলাক পাঠের উপর মুকাইয়্যাদ পাঠ প্রয়োগের বৈধতা নিয়ে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতৈক্য রয়েছে– তা হলো রক্ত পান সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা। কুরআনের বেশ কয়েক জায়গায় মুতলাক বর্ণনার মাধ্যমে রক্ত পানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ

"তিনি তোমাদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করে দিয়েছেন মৃত প্রাণী ও রক্ত।"[১]

তবে সূরা আল আন'আমের ১৪৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন:

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا

"(হে মুহাম্মাদ!) এদেরকে বলে দাও, 'যে ওহী আমার কাছে এসেছে তার মধ্যে তো আমি এমন কিছু পাই না যা খাওয়া কারো ওপর হারাম হতে পারে, তবে মৃত প্রাণী ও বহমান রক্ত ছাড়া'।"

উপরোক্ত মুতলাক ও মুকাইয়্যাদ উভয় আয়াতেই যেহেতু নিষিদ্ধ খাদ্যের আলোচনা করা হয়েছে; তাই এ কথা সঠিক যে, সকল প্রকার রক্ত নয় বরং বহমান রক্তই কেবল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং রান্না করার সময় গোশ্‌ত থেকে যে রক্ত চুইয়ে পড়ে তা হারাম নয়।[২]

---

১ সূরা আল বাকারাহ (২): ১৭৩।

২ দেখুন কাশফুল আসরার, খণ্ড ২, পৃঃ ৫২৭।

২. অভিন্ন কারণ, তবে ভিন্ন হুকুম:

এ প্রকৃতির একটি উদাহরণ হলো ওযু ও তায়াম্মুম[১] করার সময় হাত[২] ধৌত করার বিধান, পবিত্রতা সংক্রান্ত নিম্নোক্ত আয়াতে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য তৈরী হও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত দু'টি কনুই পর্যন্ত ধুয়ে ফেলো।"[৩]

ওজু করার ক্ষেত্রে 'হাত' শব্দটি 'মুকাইয়্যাদ'; পক্ষান্তরে একই আয়াতে তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে এ শব্দটিকে 'মুতলাক' রেখে দেয়া হয়েছে:[৪]

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ

"পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নাও; তা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতসমূহ মাসাহ করে নাও।"[৫]

এসব উদাহরণের উভয়টিতে কারণ অভিন্ন; তবে হুকুমটি ভিন্ন রকমের। কারণ ওযুর ক্ষেত্রে পানি ব্যবহার করে অধিক অঙ্গা-প্রত্যঙ্গা ধৌত করতে হয়, পক্ষান্তরে তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে কেবল মুখমণ্ডল ও হাতের উপর ধুলা ব্যবহার করা হয়। এ কারণে মুতলাককে এক্ষেত্রে মুকাইয়্যাদের আলোকে ব্যাখ্যা না করা উচিত। বস্তুত, তায়াম্মুম সংক্রান্ত প্রামাণ্য হাদীসগুলোতে কব্জিকে শেষ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। সাহাবী আম্মার ইবনু ইয়াসীর ﵁ বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ তাকে দু'হাত মাটিতে একবার আঘাত করে তাতে ফুঁ দিয়ে

---

১ পানির অনুপস্থিতিতে ধুলা বা পবিত্র মাটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন।

২ আরবি ইয়াদ (হাত) শব্দটি দ্বারা হাতের তালু থেকে কবজি পর্যন্ত, কিংবা কনুই পর্যন্ত অথবা কাঁধ পর্যন্ত বুঝানো যেতে পারে।

৩ সূরা আল মায়িদাহ (৫): ৬।

৪ কেউ হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, এ আয়াতটিকে 'মুখাসসাস' মনে না করে 'মুকাইয়্যাদ' মনে করার কারণ কী? এটি কি সঠিক নয় যে, আরবি বাকরীতিতে সাধারণ অর্থ ব্যক্ত করার জন্য অন্যতম পদ্ধতি হলো সম্বন্ধবাচক সর্বনামের সাথে সাধারণ বিশেষ্যের ব্যবহার? তবে (উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলা যেতে পারে), মনে রাখতে হবে যে, 'আম' এর অন্যতম শর্ত হলো তা অসংখ্য বস্তুর উপর প্রযোজ্য – যার কোনো সংখ্যাগত সীমাবদ্ধতা নেই। (পক্ষান্তরে) প্রত্যেক মানুষের রয়েছে দু'টি হাত – যা সংখ্যার দিক দিয়ে সীমাবদ্ধ।

৫ সূরা আল মায়িদাহ (৫): ৬।

তার মুখমণ্ডল, দু' হাত (বা হাত দিয়ে ডান হাত) কব্জি পর্যন্ত মুছে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন।[১]

৩. সাবাব ভিন্ন, তবে হুক্ম অভিন্ন:

এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো গোলাম মুক্ত করার কাফ্ফারা। ভুলক্রমে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যে গোলাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা মুকাইয়্যাদ:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

"কোনো মুমিনের পক্ষে শোভনীয় নয় অন্য মুমিনকে হত্যা করা, তবে ভুলবশত হলে তা ভিন্ন কথা। আর যে ব্যক্তি ভুলবশত কোনো মুমিনকে হত্যা করে তার কাফ্ফারা হিসেবে একজন মুমিন গোলামকে মুক্ত করে দিতে হবে এবং নিহত ব্যক্তির পরিবারকে রক্তমূল্য দিতে হবে।"[২]

তবে যিহারের[৩] ক্ষেত্রে শব্দটি মুতলাক:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۚ

"যারা নিজের স্ত্রীর সাথে 'যিহার' করে বসে এবং তারপর নিজের বলা সে কথা প্রত্যাহার করে, এমতাবস্থায় তারা পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি ক্রীতদাসকে মুক্ত করতে হবে।"[৪]

এখানে মুতলাককে মুকাইয়্যাদের আলোকে ব্যাখ্যা করার স্পষ্টতই কোনো ভিত্তি নেই। প্রথম ক্ষেত্রে যেহেতু একজন ঈমানদারের প্রাণ হরণের বিষয়টি

---

১ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী (সহীহুল বুখারী, খণ্ড ১, পৃঃ ২০৮-৯, নং ৩৪৩) ও মুসলিম (সহীহু মুসলিম, খণ্ড ১, পৃঃ ২০২, নং ৭১৬-৮)।

২ সূরা আন নিসা (৪): ৯২।

৩ তালাকের প্রায় কাছাকাছি একটি প্রথা যা প্রাক-ইসলামী যুগের আরবরা চর্চা করতো। তাতে স্বামী তার স্ত্রীকে স্পর্শ না করার শপথ করতো, কারণ তার বিবেচনায় তার স্ত্রী তার মায়ের মতো। (এ ক্ষেত্রে) স্ত্রীর অন্য কোনো স্বামী খুঁজে নেয়ার স্বাধীনতা ছিল না, অথচ তাকে দাম্পত্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হতো।

৪ সূরা আল মুজাদালাহ (৫৮): ৩।

জড়িত, তাই সেখানে একজন ঈমানদার গোলামকেই মুক্ত করার শর্ত আরোপ করা হয়েছে; পক্ষান্তরে যিহার বা অন্য কোনো উপায়ে কৃত শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারার ক্ষেত্রে যে কোনো গোলাম মুক্ত করে দেয়াই যথেষ্ট।

৪. কারণ ও বিধান উভয়টি ভিন্ন প্রকৃতির:

এ প্রকারের একটি দৃষ্টান্ত হলো, ওযুর বিধান ও চুরির শাস্তিতে উল্লিখিত 'হাত' শব্দ। ওযু সংক্রান্ত আয়াতে 'কনুই পর্যন্ত' শব্দ দ্বারা হাত শব্দটিকে 'মুকাইয়্যাদ' বানানো হয়েছে; কিন্তু চুরির শাস্তির ক্ষেত্রে এটিকে 'মুতলাক' রেখে দেয়া হয়েছে। নিচের আয়াতটি খেয়াল করুন:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا

"পুরুষ চোর ও নারী চোর–উভয়ের হাত কেটে দাও।"[১]

এখানেও 'মুতলাক'কে 'মুকাইয়্যাদ' দ্বারা সীমাবদ্ধ করার কোনো অবকাশ নেই; বিশেষত এ বর্ণনার কারণে যে, নবী ﷺ হাত কাটার শাস্তির ক্ষেত্রে হাতকে কব্জি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন; খোলাফায়ে রাশেদীনগণও একই কাজ করেছেন।[২]

মানতূক (প্রকাশ্য) ও মাফহুম (অন্তর্নিহিত) অর্থ

বিভিন্ন শব্দ ও অভিব্যক্তি থেকে অনেক সময় বিভিন্ন অর্থ বেরিয়ে আসে। কখনো তা হয় প্রকাশ্য গঠনশৈলীর কারণে, আবার কখনো তা হয় ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে। শব্দের প্রকাশ্য দিক থেকে যে সাধারণ অর্থ বেরিয়ে আসে তাকে বলা হয় 'মানতুক', অন্যদিকে ইশারা-ইঙ্গিতে যে অর্থ বুঝা যায় তাকে বলা হয় 'মাফহুম'।

আরবি ব্যাকরণগত গঠনশৈলীর উপর নির্ভর করে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে কোনো শব্দ থেকে তার 'মানতূক' (প্রকাশ্য) অর্থ বের করে আনা যেতে পারে।

---

১ সূরা আল মায়িদাহ (৫): ৩৮।

২ দেখুন কাশফুল আসরার, খণ্ড ২, পৃঃ ৫২১-৭।

১. নাস (প্রকাশ্য পাঠ):

'মানতূক' বা প্রকাশ্য অর্থ বের করে আনার এ পদ্ধতি বলতে মূলত এমন শব্দকে বুঝায়, যা সুস্পষ্টভাবে একটি মাত্র ধারণার ইঙ্গিত প্রদান করে এবং অন্য কোনো ব্যাখ্যার অবকাশই রাখে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ: নিম্নোক্ত আয়াতে সেসব লোকের প্রতি একটি নির্দেশ জারী করা হয়েছে, যারা তামাত্তু হাজ্জ করতে ইচ্ছুক অথচ তারা পশু জবাই করতে অক্ষম:

فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

"(আর যদি কুরবানীর যোগাড় না হয়) তাহলে সে যেন হাজ্জের সময়েই তিনটি রোযা এবং (ঘরে) ফিরে গিয়ে সাতটি রোযা, এভাবে পুরো (কামিলাহ) দশটি রোযা রাখে।"[১]

উপরোক্ত আয়াতে দশটি রোযার পূর্বে ব্যবহৃত 'পুরো' বিশেষণটি এ সংক্রান্ত যে কোনো সংশয়কে দূরীভূত করে দেয় যে, দশ দ্বারা সম্ভবত রূপকার্থে দশের কাছাকাছি সংখ্যক দিনকে বুঝানো হয়েছে।

২. যাহির (সুস্পষ্ট অর্থ):

এ পরিভাষাটি দ্বারা কোনো শব্দের সর্বাধিক সম্ভাব্য ও সুস্পষ্ট অর্থকে বুঝানো হয়; যদিও ঐ শব্দটি দ্বারা অন্য অর্থ নেওয়ার সুযোগ থাকে। নিষিদ্ধ গোশ্ত ভক্ষণ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত আয়াতে যাহির এর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ

"তবে যে ব্যক্তি অক্ষম; কিন্তু অবাধ্য (বা-গিন) ও সীমালংঘনকারী নয় (কেবল বাধ্য হয়ে এর থেকে কোনোটা খায়), সেজন্য তার কোনো গোনাহ হবে না।"[২]

'বা-গিন' শব্দের আরেকটি অর্থ হতে পারে 'অজ্ঞ'; তবে এ আয়াতের প্রেক্ষিতে 'স্বপ্রণোদিত অবাধ্য' অর্থটি অধিকতর প্রাসঙ্গিক। এ সংক্রান্ত আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো ঋতুবতী মহিলাদের সাথে সহবাস বিষয়ক নিম্নোক্ত আয়াত:

---

১ সূরা আল বাকারাহ (২): ১৯৬।
২ সূরা আল বাকারাহ (২): ১৭৩।

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ

"পরিপূর্ণ পাক-সাফ হওয়ার (ইয়াতহুরনা) আগ পর্যন্ত তাদের কাছে যেও না।"[১]

'ইয়াতহুরনা' শব্দের অর্থ হতে পারে ঋতুচক্রের সমাপ্তি, ওযু[২] করা, কিংবা গোসল[৩] করা। তবে উক্ত আয়াতে অন্যান্য অর্থের সম্ভাব্যতার তুলনায় 'গোসল করা' অর্থের সম্ভাবনা অনেক বেশী।

৩. মুআওয়াল (ব্যাখ্যাকৃত):

এ ক্ষেত্রে অনুপযোগিতার কারণে কোনো শব্দের সুস্পষ্ট অর্থকে পরিহার করে কম স্পষ্ট অর্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়। কারণ, এখানে এমন কিছু বিষয় থাকে যা ঐ সুস্পষ্ট অর্থকে অনুমোদন করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ: পিতা-মাতাদের সাথে উত্তম আচরণ করার ব্যাপারে আল্লাহ আমাদেরকে নিম্নোক্ত নির্দেশ দিচ্ছেন:

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

"আর দয়া ও কোমলতা সহকারে তাদের সামনে নম্রতার ডানা (জানাহ) বিছিয়ে দাও।"[৪]

মানুষের ডানা থাকা অসম্ভব হওয়ার কারণে 'নম্রতার ডানা' শব্দগুচ্ছটির অর্থ করা হয়েছে পিতা-মাতার আনুগত্য ও তাদের সাথে ভালো আচরণ।

আরেকটি দৃষ্টান্ত রয়েছে সূরা আল মায়িদা'র ৬ নং আয়াতে:

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেলো।"

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী সালাতের জন্য দাঁড়ানোর পরে ওযু করা বাধ্যতামূলক। ইকামাত ঘোষিত হবার পরে নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীরা ওযু

১ সূরা আল বাকারাহ (২): ২২২।
২ মুখমণ্ডল, হাত ও পা ধৌত করা এবং মাথার চুলে ভেজা হাতের স্পর্শ লাগানো।
৩ সারা শরীর ধৌত করা।
৪ সূরা বনী ইসরাঈল (১৭): ২৪।

করেছেন মর্মে কোনো তথ্য না থাকার কারণে বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে একমত যে, এ আয়াতের উদ্দিষ্ট অর্থ হলো—কোনো ব্যক্তি সালাত আদায়ের ইচ্ছা পোষণ করলেই তার জন্য ওযু করা বাধ্যতামূলক এবং তাও আবার যদি তার আগের ওযু কোনো কারণে ভঙ্গ হয়ে থাকে। দ্বিতীয় বিষয়টিতে অবশ্য যাহিরী মাযহাবের আপত্তি রয়েছে—যারা কুরআনের আয়াতের আক্ষরিক অর্থের অনুসরণ করে থাকে। সুলাইমান ইবনু বুরাইদাহ বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ যাহিরীদের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। ইবনু বুরাইদা'র হাদীসে বলা হয়েছে, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন একই ওযুতে সকল সালাত আদায় করেছিলেন। এ ব্যাপারে 'উমার رضي الله عنه নবী ﷺ-কে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো ইতোপূর্বে কখনো আপনাকে এমনটি করতে দেখিনি, আজ এমন করার কারণ কী?" এর জবাবে নবী ﷺ তাঁকে বললেন,

عمدا صنعته يا عمر

"উমার, আমি ইচ্ছা করেই এমন করেছি।"[১]

৪. ইকতিযা (প্রয়োজন):

কখনো কখনো একটি আরবি শব্দের সঠিক অর্থ নির্ভর করে মুছে দেওয়া কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ অনুমান করে নেওয়ার উপর। আর এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে মানতূক অর্থকে বের করে আনার নাম হলো 'দালালাতুল ইকতিযা' অর্থাৎ পরিস্থিতির চাহিদার ভিত্তিতে অর্থ প্রকাশ।[২] রোযা সংক্রান্ত নিম্নোক্ত আয়াতে এর একটি চিরায়ত উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

"যদি তোমাদের কেউ রোগগ্রস্ত অথবা মুসাফির হয়ে থাকে তাহলে সে যেন অন্য দিনগুলোয় (রোযার) এই সংখ্যা পূর্ণ করে নেয়।"[৩]

'মুসাফির' শব্দের পরে 'ফা আফত্বারা' (এবং রোযা ভেঙ্গে ফেলে) শব্দগুচ্ছ ধরে নিতে হবে, কারণ একজন মুসাফিরকে কেবল তখনই রোযা কাযা

---

১ সহীহু মুসলিম, খণ্ড ১, পৃঃ ১৬৫-৬, নং ৫৪০।

২ দেখুন প্রিন্সিপলস অব ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স, পৃঃ ১২৮-৩০।

৩ সূরা আল বাকারাহ (২): ১৮৪।

করতে হবে যখন সে সফর অবস্থায় রোযা ভেঙ্গে ফেলে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি রুগ্ন হওয়া সত্ত্বেও রোযা না ভাঙ্গে, তাকে রোযা কাযা করতে হবে না।[১]

৫. ইশারাহ (ইঙ্গিত):

অনেক সময় কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ধরে নেওয়া ছাড়াই একটি শব্দ থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। এ ধরনের মানতূক অর্থকে বলা হয় 'দালালাতুল ইশারাহ' অর্থাৎ ইঙ্গিতের মাধ্যমে অর্থ প্রকাশ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিম্নোক্ত আয়াতটি লক্ষ্য করলে:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ

"রোযার সময় রাতের বেলা স্ত্রীদের কাছে যাওয়া তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হলো। তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ জানেন, তোমরা চুপি চুপি নিজেরাই নিজেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছিলে। কিন্তু তিনি তোমাদের অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের ক্ষমা করেছেন। এখন তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে রাত্রিবাস করো এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা বৈধ করে দিয়েছেন তা গ্রহণ করো; আর পানাহার করতে থাকো যতক্ষণ না রাত্রির কালো রেখার বুক চিরে প্রভাতের সাদা রেখা সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।"[২]

দেখা যাবে, এ আয়াত থেকে আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, জানাবাহ[৩] অবস্থায় রোযা শুরু করা বৈধ; কারণ ভোর না হওয়া পর্যন্ত সহবাসের বৈধতা দেয়া হয়েছে এবং এখানে গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনের কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। সুতরাং রোযার মধ্যে অপবিত্র অবস্থায় ভোর পর্যন্ত থাকার অনুমতি অবশ্যই বহাল থাকতে হবে।

---

১ এটি চার মাযহাবের মত। যাহিরীদের অবস্থান এদের বিপরীতে।

২ সূরা আল বাকারাহ (২): ১৮৭।

৩ যৌনক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট অপবিত্রতার অবস্থা। গোসলের মাধ্যমে এ অপবিত্রতা দূরীভূত হয়।

মাফহুম (নিহিত) অর্থ

কোনো বক্তব্যের 'মানতূক' (প্রকাশ্য) অর্থের মধ্যকার বিধানের সাথে সম্পর্কের দিক থেকে 'মাফহুম' (নিহিত) অর্থকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যায়, আর তা হলো:

১. 'মাফহুমুল মুওয়াফাকাহ'– যেখানে নিহিতার্থের বিধানটি প্রকাশ্য অর্থের বিধানের সাথে মিলে যায়; এবং

২. 'মাফহুমুল মুখালাফাহ'–যেখানে নিহিতার্থের বিধানটি প্রকাশ্য অর্থের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক।[১]

অর্থাৎ যদি কোনো আইন বিশেষ অবস্থা, বৈশিষ্ট্য, সংখ্যা ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত হয়, তখন যে কেউ ধরে নিতে পারে যে, উক্ত অবস্থা, বৈশিষ্ট্য, সংখ্যা ইত্যাদি অনুপস্থিত থাকলে সেই আইনটি প্রযোজ্য হবে না। কতিপয় বিশেষজ্ঞ নিহিতার্থের উক্ত দু'টি ভাগকে আরো কয়েকটি উপ-ভাগে বিভক্ত করেছেন। তবে সেসব উপ-ভাগের মধ্যকার পার্থক্যসমূহ ভাষাতত্ত্বের বিচারে এতোটা সূক্ষ্ম যে, এখানে প্রধান দু'টি ভাগের অল্প কিছু উদাহরণ উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে।

মাফহুমুল মুওয়াফাকাহ'র একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত আয়াতে, যেখানে পিতা-মাতার প্রতি কর্কশ শব্দ ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে:

فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ

"তাদের প্রতি 'উফ' বলো না।"[২]

আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ থেকে জানা যায়, পিতা-মাতার প্রতি 'উফ' শব্দ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ; আর এর নিহিতার্থ থেকে বুঝা যায় তাদেরকে অভিশাপ দেয়া কিংবা আঘাত করাও নিষিদ্ধ। আরেকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে ইয়াতীমের সম্পত্তি সংক্রান্ত আয়াতে:

---

১ দেখুন প্রিন্সিপলস অব ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স, পৃঃ ১৩২-৭।

২ সূরা বনী ইসরাঈল (১৭): ২৩। 'উফ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো কান বা নখের ভিতরের ময়লা, তবে এখানে এটি অসন্তুষ্টি জ্ঞাপক অব্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

"যারা এতিমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তো আগুন দিয়ে নিজেদের পেট পূর্ণ করে; তাদেরকে অবশ্যই জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দেয়া হবে।"[১]

আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ থেকে জানা যাচ্ছে যে, অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা নিষিদ্ধ। আর নিহিতার্থ থেকে বুঝা যাচ্ছে, ইয়াতীমের সম্পদ অপচয় করাও নিষিদ্ধ; কারণ উভয় ক্ষেত্রেই ইয়াতীমকে তার সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত করা হয়। পিতা-মাতার প্রতি দুর্ব্যবহারের উদাহরণে নিহিতার্থটি (মাফহুম) প্রকাশ্য অর্থের (মানতূক) চেয়ে অধিক শক্তিশালী; পক্ষান্তরে দ্বিতীয় উদাহরণে উভয়টি সমান শক্তিশালী।

মাফহুমুল মুওয়াফাকাহ থেকে উৎসারিত নীতিটির বৈধতা প্রশ্নাতীতভাবে যুক্তিসঙ্গত। আর এ কারণে ইসলামী আইনের সকল বিশেষজ্ঞ যেসব নীতিমালা ব্যবহার করে থাকেন—উক্ত নীতিটি সেগুলোর অন্যতম।[২]

তবে মাফহুমুল মুখালাফাহ ভিত্তিক যুক্তিসমূহের বৈধতা প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। এর একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে:

إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

"পাপিষ্ঠ কোনো ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোনো সংবাদ নিয়ে আসলে, তোমরা তা যাচাই করে দেখো।"[৩]

উপরোক্ত আয়াত থেকে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, ন্যায়পরায়ণ কোনো ব্যক্তি কোনো তথ্য নিয়ে আসলে তা গ্রহণ করা উচিত এবং তা যাচাই করে দেখারও কোনো প্রয়োজন নেই। আরেকটি উদাহরণ রয়েছে কোনো

১ সূরা আন নিসা (৪): ১০।
২ এটিকে আল কিয়াসুল জালী (প্রকাশ্য কিয়াস) নামেও অভিহিত করা হয়।
৩ সূরা আল হুজুরাত (৪৯): ৬।

মহিলার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আনয়নকারীর শাস্তি সম্পর্কিত আয়াতে:

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً

"তাদেরকে আশিটি করে বেত্রাঘাত করো।"[১]

এ আয়াতের নিহিতার্থ (মাফহুম) হলো, তাদেরকে আশিটির চেয়ে কম বা বেশী বেত্রাঘাত করা যাবে না। একইভাবে হাজ্জের সময় শিকার সম্পর্কিত আয়াতটির মধ্যেও এর উদাহরণ রয়েছে:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ

"হে ঈমানদারগণ! ইহরাম[২] বাঁধা অবস্থায় শিকার করো না; আর তোমাদের কেউ যদি জেনে-বুঝে এমনটি করে বসে, তাহলে যে প্রাণীটি সে মেরেছে, গৃহপালিত প্রাণীর মধ্য থেকে তারই সমপর্যায়ের একটি প্রাণী তাকে নযরানা দিতে হবে।"[৩]

এ আয়াতের মধ্যে মাফহুম বা নিহিত অর্থ হলো দুর্ঘটনাক্রমে কোনো পশু হত্যা করা হলে তার জন্য কোনো কুরবানী করতে হবে না। পূর্বে উল্লিখিত সব ক'টি উদাহরণের প্রত্যেকটিতেই মাফহুমুল মুখালাফাহ থেকে একটি বৈধ নীতি বেরিয়ে আসে। তবে যেখানে মাফহুমুল মুখালাফাহতে সাধারণ পরিস্থিতির বর্ণনা থাকে যা সব ক্ষেত্রে সত্য নয়, সেখানে মাফহুমুল মুখালাফাহ হবে ভ্রান্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সৎ কন্যাকে বিয়ে করার উপর নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত আয়াতে:

وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم

১ সূরা আন নূর (২৪): ৪।

২ হাজ্জ বা উমরাহ সম্পাদনের জন্য পবিত্রতার একটি অবস্থা—যেখানে যৌনক্রিয়া, চুলকাটা, সুগন্ধি ব্যবহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হয়, আর পুরুষদের ক্ষেত্রে সচরাচর পোশাকের স্থলে চাদরের মতো দু' প্রস্থ কাপড় পরিধান করতে হয়।

৩ সূরা আল মায়িদাহ (৫): ৯৫।

"তোমাদের স্ত্রীদের মেয়েদেরকে (বিয়ে করা নিষিদ্ধ) যারা তোমাদের কোলে (অভিভাবকত্বে) মানুষ হয়েছে।"[১]

মাফহুমুল মুখালাফাহ হলো, যেসব সৎ কন্যা তোমাদের কোলে মানুষ হয়নি, তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে পারবে; কিন্তু ব্যাপারটি মোটেই এমন নয়। 'তোমাদের কোলে মানুষ হয়েছে' বাক্যটিতে মানুষের স্বাভাবিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এখানে এটিকে নিষেধাজ্ঞার শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। চার মাযহাবের সকল বিশেষজ্ঞগণই এ অর্থ গ্রহণ করেছেন। এই ব্যাখ্যাটির ভিত্তি আরো মজবুত হয়েছে এ কারণে যে, আয়াতটিতে সৎ কন্যার দু'টি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে:

وَرَبَآئِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

"তোমাদের স্ত্রীদের মেয়েদেরকে (বিয়ে করা নিষিদ্ধ) যারা তোমাদের কোলে (অভিভাবকত্বে) মানুষ হয়েছে, সেসকল স্ত্রীদের মেয়েদেরকে যাদের সাথে তোমরা সহবাস করেছ, অন্যথায় যদি (শুধুমাত্র বিয়ে হয় এবং) সহবাস না হয়, তাহলে (তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করলে) তোমাদের কোনো গুনাহ নেই।"[২]

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় শর্তটি পূরণ না হলে নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না। তবে প্রথম শর্তটি পূরণ না হলে এ ব্যতিক্রমটি প্রযোজ্য হবে—এ মর্মে কোনো কথা আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি।

অশুদ্ধ মাফহুমুল মুখালাফাহ'র আরেকটি ক্ষেত্র হলো যখন মানতূক বা প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা কোনো বাস্তব বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ:

وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾

১ সূরা আন নিসা (৪): ২৩।
২ সূরা আন নিসা (৪): ২৩।

"এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মা'বুদকে ডাকে, যার (সত্য হওয়ার) পক্ষে তার কাছে কোনো যুক্তি-প্রমাণ নেই, তার হিসাব তার রবের কাছে; এ ধরনের কাফিররা কখনো সফলকাম হতে পারে না।"[১]

এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ কারও কাছে এমন মনে হতে পারে যে, যদি কারো নিকট অন্য কোনো মা'বুদের সত্য হওয়ার প্রমাণ থাকে তাহলে সে আল্লাহর পাশাপাশি ঐ মা'বুদেরও উপাসনা করতে পারবে। বাস্তবে এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। কারণ একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মা'বুদ না থাকায় অন্য কোনো সত্তার সত্য মা'বুদ হওয়ার সপক্ষে কোনো বৈধ প্রমাণ নেই। ঐ মা'বুদের 'সত্য হওয়ার সপক্ষে তার কাছে কোনো যুক্তি-প্রমাণ নেই'– শীর্ষক বাক্য যোগ করার উদ্দেশ্য হলো বক্তব্যের উপর জোর দেয়া এবং যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর উপাসনা করে–তাদেরকে হাস্যাস্পদে পরিণত করা। এ কারণে মানতূক এর শর্তাবলী যদি স্বাভাবিক অবস্থার বর্ণনা বা বাস্তবতার ব্যাখ্যা না হয়, তাহলে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই মাফহুমুল মুখালাফাহ থেকে উৎসারিত নীতিমালাকে মেনে নিয়েছেন।[২]

---

১ সূরা আল মু'মিনূন (২৩): ১১৭।

২ একমাত্র ইমাম আবু হানিফাহ মাফহুমুল মুখালাফাহ এর ব্যবহারকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

উপসংহার

আমি এ গ্রন্থে পাঠকদেরকে কুরআনী জ্ঞানের কয়েকটি শাখার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালিয়েছি। কোনো ব্যক্তি কুরআনকে যত বেশী অনুধাবন করে তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করবে, সে ততই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। আমি আশা করি, মুসলিমরা দু'টি অপ্রিয় চরমপন্থার দিকে না গিয়ে মধ্যম পন্থাটি অনুসরণ করবে। প্রথম চরমপন্থাটি হলো, এই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকা যে, ইসলামী জ্ঞান সাধারণ মানুষের বুঝার বিষয় নয় এবং তা কেবল নির্দিষ্ট এক শ্রেণীর মানুষের জন্য রেখে দেয়া উচিত। এ মনোভাব মুসলিম গণমানুষকে তাদের দ্বীনের ব্যাপারে ভয়াবহ রকমের অজ্ঞতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যে ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য সময় ব্যয় করে না, তাকে প্রায়শ এমন সব কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকতে দেখা যায়, যা বিচার দিবসে তার জন্য অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ মনোভাব মুসলিম জনতাকে এমন এক পরিণতির দিকেও নিয়ে যাচ্ছে– সূরা আত তাওবাতে যার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। আর তা হলো ইহূদী ও খ্রিস্টানরা তাদের যাজক ও পুরোহিতদেরকে রবের আসনে বসিয়ে দিয়েছিল; আর তা করা হয়েছিল এভাবে যে, আল্লাহ তাদের জন্য যা বৈধ করে দিয়েছেন, পুরোহিত ও যাজকরা তাকে অবৈধ করতো এবং আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তাকে বৈধ করে দিতো; আর ইহূদী ও খ্রিস্টানরা তাদের অন্ধ অনুসরণ করতো।[১]

দ্বিতীয় চরমপন্থাটি হলো, ইসলাম সম্পর্কে অল্প কয়েকটি বই পড়ে নিজেকে মহাপণ্ডিত মনে করা। তারা যখন কাউকে এমন কোনো আমল করতে দেখে যে ব্যাপারে তার জানা নেই; কিংবা যখন শোনে যে, কোনো ব্যক্তি কোনো কাজকে ভুল সাব্যস্ত করেছে (অথচ তারা নিজেরা সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামতগুলোকে পড়ে দেখেনি); তখন তারা আশেপাশের লোকদের 'ভুলগুলো' শুধরে দেয়াকে নিজেদের একান্ত দায়িত্ব মনে করে বসে। আমি আশা করি, এ গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের জটিলতাকে এ ধরনের লোকদের সামনে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হবে; বিশেষত এ

১ সূরা আত তাওবাহ (৯): ৩১।

কারণে যে, এ বিষয়ের উপর আরবি ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহের তুলনায় এ গ্রন্থে যা উপস্থাপন করা হয়েছে—তা হলো বিশালাকৃতির ডুবন্ত বরফশিলার দৃশ্যমান ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চূড়া মাত্র।

আমি আশা করি, পাঠকরা এ গ্রন্থে অন্য কিছু না পেলেও অন্ততপক্ষে একটা মানদণ্ড পেয়ে যাবেন, যা দিয়ে তারা কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদানকারীদের বক্তব্যগুলোকে পরিমাপ করতে সক্ষম হবেন। আমরা এমন একটা সময়ে বাস করছি যখন অমুসলিমরা মুসলিমদের ব্যাপারে খুবই উৎসাহী; আর এরই অংশ হিসেবে তারা আমাদের দ্বীনের উৎসসমূহের পুনর্ব্যাখ্যা করে দিতে চায়। এসব অপপ্রয়াসের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কুরআনের পুনর্ব্যাখ্যা প্রদান। অমুসলিমদের অপচেষ্টার ব্যাপারে মুসলিমরা যদিও বেশ সতর্ক, কিন্তু খোদ কিছু মুসলিম নামধারীরাই ইসলামের আগাগোড়া পুনর্ব্যাখ্যা প্রদানের এ মিশন পরিচালনা করে চলছে। পুনর্ব্যাখ্যার এ আন্দোলন তারাই চালিয়ে যাচ্ছে যারা পাশ্চাত্যে বসবাসরত বা তাদের ধর্মহীন জীবনদর্শন দ্বারা প্রভাবিত। তারা পাশ্চাত্যের যন্ত্র ও শিল্পভিত্তিক সভ্যতার অনেক চিন্তাধারাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছে, যেগুলোকে তাদের দাবী অনুযায়ী মুসলিমদের ইসলাম চর্চার ক্ষেত্রে অবশ্যই জায়গা করে দিতে হবে।

এ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পদ্ধতি হলো, কোনো বিষয়ে তারা আগে থেকেই একটি অবস্থান নিয়ে নেয়, তারপর তার সমর্থনে প্রমাণ খুঁজে বেড়ায়। একটি কৌশল তাদের নিকট খুবই পছন্দের; আর তা হলো কোনো বিষয়ের একটি বিশেষ আয়াতের উপর ভিত্তি করে যুক্তি-তর্কে অবতীর্ণ হওয়া—তাও আবার প্রায়শ নিজেদের উদ্ভাবিত নতুন ব্যাখ্যা অনুযায়ী। এ দুষ্কর্ম করতে গিয়ে তারা সেসব আয়াতকে উপেক্ষা করে—যা তাদের এ মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদানকে অসম্ভব করে তোলে। এর একটি চিরায়ত উদাহরণ হলো সূরা বাকারা'র ৬২ নং আয়াতের একটি বিকৃত ব্যাখ্যা:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ
عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

"নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, যারা (শেষ নবীর প্রতি) ঈমান আনে আর ইহুদী, খ্রিস্টান বা সাবি (অগ্নি উপাসক) তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও শেষ

দিনের প্রতি ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তার প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের কাছে এবং তাদের জন্য কোনো ভয় ও মর্মবেদনার অবকাশ নেই।”

তারা বলে, এ আয়াতটি এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, ইহূদী ও খ্রিস্টানরাও ঈমানদার! আমরা সবাই পরস্পর ভাই ভাই, আর জান্নাতে যাওয়ার জন্য আল্লাহ ও বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পাশাপাশি সৎকর্ম সম্পাদনই হলো একমাত্র মানদণ্ড। তবে ইতিহাসের সব স্তরেই মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ এ আয়াতটিকে সূরা নিসা'র ১৫০-১৫১ আয়াতের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের সাথে কুফরী করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে ‘আমরা কাউকে মানবো ও কাউকে মানবো না’, আর কুফর ও ঈমানের মাঝখানে একটি পথ অবলম্বন করতে চায়—তারা সবাই আসলে কট্টর কাফের; আর এহেন কাফেরদের জন্য আমি এমন শাস্তি তৈরী করে রেখেছি, যা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবে।”

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে ইহূদী [যারা ‘ঈসা ও মুহাম্মাদ (আলাইহিমাস সালাম) এর নুবুওয়্যাতকে অস্বীকার করে] ও খ্রিস্টানদের [যারা মুহাম্মাদ ﷺ এর নুবুওয়্যাতকে অস্বীকার করে] দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।[১]

যেসব ইহূদী ও খ্রিস্টান মুহাম্মাদ ﷺ এর কথা শোনার পরও তাঁর নুবুওয়্যাতকে প্রত্যাখ্যান করেছে—তাদেরকে কেমন করে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয়া যেতে পারে যে, তারা আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে এবং তাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই?

যে ব্যক্তি সূরা বাকারা'র উক্ত আয়াতকে এভাবে অপব্যাখ্যা করে, সে মূলত এমন একটি অবস্থান নিয়েছে যা কুরআনের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য

---

১ দেখুন তাফসীরু ইবনি কাসীর, খণ্ড ১, পৃঃ ৫৮৫, আল জামি' লি আহকামিল কুরআন, খণ্ড ৬, পৃঃ ৫-৬, ও তাফসীরুত তাবারী, খণ্ড ৪, পৃঃ ৩৪৩-৪।

থাকার বিষয়টিকে অনিবার্য করে তোলে; আর এরূপ ধারণা পোষণ করা স্বয়ং একটি কুফর (অবিশ্বাস)। তাই মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে একমত যে, এ আয়াতের দু'টি সম্ভাব্য সঠিক ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রথমটি হলো, যেসব ইহুদী মূসা ﷺ এর সময় এবং যেসব খ্রিস্টান ঈসা ﷺ এর সময় আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করে তদের নিকট প্রেরিত নবীর অনুসরণ করেছে—উক্ত আয়াতে তাদেরকে পুরস্কৃত করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে। অপর ব্যাখ্যাটি হলো, নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর পর ঘোষিত পুরস্কারটি মূলত বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যকার সেসব লোকের জন্য—যারা মুহাম্মাদ ﷺ-কে তাদের নিকট প্রেরিত নবী হিসেবে মেনে নিয়ে আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে এবং সর্বশেষ ওহী অনুযায়ী সৎকর্ম সম্পাদন করে।[১] এ দু'টি ব্যাখ্যায় সকল তথ্য—প্রমাণকে সামনে রাখা হয়েছে। সংক্ষেপে আলোচনা করার তাগিদে উপরে সেসব তথ্য-প্রমাণের কেবল একটি ক্ষুদ্র অংশ উল্লেখ করা হয়েছে; অথচ প্রথম ব্যাখ্যায় সেসব তথ্য বিবেচনায় রাখা হয়নি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আরেকটি পদ্ধতির ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকা উচিত; তা হলো, শব্দের কেবল আভিধানিক অর্থের উপর পুরোপুরি নির্ভর করে কুরআনের তাফসীর করা। এ ধরনের তাফসীরকে আপাতগ্রাহ্য বানাতে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই সুন্নাহকে অবধারিতভাবে উপেক্ষা করতে হবে। আপনি তাদের কাউকে কাউকে দেখবেন, তারা কেবল এ কারণে একটি হাদীস প্রত্যাখ্যান করছে যে, তা অল্প কয়েকজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন! এটি ছিল ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে ইসলামের ছদ্মবেশ ধারণকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য। আশা করি, এ গ্রন্থটি পাঠ করার পর সুধী পাঠকবৃন্দ এ ধরনের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত পুনর্ব্যাখ্যার ত্রুটিসমূহ অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন ইনশা আল্লাহ। পরিশেষে আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করি, তিনি যেন আমাদের সকলকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করেন এবং পরকালীন জীবনের ধ্বংস থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেন।

---

১ দেখুন তাফসীরু ইবনি কাসীর, খণ্ড ১, পৃঃ ১০৭-৮, আল জামি' লি আহকামিল কুরআন, খণ্ড ১, পৃঃ ২৯৫-৬, তাফসীরুত তাবারী, খণ্ড ১, পৃঃ ৩৬১-৫ ও রূহুল মাআনী, খণ্ড ১, পৃঃ ২৮০।

শব্দকোষ

'আম	عام: আরবি ভাষায় ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এটি এক ধরনের বিশেষ্য যা অনেক কিছুর উপর প্রযোজ্য– যার কোনো সংখ্যাসীমা নেই এবং যা প্রযোজ্য বিষয়ের সবকিছুকেই নিজ বলয়ের অন্তর্ভুক্ত করে।
'আ-শূরা	عاشورة ইসলামী বর্ষপঞ্জিতে মুহাররাম মাসের দশম দিন। এর আগের বা পরের দিন সহকারে ঐ দিন রোযা রাখার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।
আ-সা-র	اثار একবচনে আছার; সাহাবী বা তাবিঈদের বক্তব্য বা কার্যাবলীর বিবরণী।
আয়াহ / আয়াত	اية বহুবচনে আয়াত; আক্ষরিক অর্থ নিদর্শন; ভৌতবিশ্বে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা, জ্ঞান ও দয়া ইত্যাদির নিদর্শনাদি বুঝাতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়; এটি কুরআনের আয়াতের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।
আল	ال: নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক অব্যয়, বাংলাভাষায় 'টি' এর সমতুল্য; তবে আরবিতে এর অর্থের পরিধি অনেক ব্যাপক, কারণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ অব্যয়টি ব্যবহারের মানে হলো, যে শব্দের শুরুতে তা জুড়ে দেয়া হয়েছে তা ঐ শব্দের অর্থের সব সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে, আর এভাবে এ অব্যয়টি ব্যাপক অর্থপ্রকাশের অন্যতম প্রধান মাধ্যমে পরিণত হয়েছে।
আল্লাযী	الذى: সম্বন্ধবাচক সর্বনাম যার অর্থ 'যে ব্যক্তি'। এ সংক্রান্ত সর্বনামসমূহ সাধারণ অর্থ প্রকাশের মাধ্যম।
আকীদাহ	عقيدة: বিশ্বাস; ইসলামে কোনো বিষয় বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত হতে হলে তা অবশ্যই নিশ্চয়তাজ্ঞাপক প্রমাণের ভিত্তিতে হতে হবে।
আসবাবুন নুযূল	اسباب النزول: কুরআনের বিশেষ কোনো আয়াত বা সূরা নাযিলের পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষিত।
আসমাউশ শার্ত	اسماء الشرط: শর্তবাচক সর্বনাম, যেমন 'যে-ই', 'যা-ই, 'যেখানেই' ইত্যাদি। এগুলোও সাধারণ অর্থ নির্দেশক।

আতবাউত তাবিঈন	اتباع التابعين: মুসলিমদের তৃতীয় প্রজন্ম। এ শব্দ দ্বারা সেসব মুসলিমকে বুঝানো হয়–যারা কোনো একজন তাবিঈ'র (যিনি সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন) সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এ প্রজন্মকে সম্মানিত মনে করার কারণ হলো, নবী ﷺ বলেছেন যে, সর্বোত্তম প্রজন্ম হলো তাঁর সাহাবীদের প্রজন্ম, তারপর তাদের পরবর্তী প্রজন্ম, তারপর তাদের পরবর্তী প্রজন্ম।
বাতিল	باطل: আক্ষরিক অর্থ 'মিথ্যা' বা 'অসার'; হাদীসের মিথ্যা বর্ণনা ও কুরআনের মিথ্যা কিরাআত বুঝাতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।
বাতিন	باطن: আক্ষরিক অর্থ 'আভ্যন্তরীণ'; এ পরিভাষাটি সেসব লোক ব্যবহার করে যারা দাবী করে যে, কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াতের গুপ্ত অর্থ রয়েছে। এ দৃষ্টিভঙ্গির আরো চরমপন্থী প্রস্তাবকদের মতে 'গুপ্ত অর্থ' বাহ্যিক অর্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তা সম্পর্কে কেবল তাদের কতিপয় রহস্যময় অভিজাত লোকেরাই অবগত।
বাই / বায়	بيع: ব্যবসায়, বেচা-কেনা।
বাইতুল ইজ্জাহ	بيت العزة: 'সম্মান বা শক্তি গৃহ'; নিম্নতম আকাশের একটি স্থান – যেখানে রমজান মাসের লাইলাতুল ক্বাদরে (ভাগ্য রজনী) সমগ্র কুরআন একসাথে নাযিল হয়েছিল। সেখান থেকে আল্লাহর নির্দেশে জিবরাঈল ফেরেশতা সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে অল্প অল্প করে নবী ﷺ এর নিকট নিয়ে এসেছিলেন।
দঈফ	ضعيف: আক্ষরিক অর্থ 'দুর্বল'; হাদীসের দুর্বল বর্ণনাকারী কিংবা দুর্বল বর্ণনা বুঝাতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।
দালালাতুল ইক্তিদা	دلالة الاقتضاء: যে অর্থ মূল পাঠে উল্লেখ নেই, কিন্তু মূল পাঠকে অর্থবহ করতে হলে যা ধরে নেয়া জরুরী।
দা'ওয়াহ	دعوة: আক্ষরিক অর্থ 'আমন্ত্রণ'; ইসলামের পরিভাষায়, কাউকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানো; কিংবা আরো সাধারণ অর্থে, কোনো ধর্ম বা বিশ্বাসের প্রচারণা।
দাম্মাহ	ضمة: "হ্রস্ব উ-কার' ধ্বনি। সংশ্লিষ্ট অক্ষরের উপর ক্ষুদ্র আকারের 'ওয়াও' লিখে এ স্বর নির্দেশ করা হয়।

দিয়ত / দিয়াহ	دية: প্রাণহানি বা অঙ্গহানির ক্ষতিপূরণ বাবদ দণ্ড। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার জীবিত উত্তরাধিকারদেরকে দায়ী ব্যক্তি এ অর্থ প্রদান করে।
যাহির	ظاهر: আক্ষরিক অর্থ 'প্রকাশ্য'; উসূলুল ফিক্‌হে এ পরিভাষাটি দ্বারা কোনো শব্দ বা বাক্যের সুস্পষ্ট বা বাহ্যিক অর্থকে বুঝানো হয়—যেখানে উক্ত শব্দের অন্যান্য অর্থ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
যাহিরী	ظاهری: ইসলামী আইনের একটি মাযহাব; কিয়াস প্রত্যাখ্যান এবং কুরআন ও সুন্নাহর মূল পাঠের আক্ষরিক অর্থকে আঁকড়ে ধরার কারণে এরা খ্যাত হয়ে আছে। এ মাযহাবের সর্বাধিক খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ হলেন এর প্রতিষ্ঠাতা দাউদ যাহিরী ও ইবনু হাযাম আন্দালুসী—যিনি এ মৃতপ্রায় মাযহাবটিকে পুনর্জীবন দান করেছেন।
যিহার	ظهار: তালাকের কাছাকাছি একটি প্রথা। প্রাক-ইসলামী যুগের আরবরা যার চর্চা করতো। এতে একজন পুরুষ বৈবাহিক সম্পর্কের ব্যাপারে শপথ করে তার স্ত্রীকে বলতো যে, সে তার জন্য তার মায়ের মতো। তবে সে তাকে তালাক দিতো না, যার ফলে ঐ মহিলা অন্য কাউকে বিয়ে করতেও পারতো না। ইসলাম এই প্রথাকে বেআইনী ঘোষণা করেছে।
যিকর	ذكر: আক্ষরিক অর্থ 'স্মারক' বা 'স্মরণ'; ইসলামী পরিভাষায় স্মরণ দ্বারা আল্লাহর স্মরণকে বুঝানো হয়। আর স্মারক (আয যিক্‌র) হলো কুরআনের অন্যতম একটি নাম।
যুল্‌ম	ظلم: আক্ষরিক অর্থ 'অবিচার বা অন্যায় আচরণ'।
দালালাতুল ইশারাহ	دلالة الاشارة: মূলপাঠে পরোক্ষভাবে উল্লিখিত অর্থ—যা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। (দিলালাহ ও দালালাহ—মূলত একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ।)
দু'আ	دعاء: নিবেদন; প্রার্থনা।
ঈমান	ايمان: বিশ্বাস। বিশ্বাস বুঝাতে কুরআন ও সুন্নাহ্‌তে এ পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে; পক্ষান্তরে একই ধারণা বুঝাতে বিশেষজ্ঞগণ 'আকীদাহ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। উভয়ের অর্থে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে; আকীদাহ হলো কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণা—কোনো ব্যক্তির ঈমান বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য যেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক

	দিয়ে কোনো ব্যক্তির আকীদাহ সংক্রান্ত জ্ঞান থাকতে পারে, তারপরও অন্তরের দুর্বলতার দরুন ঐ ব্যক্তিটি দুর্বল ঈমানের অধিকারী হতে পারে।
ফাত্হাহ	فتحة: 'আ'কার ধ্বনি প্রকাশের সংক্ষিপ্ত স্বরচিহ্ন। সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণের উপরে উপর থেকে নিচের দিকে একটি তীর্যক রেখা টানার মাধ্যমে এ স্বরচিহ্ন আঁকা হয়।
ফিক্হ	فقه: আক্ষরিক অর্থ 'অনুধাবন'। ইসলামী পরিভাষায়, এর দ্বারা মানুষের কার্যাবলী সংক্রান্ত শরীয়া'র বিস্তৃত আইন ও তার প্রমাণসমূহের জ্ঞানকে বুঝানো হয়। ফিক্হ হলো জীবনের নিত্য পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে আসমানী শরীয়াহ প্রয়োগ করার কৌশল অনুধাবনের মানবীয় প্রচেষ্টা।
ফুরকান	فرقان: আক্ষরিক অর্থ 'স্বাতন্ত্র্য' বা 'মানদণ্ড'; আল ফুরক্বান শব্দটি কুরআন শরীফের একটি নাম; কারণ এ কিতাবটি সত্য-মিথ্যা নিরূপণের মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে।
গায়াহ	غاية: সীমা; এটি তাখসীসের অন্যতম অভিব্যক্তি – যার মাধ্যমে একটি সাধারণ পাঠকে অধিকতর সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।
গুন্নাহ	غنة: নাকে বাজিয়ে নূন ও মীমের মতো অক্ষরসমূহকে উচ্চারণ করার কৌশলবিশেষ।
হাদীছ	حديث: নবী ﷺ সংক্রান্ত কোনো বর্ণনা– যেখানে তাঁর বক্তব্য, কাজ কিংবা তাঁর সাহাবীদের কৃত কার্যাবলীর প্রতি মৌন সমর্থন, অথবা তাঁর দৈহিক গড়ন বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়। এ সংজ্ঞাটি হাদীস বিশেষজ্ঞদের দেয়া। তবে, ফিক্হ শাস্ত্র বিশেষজ্ঞগণ এ পরিভাষাটিকে প্রথম তিনটির (কথা, কাজ ও মৌন সমর্থন) জন্য সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন।
হাদীছে নববী	حديث نبوى: নবী ﷺ এর বক্তব্য – যা তিনি আল্লাহর প্রতি আরোপ করেননি।
হাদীছে কুদ্ছী	حديث قدسى: নবী ﷺ এর বক্তব্য – যা তিনি আল্লাহর প্রতি আরোপ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ এর নিকট হাদীছে কুদ্ছীর শব্দ ও অর্থ উভয়টিই নাযিল করেছেন, না কি কেবল অর্থই নাযিল করেছেন – এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে দু'টি মত রয়েছে।

হাজ্জ	حج: আক্ষরিক অর্থ তীর্থযাত্রা। যিলহাজ্জ মাসের (ইসলামী বর্ষপঞ্জির দ্বাদশ মাস) ৮ থেকে ১৩ তারিখে মক্কা গমন। প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিমের জন্য জীবনে একবার হাজ্জ করা বাধ্যতামূলক।
হাকীকাহ / হাকীকত	حقيقة: আক্ষরিক অর্থ 'বাস্তবতা'; বাহ্যিক শারীয়াহ ও আভ্যন্তরীণ হাকীকাহ–শিরোনামে সূফীদের দ্বারা ইসলামের বিভাজন। 'বাইরের খোলস' আর 'ভেতরের বাস্তবতা' –শিরোনামে ইসলামে প্রথম বিভাজন রেখা টেনেছিল বাতিনীরা (বাতিনী হলো একটি দুর্বোধ্য গোষ্ঠী যারা ইসলামের ভেতর প্রাক-ইসলামী যুগের ইরানী দর্শন ঢুকিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে এ বিভাজন রেখা তৈরী করেছিল)।
হারাম	حرام: নিষিদ্ধ; শারীয়াহ অনুযায়ী মানবীয় কার্যাবলীর পাঁচটি প্রকারের একটি।
হাসান	حسن: আক্ষরিক অর্থ 'ভাল' বা 'সুখকর'; হাদীসের পরিভাষায় এর দ্বারা এমন হাদীসকে বুঝানো হয় যা যৌক্তিক দিক দিয়ে প্রামাণ্য। অর্থাৎ তার ইসনাদটি সংযুক্ত, আর বর্ণনাকারীরাও সৎ ও নির্ভরযোগ্য, যদিও তাদের এক বা একাধিক ব্যক্তি প্রামাণ্য বর্ণনাকারীদের মতো ততোটা উচ্চমানের নয়। ছহীহ এর সংজ্ঞা দেখুন।
হিজরত	هجرة: আক্ষরিক অর্থ 'অভিগমন বা দেশত্যাগ'; ইসলামের পরিভাষায় হিজরত বলতে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করা সম্ভব নয় এমন কোনো দেশ থেকে অন্য কোনো দেশে চলে যাওয়াকে বুঝায়, যেখানে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করা সম্ভব। ৬২২ ঈসায়ী সনে নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের ভিত্তিতে ইসলামের বর্ষপঞ্জী গড়ে উঠে।
হিযব	حزب: প্রাত্যহিক তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যে কুরআনের বিভাজন। দুই হিযব মিলে এক জুয। এভাবে কুরআন শরীফকে ষাটটি হিযবে ভাগ করা হয়।
হুকম	حكم: আইন বা রায়। সবচেয়ে সাধারণ সংজ্ঞা অনুযায়ী হুকম হলো, দু'টি বস্তুর মধ্যকার সম্পর্ককে সমর্থন করা কিংবা নাকচ করে দেয়া। উদাহরণস্বরূপ, সূর্য অত্যন্ত উত্তপ্ত–এ কথাকে সমর্থন করা হলে তা হবে একটি হুকম। শারীয়া'য় হুকমের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকারটি হলো মানুষের

কার্যাবলীকে শারীয়া'র মান অনুযায়ী মূল্যায়ন করা; যেমন বাধ্যতামূলক, নিষিদ্ধ, প্রশংসনীয়, অপছন্দনীয় বা নিরপেক্ষ।

ইবাদাহ / 'ইবাদত — عبادة: উপাসনা। বিস্তৃত অর্থে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে এমন প্রত্যেকটি কাজই 'ইবাদত; এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি, বক্তব্য, শারীরিক ক্রিয়াকলাপ ও ব্যক্তিগত সম্পদের ব্যবহার। মুয়ামালাতের বিপরীতে ব্যবহৃত হলে 'ইবাদতের অর্থ দাঁড়ায় ভক্তিমূলক উপাসনা—যার জন্য কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থিব সুযোগ-সুবিধা নেই; যেমন সালাত, আল্লাহর স্মরণ, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি।

ইদ্দাহ / ইদ্দত — عدة: বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য পুনর্বিবাহের পূর্বে বাধ্যতামূলক অপেক্ষার সময়।

ইদ্গাম — ادغام: একটি বাক্যের একটি অক্ষরকে আরেকটি অক্ষরের সাথে এমনভাবে মিলিয়ে পড়া যাতে প্রথমটি উচ্চারিত না হয়ে দ্বিতীয়টি দু'বার উচ্চারিত হয়।

ইহ্রাম — احرام: হাজ্জ বা উমরাহ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির পবিত্রতার অবস্থা। এ অবস্থায় এমন কিছু কাজ অবৈধ হয়ে যায় যা সাধারণ অবস্থায় বৈধ, আর পুরুষদের জন্য এ সময় সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ।

ইজমা — اجماع: নবী ﷺ এর ইন্তেকালের পর যে কোনো যুগে শরীয়া আইন প্রসঙ্গে ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলিম বিশেষজ্ঞদের মতৈক্য।

ইজতিহাদ — اجتهاد: কুরআন ও সুন্নাহতে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বক্তব্য নেই—এমন কোনো বিষয়ে ফিক্হ সংক্রান্ত আইন বের করে আনার জন্য ইসলামের যোগ্য পণ্ডিতদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।

ইলহাম — الهام: অনুপ্রেরণা।

ইমালাহ — امالة: বাংলা 'এ' কার এর উচ্চারণ।

ঈমাম — امام: আক্ষরিক অর্থ 'নেতা'; সুন্নী পরিভাষায় এর দ্বারা সালাতে নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তি, কোনো রাজনৈতিক নেতা কিংবা নেতৃস্থানীয় কোনো ইসলামী বিশেষজ্ঞকে বুঝানো হয়। শিয়াদের পরিভাষায়, ঈমাম হলেন ঐশীভাবে নির্বাচিত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা—যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে এই পদ লাভ করেন এবং আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে কথা বলার নিরংকুশ ক্ষমতা রাখেন। বস্তুত তাদের বিশ্বাস হলো,

ঈমামদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কিছু কিছু গুণ রয়েছে, যেমন অদৃশ্যের পরিপূর্ণ জ্ঞান ও বিভিন্ন ঘটনাচক্রের নিয়ন্ত্রণ। তাদের মতে, একই সময়ে কেবল একজন ঈমামই থাকতে পারেন।

ইক্তিদা — اقتضاء: দেখুন দালালাতুল ইক্তিদা।

ইশারাহ — اشارة: দেখুন দালালাতুল ইশারাহ।

ইসমুল জিন্স — اسم الجنس: সাধারণ বিশেষ্য।

ইসনাদ — اسناد: হাদীসের বর্ণনাকারী পরম্পরা—যার মাধ্যমে মূলপাঠের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা হয়।

ইসরা — اسراء: নবী ﷺ এর মক্কা থেকে জেরুজালেম পর্যন্ত রাত্রিকালীন ভ্রমণ—যেখানে তিনি সকল নবী-রাসূলের সাথে সালাত আদায় করেছিলেন। সেখান থেকে তাঁকে মি'রাজের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

ইসরাঈলিয়াত — اسرائليات: বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয় ও (ঐতিহাসিক) ঘটনাবলীর ব্যাপারে ইহূদী ও খ্রিস্টানদের বর্ণনা। নবী ﷺ মুসলিমদেরকে সেসব বর্ণনা প্রচারের অনুমতি দিয়েছিলেন, এগুলো মোট তিন ভাগে বিভক্ত; কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত বর্ণনা—এর ফলে এগুলোকে আমরা সত্য বলে জানি; কুরআন – হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক বর্ণনা—অতএব এগুলোকে আমরা মিথ্যা হিসেবে জানি; এবং এমনসব বর্ণনা যার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ নীরব—এই শেষ প্রকারটিকে আমরা সত্যায়ন বা প্রত্যাখ্যান—কোনোটাই করতে পারি না।

ইস্তিছনা — استثناء: কোনো সাধারণ বিবৃতি, আদেশ বা নিষেধাজ্ঞার ব্যতিক্রম। এ কারণে ইস্তিছনাকে তাখসীসের একটি প্রকার হিসেবে গণ্য করা হয়।

ইয্হার — اظهار: একটি বাক্যের মধ্যকার পাশাপাশি অক্ষরগুলোর স্বতন্ত্র উচ্চারণ।

জাদাল — جدل: আক্ষরিক অর্থ 'যুক্তি' বা 'তর্ক'; ঈমান প্রত্যাখ্যানকারীদের অবস্থান প্রসঙ্গে কুরআনে অসংখ্য বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করা হয়েছে।

জাহ্মিয়া — جهمية: ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সুস্পষ্ট ধর্মদ্রোহী দার্শনিক গোষ্ঠী; জাহম ইবনু সাফওয়ানের অনুসারীবৃন্দ। তারা আল্লাহর সকল গুণাবলীকে অস্বীকার করে।

জানাবাহ — جنابة: যৌনমিলন বা বীর্যপাতের ফলে উদ্ভূত অপবিত্রতা। এ অবস্থায় উপনীত কোনো ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ গোসলের আগ পর্যন্ত সালাত আদায় ও কুরআন তিলাওয়াত প্রভৃতি কর্ম সম্পাদন করতে পারে না।

জুমুআহ — جمعة: শুক্রবার; বৃহৎ পরিসরের সাপ্তাহিক সামষ্টিক সালাতের দিন – তাতে প্রাত্যহিক মধ্যাহ্ন (জোহর) সালাতের স্থলে দুই খুতবাহ ও দুই রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায় করা হয়।

জুয — جزء: সমগ্র কুরআনের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ। নবী ﷺ প্রত্যেক ত্রিশ দিনে একবার সমগ্র কুরআন তিলাওয়াত সম্পন্ন করার পরামর্শ দিয়েছেন।

কামিন মাছাল — كامن مثل: এক প্রকার রূপক অভিব্যক্তি।

কা'বা — كعبة: এক আল্লাহর 'ইবাদতের উদ্দেশ্যে নবী ইবরাহীম ﷵ কর্তৃক মক্কায় নির্মিত গৃহ। এ দিক দিয়ে এটি হলো 'ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্মিত সর্বপ্রাচীন গৃহ–যা এখনো আবাদ রয়েছে।

কাফ্ফারাহ — كفارة: গোনাহের প্রায়শ্চিত্তমূলক ব্যবস্থা।

কাশফ — كشف: নবী নয় এমন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এমন কোনো কিছু অনুধাবনের ক্ষমতা দাবী করা–যা সাধারণত মানুষের উপলব্ধির বাইরে।

কাসরাহ — كسرة: 'ই' উচ্চারণজ্ঞাপক স্বরচিহ্ন (যের)। সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণের নীচে একটি ছোট্ট আড়াআড়ি সরলরেখা অঙ্কনের মাধ্যমে এর স্বর চিহ্নিত করা হয়।

খাস — خاص: আক্ষরিক অর্থ 'সুনির্দিষ্ট'; বিশেষ্য যা সীমিত সংখ্যক বস্তুর উপর প্রযোজ্য।

কুফর — كفر: 'অস্বীকার' ও 'অকৃতজ্ঞতা'। ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ ইসলামকে প্রত্যাখ্যান।

কুল্লু — كل: সকল। ব্যাপক অর্থবোধক শব্দসমূহের অন্যতম।

আল লাওহুল মাহফুয — اللوح المحفوظ: সংরক্ষিত তখ্ত–যেখান থেকে নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর ওহী নাযিলের সূচনালগ্নে কুরআনকে নিকটতম আকাশে স্থানান্তর করা হয়েছে। দেখুন বাইতুল ইজ্জাহ।

লাইলাতুল ক্বাদর — ليلة القدر: ভাগ্য রজনী—যে রাতে কুরআনকে 'লাওহে মাহফুয' থেকে 'বাইতুল ইজ্জাহ' নামক স্থানে নাযিল করা হয়েছে।

মাদানী ওহী — কুরআনের সেসব আয়াত যা নবী ﷺ এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর নাযিল হয়েছে।

মাক্কী ওহী — কুরআনের সেসব আয়াত যা নবী ﷺ এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছে।

মাফহুম — مفهوم: মূলপাঠের পরোক্ষ অর্থ।

মাফহুমুল মুখালাফাহ — مفهوم المخالفة: এ তত্ত্বের মূলকথা হলো, মূল পাঠে কোনো বিধানের জন্য কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য, শর্ত, সংখ্যা ইত্যাদির কথা বলা থাকলে, সেই বৈশিষ্ট্য, শর্ত, সংখ্যা ইত্যাদির অনুপস্থিতিতে উক্ত বিধানটি প্রযোজ্য নয়।

মাফহুমুল মুওয়াফাকাহ — مفهوم الموافقة: এ তত্ত্ব অনুযায়ী, কোনো বিধানের নেপথ্যে বিদ্যমান কার্যকারণ অন্য কোথাও পাওয়া গেলে সেখানেও উক্ত বিধানটি প্রযোজ্য।

মানতূক — منطوق: আক্ষরিক অর্থ 'উচ্চারিত'; মূলপাঠের স্পষ্টভাবে বিবৃত বার্তা।

মাসজিদ — مسجد: মসজিদ।

মাসাল — مثل: উপমা, নীতিগর্ভ দৃষ্টান্ত, রূপকালঙ্কার।

মাযহাব — مذهب: গমনের পথ; রূপক অর্থে, কোনো মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি। ইসলামের পরিভাষায় এ শব্দটি দ্বারা জ্ঞানের বিশেষ কোনো চিন্তাগোষ্ঠীকে বুঝানো হয়। ইসলামী আইনের চারটি চিন্তাগোষ্ঠীকে বুঝাতে এ শব্দটি সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়; চারটি প্রধান মাযহাব হলো—হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী।

মি'রাজ — معراج: নবী ﷺ এর উর্ধ্বগমন। এ সফর জেরুজালেম থেকে শুরু হয়ে সাত আকাশ পাড়ি দিয়ে আল্লাহর সাক্ষাৎ পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। এ উর্ধ্বগমনের সময়ই সালাত বাধ্যতামূলক হয়। ইসরা ও মি'রাজ—উভয়টি একই রাত্রিতে সম্পন্ন হয়।

মুয়ামালাহ — معاملة: লোকদের মধ্যকার লেন-দেন ও আদান-প্রদান। 'ইবাদতের সাধারণ অর্থের মধ্যে মুয়ামালাত অন্তর্ভুক্ত, তবে 'ইবাদতের সংকীর্ণ অর্থের সাথে মুয়ামালাতের পার্থক্য

রয়েছে, কারণ মুয়ামালাতে পার্থিব সুযোগ-সুবিধা জড়িত থাকে।

মুআওয়াল — مؤول: প্রসঙ্গ বা বাইরের কোনো পাঠের যোগসূত্রের কারণে অধিকতর প্রকাশ্য অর্থ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে এমন শব্দ।

মুবাহ — مباح: এমন কাজ যা আইনগতভাবে বৈধ, কিন্তু যার জন্য কোনো পুরস্কার নেই।

মুদাফ — مضاف: আরবি ব্যাকরণে সম্বন্ধবাচক শব্দযুগলের প্রথম শব্দ (বাংলা গঠনশৈলীতে অবশ্য দ্বিতীয় শব্দটি মুদাফ)। 'বাবুদ দার' (ঘরের দরজা) শব্দগুচ্ছে বাব শব্দটি মুদাফ।

মুফাস্‌সির — مفسر: যিনি কুরআনের তাফসীর করেন।

মুফতী — مفتي: ইসলামী বিশেষজ্ঞ যিনি আইনগত সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা রাখেন। তবে তার সিদ্ধান্তসমূহ ব্যক্তি বিশেষের উপর বিচারকের (কাযী) সিদ্ধান্তের ন্যায় বাধ্যতামূলক নয়।

মুহার্‌রম — محرم: ইসলামী বর্ষপঞ্জিতে বছরের প্রথম মাস।

মুহ্‌কাম — محكم: বহুবচনে মুহ্‌কামাত; আক্ষরিক অর্থ 'যথার্থ বা 'সুগঠিত'; তাফসীরশাস্ত্রের পরিভাষায় মুহ্‌কামের দু'টি স্বতন্ত্র অর্থ রয়েছে। একটি হলো মুতাশাবিহ এর বিপরীত, অর্থাৎ কুরআনের এমন আয়াত যার অর্থ সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। অপরটি হলো মানসুখ এর বিপরীত। তখন তার অর্থ হবে এমন আয়াত যার আইন এখনো কার্যকর–অর্থাৎ তা এখনো রহিত করা হয়নি।

মুখাস্‌সাস — مخصص: কুরআনের কোনো আয়াতের সাধারণ অর্থজ্ঞাপক পাঠ যার অর্থকে (অন্য কোনো আয়াতের মাধ্যমে) অধিকতর সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

মুখাস্‌সিস — مخصص: সাধারণ পাঠকে বিশেষায়িতকারী কোনো পাঠ বা অন্য কোনো প্রমাণ।

মুনাফিকুন — منافقون: একবচনে মুনাফিক; ভণ্ড, কপট। ইসলামের পরিভাষায়, সেসব ব্যক্তি যারা বাহ্যত ইসলামে বিশ্বাস করে, কিন্তু অন্তর দিয়ে সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করে না।

মুকাইয়্যাদ — مقيد: নিয়ন্ত্রিত বা শর্তযুক্ত পাঠ।

মুরসাল	مرسل: হাদীস বিশেষজ্ঞদের পরিভাষায় মুরসাল দ্বারা এমন ইসনাদকে বুঝানো হয় যেখানে যিনি নবী ﷺ থেকে হাদীসটি শুনেছেন–তাকে উল্লেখ করা হয় না। কোনো সাহাবী মুরসাল হাদীস বর্ণনা করলে তা প্রামাণ্য হিসেবে বিবেচ্য; তবে অন্য কেউ তা বর্ণনা করলে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ সেটিকে সাধারণত দুর্বল হিসেবে বিবেচনা করেন।
মুরসাল মাসাল	مرسل مثل: বিশেষ কোনো ধরনবিহীন মাসাল; সংক্ষিপ্ত জ্ঞানগর্ভ বাণী; প্রবচন অর্থাৎ সাধারণ সত্য সমৃদ্ধ কোনো বক্তব্য।
মুসররাহ মাসাল	مصرح مثل: নীতিগর্ভ উপমা–যেখানে তুলনার শব্দাবলী স্পষ্টভাবে ব্যবহৃত হয়।
মুসহাফে উসমান	مصحف عثمان: খলিফা উসমান কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনের প্রস্তুতকৃত কুরআনের অনুলিপি–যা সমাপ্ত হয়েছিল ৬৪৬ 'ঈসায়ী / ২৫ হিজরীতে। ছয়টি বড় বড় মুসলিম শহরে এর কপি পাঠানো হয় যাতে সেগুলো থেকে পরবর্তী সকল অনুলিপি প্রস্তুত করা যায়।
মুতাশাবিহ	متشابه: বহুবচনে মুতাশাবিহাত; কুরআনের কতিপয় আয়াত যার অর্থ দ্ব্যর্থবোধক কিংবা অস্পষ্ট।
মুতাওয়াতির	متواتر: ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্য বিবরণী যার বর্ণনা-পরম্পরার প্রতি স্তরে এতো বিপুল সংখ্যক বর্ণনাকারী রয়েছে যাদের পক্ষে ভুল করা কিংবা প্রতারণার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করা অসম্ভব। তাই এ ধরনের বর্ণনার বিশুদ্ধতা প্রসঙ্গে নিশ্চিত হওয়া যায়। কুরআন আমাদের নিকট মুতাওয়াতির বর্ণনা-পরম্পরায় পৌঁছেছে।
মু'তাযিলাহ	معتزلة: ইসলামের ইতিহাসে নিয়ন্ত্রণহীন যুক্তিবাদী একটি গোষ্ঠী। তারা আল্লাহর গুণাবলী সংক্রান্ত আয়াতসমূহকে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করেছে কিংবা সেগুলোকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে, সুন্নাহর একটি বিশাল অংশকে অস্বীকার করেছে, মানুষের নিরংকুশ ইচ্ছাশক্তিকে সমর্থন দিয়েছে এবং পাপিষ্ঠ মুসলিমকে স্থায়ী জাহান্নামী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এ সবকিছুর নেপথ্য কারণ ছিল– তারা কুরআন ও সুন্নাহর মূলপাঠের উপর নিজেদের অনুমানকে প্রাধান্য দিয়েছে।

মুতলাক	مطلق: ইতিবাচক বা আদেশসূচক বাক্যের মধ্যকার অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক এমন এক বিশেষ্য যা কোনো বিশেষণের মাধ্যমে বিশেষায়িত বা সীমিত হয়নি।
নাকিরাহ	نكرة: অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক বিশেষ্য।
নাসখ	نسخ: কুরআন ও সুন্নাহর ভেতরকার পরবর্তী আইনের মাধ্যমে পূর্ববর্তী আইনের রহিতকরণ।
নস	نص: সাধারণ অর্থে, মূলপাঠ। অধিকতর সুনির্দিষ্ট অর্থে, কোনো স্পষ্ট অর্থবোধক শব্দ–যার একাধিক ব্যাখ্যার কোনো অবকাশ নেই।
নুকাত	نقاط: একবচনে নুক্তাহ; আরবি অক্ষরের উপরে বা নীচে ব্যবহৃত বিন্দু যা সংশ্লিষ্ট অক্ষরকে সাদৃশ্যপূর্ণ অক্ষরসমূহ থেকে আলাদা করে দেয়।
কাদিয়ানী	قاديانى: ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে ভারতে উদ্ভূত ইসলামের ছদ্মবেশ ধারণকারী একটি ধর্মোদ্রোহী গোষ্ঠী। তাদের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা গোলাম আহমদ নিজেকে নবী হিসেবে দাবি ও জিহাদকে সেকেলে ঘোষণা করেছে এবং মুসলিমদেরকে এই মর্মে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে যে, তারা ভারতে বৃটিশ শাসনের অনুগত হয়ে থাকতে দ্বীনি দিক দিয়ে বাধ্য।
কাযী	قاضى: মুসলিম শাসক কর্তৃক নিযুক্ত ইসলামী বিচারক যার সিদ্ধান্ত মামলার পক্ষদয়ের উপর আইনগতভাবে কার্যকরযোগ্য। তুলনার জন্য দেখুন ‘মুফতী’।
কসম	قسم: শপথ।
কিরাআহ	قراءة: বহুবচনে কিরাআত; কুরআন পাঠ। প্রামাণ্য সূত্রে বর্ণিত দশ ধরনের কিরাআত রয়েছে।
কিস্সাহ	قصة: বহুবচনে কিসাস; গল্প।
কিয়াস	قياس: আইনগত সাদৃশ্য বা মিল যার ভিত্তিতে কুরআন-সুন্নাহয় উল্লিখিত আইনের কার্যকারণের সাথে সাদৃশ্য রাখে অথচ কুরআন সুন্নাহ্‌তে উল্লিখিত হয়নি–এমন বিষয়ে উক্ত আইন প্রয়োগ করা।
রামাদান	رمضان: ইসলামী চান্দ্র বৎসরের নবম মাস। এ মাসে প্রত্যুষ থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা রাখা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক

	ও সক্ষম মুসলিমের উপর বাধ্যতামূলক; তবে অসুস্থ ও মুসাফির প্রকৃতির কতিপয় লোককে ঐ মাসে রোযা রাখার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।
রিবা	ربا: কুসীদ প্রথা, সুদ। ইসলামী আইনে ঋণের উপর ন্যূনতম সুদও নিষিদ্ধ।
রিদা'	رضاع: শিশুকে দুগ্ধপান করানো। দুগ্ধপান করানোর সময়সীমা দু' বছর পর্যন্ত। যেসব শিশু একই মহিলার দুগ্ধ পান করেছে, তারা একে অপরকে বিয়ে করতে পারে না।
রূহ	روح: আত্মা।
রুকু	ركوع: আক্ষরিক অর্থ 'নুইয়ে পড়া'; সালাতের অন্যতম অঙ্গভঙ্গি। কুরআনের হিযবের চেয়ে ছোট অংশ বুঝাতেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।
সাবাব	سبب: বহুবচনে আসবাব; কার্যকারণ।
সাবআতু আহরুফ	سبعة احرف: আক্ষরিক অর্থ 'সাত পদ্ধতি বা আঞ্চলিক ভাষা'; আরবের বিভিন্ন গোত্রের শেখা ও মুখস্থ করার কাজকে সহজতর করার লক্ষ্যে সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছিল।
সাদাকাহ	صدقة: ঐচ্ছিক দান।
সাহাবাহ	صحابة: একবচনে সাহাবী; নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর সঙ্গী-সাথীবর্গ। সে ব্যক্তিই সাহাবী হিসেবে বিবেচ্য যিনি ঈমান অবস্থায় নবী ﷺ এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং মুসলিম হিসেবে ইন্তেকাল করেছেন।
সহীহ	صحيح: আক্ষরিক অর্থ 'বিশুদ্ধ' বা 'প্রামাণ্য'। হাদীসের পরিভাষায় এ শব্দটি দ্বারা কয়েকটি কঠিন শর্ত পূরণ হয়েছে এমন বর্ণনাকে বুঝানো হয়—যার ইসনাদ সংযুক্ত, যার বর্ণনাকারীরা উত্তম চরিত্র ও নির্ভুল স্মৃতিশক্তির অধিকারী এবং যা গুপ্ত ত্রুটি কিংবা অধিকতর প্রামাণ্য মূলপাঠের সাথে সংঘর্ষ থেকে মুক্ত।
সালাত	صلاة: বিশেষ শব্দ ও অঙ্গাস্থিতিসমৃদ্ধ ইসলামের আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা; ঋতুবতী মহিলা ছাড়া সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক মুসলিমের উপর প্রাত্যহিক পাঁচবার সালাত আদায় করা বাধ্যতামূলক।

সাওম/সিয়াম	صيام: ভিন্ন পাঠ 'সিয়াম'; পানাহার বর্জন। ইসলামের পরিভাষায়, প্রত্যুষ থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাদ্য, পানীয় ও যৌনক্রিয়া থেকে বিরত থাকা।
সীরাত	سيرة: আক্ষরিক অর্থ জীবনচরিত; ইসলামের পরিভাষায় নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর জীবনচরিত।
শায	شاذ: আক্ষরিক অর্থ 'অশ্রুতপূর্ব' বা 'অস্বাভাবিক'। কিরাআত শাস্ত্রে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ দাঁড়ায় এমন কিরাআত যাতে প্রামাণ্য কিরাআতের কোনো একটি শর্ত অনুপস্থিত।
শারীয়াহ	شريعة: কুরআন ও সুন্নাহর ভেতরকার ঐশীভাবে নাযিলকৃত আইন। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিশ্বাসের বিষয়াবলী, ভক্তিমূলক উপাসনা এবং মানুষের পারস্পরিক লেনদেন যেমন: বাণিজ্যিক, ফৌজদারি, সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক আইন।
শার্ত	شرط: শর্ত। উসূলুল ফিক্হ বিশেষজ্ঞদের মতে, শর্ত হলো এমন অবস্থার নাম যার অনুপস্থিতিতে হুক্ম (সংশ্লিষ্ট বিধান) অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য, তবে তার উপস্থিতি সংশ্লিষ্ট বিধানকে অপরিহার্য করে তোলে না। উদাহরণস্বরূপ: কোনো ব্যক্তির উপর সালাত বাধ্যতামূলক হওয়ার জন্য সুস্থ মস্তিস্কের অধিকারী হওয়া একটি শর্ত। এ শর্ত অনুপস্থিত থাকলে কোনো ব্যক্তিকে সালাত আদায় করতে হবে না। তবে, কোনো সুস্থ মস্তিস্কের অধিকারী ব্যক্তির উপরও সালাত বাধ্যতামূলক নাও হতে পারে, যদি সে এখনো প্রাপ্তবয়স্ক না হয় কিংবা সে যদি ঋতুবতী মহিলা হয়।
শাইখ	شيخ: আক্ষরিক অর্থ বয়োবৃদ্ধ; গোত্রপতি, জ্ঞানের কোনো শাখার বিশেষজ্ঞ কিংবা সূফী পরিভাষায় প্রশ্নাতীত আনুগত্য লাভের অধিকারী আধ্যাত্মিক দিক-নির্দেশক বুঝাতেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।
শীয়া	شيعة: আক্ষরিক অর্থ 'দল বা মতভেদসৃষ্ট সম্প্রদায়'; ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসে এ পরিভাষাটি বেশ কয়েকটি ভিন্ন মতাবলম্বীদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যাদের ঐক্যবদ্ধ বিশ্বাস হলো, নবী ﷺ এর চাচাত ভাই আলী ইবনু আবী তালিব ও তাঁর বংশধরকে মুসলিম জাতির রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ঐশীভাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। শীয়া সম্প্রদায়ের কয়েকটি চরমপন্থী উপদল এই চিন্তা-বিশ্বাস থেকে ধর্মদোহমূলক দু'টি নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে—

যা তাদের অনুসারীদেরকে ইসলামের আওতার বাইরে ঠেলে দিয়েছে। প্রথমটি হলো এই বিশ্বাস যে, আলী ও তাঁর বংশধররা অতিমানব। এর ভিত্তিতে তারা তাঁদের প্রতি কিছু খোদায়ী বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছে। এমনকি তাদের কারো কারো বিশ্বাস, আলী ছিলেন মানবরূপে আল্লাহর মূর্তরূপ। দ্বিতীয় বিশ্বাসটি হলো, হাতেগোনা কয়েকজন সাহাবী ছাড়া সমস্ত সাহাবী ছিলেন মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগকারী), কারণ তাঁরা নবী ﷺ এর ইন্তেকালের পর আলীকে তাঁদের নেতা হিসেবে বেছে নেননি।

শির্ক — شرك: আল্লাহকে বাদ দিয়ে বা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর উপাসনা করা। আল্লাহর বিচারে শির্ক হলো সবচেয়ে ভয়াবহ গোনাহ, কারণ আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন–শির্ক হলো তার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। যে ব্যক্তি শির্ক অবস্থায় মারা যায়, তার স্থায়ী ঠিকানা জাহান্নাম।

সিফাত — صفة: আক্ষরিক অর্থ বৈশিষ্ট্য বা গুণ; আরবি ব্যাকরণে সিফাত দ্বারা বিশেষণকে বুঝানো হয়।

সূফী — صوفي: সুফীবাদের অনুসারী। সূফীবাদ হলো ইসলামের মরমি ব্যাখ্যা, যেখানে আল্লাহকে স্মরণ রাখার পরম গুরুত্ব ও আধ্যাত্মিক অগ্রগতির জন্য একজন আধ্যাত্মিক দিক-নির্দেশকের নিকট নিজের ইচ্ছাশক্তিকে সমর্পণ করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়া হয়। পরবর্তী পর্যায়ের বেশ কিছু সূফী মতবাদের [যেমন ওয়াহদাতুল ওজুদ (সর্বেশ্বরবাদ) ও ফানা (নির্বাণ)] ভিত্তিমূল যতোটা না ইসলামে, তার চেয়ে বেশী বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মে।

সূরা — سورة: বহুবচনে সুওয়ার, আক্ষরিক অর্থ পরিবেষ্টনকারী দেয়াল; কুরআনের অধ্যায়।

সুজুদ — سجود: একবচনে সাজদাহ; মাটিতে কপাল ঠেকানো।

সুকূন — سكون: স্বরজ্ঞাপক চিহ্ন; যে অক্ষরের উপর তা থাকে, সে অক্ষরে হসন্তের উচ্চারণ করতে হয়।

সুন্নাহ — سنة: আক্ষরিক অর্থ ‘পথ’; ইসলামের পরিভাষায়, নবী ﷺ এর পন্থা; অর্থাৎ তাঁর কথা, কাজ ও তাঁর সামনে তাঁর সাহাবীদের কৃত কাজের প্রতি মৌন সম্মতি। হাদীস গ্রন্থসমূহে সুন্নাহ সংরক্ষিত হয়েছে।

তাওয়ীল	تاويل: আক্ষরিক অর্থ 'ব্যাখ্যা'; ইসলামের প্রথম তিন প্রজন্ম অতিবাহিত হওয়ার পর বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এ শব্দটি একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করতে শুরু করেছে। তাদের সংজ্ঞানুযায়ী, তাওয়ীল হলো প্রসঙ্গের ইঙ্গিতের ভিত্তিতে কোনো শব্দ বা অভিব্যক্তিকে তার সুস্পষ্ট অর্থ থেকে সরিয়ে এনে অন্য কোনো সম্ভাব্য অর্থে প্রয়োগ করা।
তাবি'উন	تابعون: মুসলিমদের দ্বিতীয় প্রজন্ম যারা সাহাবীদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।
তাফখীম	تفخيم: আরবি বর্ণমালার কোনো অক্ষরকে পরিপুষ্ট ও জোর আওয়াজে উচ্চারণ করা।
তাফসীর	تفسير: আক্ষরিক অর্থ, 'ব্যাখ্যা'; ইসলামের পরিভাষায়, কুরআনের অর্থসমূহকে ব্যাখ্যা করার বিশেষ জ্ঞান।
তাফসীর বিদ দিরায়াহ	تفسير بالدراية: ব্যক্তিগত উপলব্ধির ভিত্তিতে কুরআনের তাফসীর।
তাফসীর বিল মা'সূর	تفسير بالماثور: নবী ﷺ তাঁর সাহাবী ও তাঁদের উত্তরসূরীদের থেকে বর্ণিত বক্তব্যের ভিত্তিতে কুরআনের তাফসীর।
তাফসীর বির রায়	تفسير بالراى: ব্যক্তিগত মতের ভিত্তিতে কুরআনের তাফসীর। তাফসীর বিদ দিরায়া'র অধিকতর নেতিবাচক নাম।
তাফসীর বির রিওয়ায়াহ	تفسير بالرواية: তাফসীর বিল মাছূর এর একটি প্রতিশব্দ।
তাজবীদ	تجويد: কুরআনের সঠিক উচ্চারণের শিল্প।
তাক্‌ফীর	تكفير: কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে 'অবিশ্বাসী' ঘোষণা করা। এরূপ করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখতে হবে, কারণ সিদ্ধান্ত ভুল হলে রায় উলটো বিচারকের উপর প্রযোজ্য হবে।
তাখ্‌সীস	تخصيص: সাধারণ অর্থজ্ঞাপক কোনো পাঠকে বিশেষায়িতকরণ।
তামাত্তু	تمتع: তিন প্রকার হাজ্জের একটি। এ ধরনের হাজ্জে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একই ভ্রমণে হাজ্জ ও উমরাহ–উভয়টি সম্পন্ন করে, তবে সে উভয় আনুষ্ঠানিকতার মাঝখানে ইহরাম থেকে বেরিয়ে আসে এবং পশু জবাই করে।

তাকলীদ	تقليد: কারো মতের সপক্ষে প্রমাণ জানতে না চেয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ।
তারক্বীক	ترقيق: আরবি বর্ণমালার কোনো অক্ষরকে হাল্কা ও কোমল আওয়াজে উচ্চারণ করা।
তাশদীদ	تشديد: ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ।
তাশকীল	تشكيل: আরবি অক্ষরের উপর ও নীচে স্বরনির্দেশক চিহ্ন।
তাওয়াতুর	تواتر: মুতাওয়াতির বর্ণনা পৌঁছে দেয়ার প্রক্রিয়া। দেখুন, মুতাওয়াতির।
তাওহীদ	توحيد: আল্লাহর একত্ববাদ। এ বিশ্বাস যে– আল্লাহ তাঁর সত্তায় একক; প্রতিপালন, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে একচ্ছত্র অধিপতি; গুণাবলী ও কার্যক্ষমতায় অনুপম এবং দাসত্ব লাভের একমাত্র যোগ্য সত্তা।
তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ	توحيد الالوهية: আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাসের একট দিক। এ বিশ্বাস যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে বা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর উপাসনা করা যাবে না। তাওহীদের এ দিকটির উপরই আল্লাহর নবীগণ সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন।
তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ	توحيد الربوبية: আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনের সূচনা বিন্দু; এই বিশ্বাস যে– আল্লাহই মহাবিশ্বের স্রষ্টা, লালনকারী, জীবন ও মৃত্যু দানকারী এবং তাঁর অনুমোদন বা ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোনো কিছুই সংঘটিত হয় না। অধিকাংশ লোক এ চিন্তাধারায় বিশ্বাসী হওয়ার পরও আল্লাহর পাশাপাশি অন্যদের উপাসনা করার মাধ্যমে তারা তাওহীদুর রুবুবিয়্যা'র মৌলিক শর্তসমূহের পরিপন্থী কাজ করে।
তায়াম্মুম	تيمم: পবিত্র বালি, মাটি ইত্যাদি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের একটি মাধ্যম বিশেষ; পানি দুষ্প্রাপ্য হওয়া কিংবা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হওয়ার প্রেক্ষিতে তায়াম্মুম হলো ওযু বা গোসলের বিকল্প সমাধান।
উম্মুল কিতাব	ام الكتاب: আক্ষরিক অর্থ 'গ্রন্থের জননী'; এ পরিভাষাটি দ্বারা কুরআনের মুহ্কাম আয়াতসমূহের সারনির্যাসকে বুঝানো হয়। মুহ্কাম আয়াত মূলত সেসব আয়াত যার অর্থসমূহ সুস্পষ্ট ও বাস্তবায়নযোগ্য।

উম্মাহ — أمة: যে জনগোষ্ঠীর নিকট কোনো নবী প্রেরিত হয়েছেন। ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে বসবাসরত প্রত্যেক ব্যক্তি নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উম্মত; তবে মুসলিম উম্মাহ বলতে মূলত সেসব লোককে বুঝানো হয় যারা মুহাম্মাদ ﷺ এর নুবুওয়্যাতে বিশ্বাসী; আরবিতে এদেরকে বলা হয় উম্মাতুল ইজাবাহ (সাড়াদানকারী জাতি)।

উমরাহ — عمرة: ছোট হাজ্জ যা বছরের যে কোনো সময় আদায় করা যায়, এতে আনুষ্ঠানিকতার পরিমাণ হাজ্জের তুলনায় কম।

উসূলুল ফিক্‌হ — اصول الفقه: ইসলামী আইনের মূলনীতিসমূহ; কুরআন ও সুন্নাহর মূলপাঠ থেকে সঠিক আইন বের করে আনার লক্ষ্যে ইসলামী বিশেষজ্ঞদের কয়েক প্রজন্ম কর্তৃক উদ্ভাবিত নীতিমালা।

ওহী — وحى: প্রত্যাদেশ।

ওয়াজিব — واجب: বাধ্যতামূলক ক্রিয়া—যার যথাযথ সম্পাদনের জন্য পুরস্কার ও লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির হুমকি রয়েছে।

ওলায়াহ — ولاية: ওলা থেকে উদ্ভূত শব্দ যার অর্থ হলো কারো সাথে মৈত্রী ও হৃদ্যতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা এবং তাকে সমর্থন দেয়া। গভর্নর বা প্রদেশপালকে বলা হয় ওয়ালী। আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, সে ওলী। ওলায়াহ ও বিলায়াহ শব্দ দ্বারা গভর্নরের পদ ও দরবেশের মাকাম—উভয়টিই বুঝানো যেতে পারে। ঈমানের ঘোষণায় শীয়ারা 'আলীয়্যুন ওলিয়্যুল্লাহ' শব্দগুচ্ছ যোগ করে দিয়েছে।

ওযু — وضوء: বাহু, মুখমণ্ডল ও পা ধৌতকরণ এবং ভেজা হাতে মাথা মুছে নেয়ার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনের একটি মাধ্যম যদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছোট অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্রতা লাভ করে; এর ফলে উক্ত ব্যক্তি সালাত আদায় ও অন্যান্য ভক্তিমূলক উপাসনা করার যোগ্য হয়ে উঠে।

যাকাত — زكوة / زكاة: বাধ্যতামূলকভাবে আদায়যোগ্য বাৎসরিক দান, যা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের অধিকারী মুসলিমের নিকট থেকে আদায় করে গরীব-মিসকিন ও আরো কয়েক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়।

লেখক পরিচিতি

ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপসের জন্ম ওয়েস্ট ইন্ডিজের জ্যামাইকায়। বেড়ে উঠেছেন কানাডায়। সেখানেই ১৯৭২ সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। সৌদি আরবের মাদীনাহ ইসলামিক ইউনিভার্সির্টি থেকে ইসলামিক স্টাডিজের উপর তিনি বিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। ইসলামিক ধর্মতত্ত্বের উপর এমএ করেছেন রিয়াদ ইউনিভার্সিটি থেকে। ওয়েলস ইউনিভার্সিটি থেকে ইসলামিক স্টাডিজের উপর পিএইচডি করেছেন।

সুদীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আরবি ভাষা, দা'ওয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও এগুলোর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে 'প্রেস্টন ইউনিভার্সিটি, ইউএই', 'নলেজ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ', 'অমদুরমান ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, সুদান' ইত্যাদি।

Islamic Online University প্রতিষ্ঠার সুবাদে জর্দানিয়ান পাবলিকেশন কর্তৃপক্ষ ড. বিলাল ফিলিপসকে "The 500 most influential muslims"-এর তালিকাতে স্থান দেয়। এ ইউনিভার্সিটিতে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের যেকোনো মানুষ বিনামূল্যে Diploma এবং টিউশন-ফি মুক্ত Bachelor of Arts প্রোগ্রামে পড়াশোনা করতে পারে। ড. বিলাল ফিলিপস সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন: www.bilalphilips.com

Sean
PUBLICATION

কুরআন বোঝার মূলনীতি'র মতো জ্ঞানের মৌলিক শাখায় অজ্ঞতা থাকলে তা ইসলামী শিক্ষার ভিত্তিসমূহের ব্যাপারে মারাত্মক ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করে। ইসলামের বিকৃতিসাধনের অপতৎপরতায় লিপ্ত লোকদের জন্য এ অজ্ঞতা ভয়ানক সুযোগ তৈরী করে দেয়। ইসলামী আবরণের নেপথ্যে লুকিয়ে থাকা সকল পথভ্রষ্ট ফির্কার লোকেরা নিজেদের ভুল মতাদর্শের সমর্থনে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উপস্থাপন করে থাকে। তাই কুরআনের আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যাই কেবল ঈমানদারদেরকে ওদের ফাঁদ থেকে সুরক্ষা দিতে পারে ইনশা আল্লাহ।

ISBN 978-984-91682-1-8
9 789849 168218

www.seanpublication.com